KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No.: KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কল-১৩
Collection: KLMLGK	Publisher নীড় প্রকাশন
Title কুড়ানি	Size 7"x 9.5" 17.78x 24.13 c.m.
Vol. & Number: ৪৯/৯ ৪৯/১০ ৪৯/১২	Year of Publication পৌষ ১৩৯৫ // Jan 1989 মাঘ ১৩৯৫ // Feb 1989 চৈত্র ১৩৯৫ // April 1989
	Condition: Brittle Good
Editor: অরুণ দেব	Remarks:

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

৪৯ বর্ষ নবম সংখ্যা জানুয়ারি ১৯৮৯

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৬৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

মানুষের বড়ো পরিচয় তার মননশীলতায়। তরুণ প্রজন্ম বিভিন্ন মাধ্যম থেকে বর্তমানে যে শিক্ষা পেয়ে থাকে, মননের বিকাশে তা তেমন ইতিবাচক নয় কেন ? এরই অন্বেষায় অধ্যাপক অমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের তীক্ষ্ণ রচনা "মননশীলতার মন্বন্ত'র"।

অমিত অর্থব্যয় সত্ত্বেও, বিশেষ করে গ্রামীণ ভারতে জনসংখ্যা-নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী তেমন সফল না হওয়ার হেতু বিশ্লেষণ করেছেন রাশিবিজ্ঞান-বিশারদ অধ্যাপক অতীন্দ্রমোহন গুন।

খ্যাতনামা ছন্দঃশাস্ত্রী প্রবোধচন্দ্র সেন শুরুতে ছিলেন অগ্নিযুগের বিপ্লবী। অনুজ সুধীর সেনের স্মৃতিচারণে উদ্ভাসিত এই বিপ্লবীর ব্যক্তিমূর্তি এবং বাঙালি জীবনের সেই অগ্নিময় সময়।

সাঁওতাল-বিদ্রোহ চলাকালে যুদ্ধরত বিদ্রোহীদের চিন্তাচেতনায় যেসব ভাবান্তর ঘটেছিল, তারই বিশ্লেষণ আছে অধ্যাপক বিনয় চৌধুরীর এবারের কিস্তিতে।

তিরিশের দশক থেকেই "রবিবাসর" হল কলকাতায় সাহিত্যিকদের মিলনমঞ্চ। এই মঞ্চের প্রমুখ সংগঠক এবং একটানা পঁচিশ-বর্ষব্যাপী এর সম্পাদক সন্তোষকুমার দের কলমে এই "রবিবাসরে"র কহিনী।

এবারের নাট্যমেলার পর্যালোচনা করেছেন অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়।

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশা হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক সুখ,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মনের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা...
এক জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

শ্রীমা

বর্ষ ৪৯। সংখ্যা ৯
জানুআরি ১৯৮৯
পৌষ ১৩৯৫

মননশীলতার মন্বন্তর অমলকুমার মুখোপাধ্যায় ৭৪৫
পরিবার-পরিকল্পনার মানসিকতা অতীন্দ্রমোহন গুপ্ত ৭৫১
ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক আন্দোলন বিনয় চৌধুরী ৭৬৩
রবিবাসরের আসরে সন্তোষকুমার দে ৭৮৯
বিষয় : ব্রহ্মদেশ বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় ৮০১
বড়দা ও আমার তরুণকালের স্মৃতি সুধীর সেন ৮০৭

অনৈসর্গিক বিরাম মুখোপাধ্যায় ৭৫৮
যেখানেই যাই আল মাহমুদ ৭৬০
যে দূরত্বে ইতিহাস শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় ৭৬১
উত্তরাধিকার মঞ্জুষ দাশগুপ্ত ৭৬২

তিন বোন গুণময় মান্না ৭৭৯

গ্রন্থসমালোচনা ৮২১
রণেন্দ্রনাথ দেব, সমীর মুখোপাধ্যায়, কান্তি গুপ্ত, মৃণাল নাথ

নাটক ৮৩৫
বিবিধের মাঝে মিলন অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মরণে ৮৪৪
রবীন সুর : পরিব্রাজকের প্রস্থান কামাল হোসেন

শিল্পপরিকল্পনা। বনেনআয়ন দত্ত

নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২১-৬৩২১

N. J. M. C. SALUTES
THE ARCHITECT OF MODERN
INDUSTRIAL INDIA
PANDIT JAWAHARLAL NEHRU
AND PAYS HOMAGE
ON HIS BIRTH CENTENARY

THIS IS A TIME OF TRIAL AND TESTING FOR ALL OF US AND WE HAVE TO STEEL OURSELVES TO OUR TASK. PERHAPS WE WERE GROWING TOO SOFT AND TAKING THINGS FOR GRANTED BUT FREEDOM CAN NEVER BE TAKEN FOR GRANTED. IT REQUIRES ALWAYS AWARENEES, STRENGTH AND AUSTERITY.

—Pandit Nehru

NATIONAL JUTE MANUFACTURERS CORPORATION LTD.

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)
CHARTERED BANK BUILDINGS, 2ND FLOOR
4, NETAJI SUBHAS ROAD
CALCUTTA-700 001

MANUFACTURERS OF QUALITY CARPET BACKING, HESSIAN, SACKING, FINE JUTE YARN AND SPECIALITY FABRICS.

Telegram : 'ENJAEMCI'
Telex : 7439 CROP IN

Tele. : 20-6127
20-6179
20-4708
20-6128
20-5102
20-6121

MILLS :
NATIONAL, ALEXANDRA, KHARDAH, KINNISON, UNION & R.B.H.M.

মননশীলতার মন্বন্তর

অমলকুমার মুখোপাধ্যায়

মানুষ মননশীল জীব। বস্তুত, মননশক্তিই তার মনুষ্যত্বের মূল আধার। এই মননশক্তির মাধ্যমেই পরিপার্শ্বের বস্তুজগৎ সম্পর্কিত বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারের দুয়ার উন্মোচিত হয় মানুষের সামনে। বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়ে মনন তার সঙ্গে যুক্ত করে নিজের নিপুণ সক্রিয়তা, এবং এইভাবে জড় ও চেতনের সম্মিলনে মানুষের অন্তর্লোক সতত উদ্ভাসিত হয়ে চলেছে জ্ঞানের আলোকে। একইভাবে মানুষের নৈতিক জগতেও মননের সক্রিয় ভূমিকা অনস্বীকার্য। মানুষের ন্যায় ও অন্যায়, ভালো ও মন্দ সম্পর্কিত বিচারবোধের উন্মেষে সমাজের বস্তুগত জীবনব্যবস্থার অবদান যেমন নিতান্ত সামান্য নয়, তেমনই এই বস্তুগত প্রেক্ষাপটে অন্তরে নৈতিক মূল্যবোধের উদ্বোধনে এবং এই মূল্যবোধের প্রতি অবিচল আনুগত্য বজায় রাখার ব্যাপারে মননের ভূমিকাও উপেক্ষণীয় নয়। এই মননশীলতাই নিঃসন্দেহে প্রাণিজগতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের অভিজ্ঞান, এবং মননের এই শক্তিময় ক্রিয়াশীলতা সম্পর্কে নিরন্তর সচেতন থাকা মানুষের পক্ষে বিশেষ জরুরি বলে মনে করেছেন বলেই দার্শনিকদের কেউ-কেউ মানুষকে চিহ্নিত করেছেন এক আত্মসচেতন প্রাণী-রূপে। এই দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আরও মেনে নিতে হয় যে, স্বাধীনতার সম্ভাব্যতা নিহিত এই আত্মসচেতনতার মধ্যে। কারণ মানুষ আত্মসচেতন বলেই সে প্রকৃতিজগতের বিপুল প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে সংগ্রামে সাহসী হয় এবং নিজের মননশক্তির আঘাতে একের পর এক এই প্রতিবন্ধকতাকে পরাভূত করে প্রশস্ত করে নিজের বিজয়ের, স্বাতন্ত্র্যের ও স্বাধীনতার পথ।

আত্মসচেতন প্রাণী-রূপে মানুষের এই ভাবমূর্তি দর্শনতত্ত্বের জগতে বারে-বারে উজ্জ্বল মহিমায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠলেও প্রশ্ন ওঠে যে, ব্যক্তির ব্যবহারিক জীবনে তা বাস্তব হয়ে উঠতে পারে কীভাবে। অর্থাৎ, মানুষ অসামান্য মনন-শক্তির অধিকারী হওয়ার যোগ্য—সেই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে অনিবার্যভাবে যে প্রশ্ন দেখা দেয় তা হল এই যে, কোন্ প্রক্রিয়ায় এবং কী-কী উপাদানের সহায়তায় একজন ব্যক্তির জীবনে তার মননশক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটে। প্রশ্নটি অবশ্যই তুচ্ছ ও অপ্রাসঙ্গিক নয়, কারণ যে সত্য ব্যক্তির নিত্য-দিনের জীবনে রূপায়িত করা যায় না, সে সত্য বিমূর্ত দার্শনিকতত্ত্বের সীমানায় আবদ্ধ এক অধরা সত্য, যার কোনো ব্যবহারিক উপযোগিতা বা মূল্য নেই। আবার দর্শননিরপেক্ষ পরিপ্রেক্ষিতেও মানুষের মননশীলতা-বিকাশের প্রশ্নটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ আধুনিক কালের প্রবল-বেগসম্পন্ন যান্ত্রিক জীবন-ধারার কল্যাণে আমরা সর্বত্রই যে উদ্বেগজনক অবস্থার সম্মুখীন তা হল এই যে,

প্রতিজ্ঞায়, এবং এই আঘাত ও প্রত্যাঘাতের মিথ-ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে মননশক্তি। অর্থাৎ, বিরোধী বহির্জগৎই মননশক্তি উজ্জীবনের সবচেয়ে অনুকূল পরিবেশ। অন্যভাবে বলা যায় যে, মানুষের মননশীলতা পরিণতহয়ে ওঠে দ্বন্দ্ব ও বিরোধের মধ্য দিয়ে, কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। মনে রাখতে হবে যে, এ সংগ্রামের কোনো শেষ নেই। কারণ, মানুষ তার মননশক্তিতে সজ্জিত হয়ে প্রকৃতির এক দুস্তর বাধা অতিক্রম করার সঙ্গে-সঙ্গে প্রকৃতি তার সামনে তুলে ধরে আর-এক নতুন প্রতিকূলতা। এই কারণেই মননের সক্রিয়তায় কোনো অন্তিমতা নেই, যেহেতু তাকে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকতে হয় প্রতিকূলতার মোকাবিলায়। উল্লেখ্য যে, এ সংগ্রাম নিছক ধ্বংসাত্মক সংগ্রাম নয়, সঠিক বিচারে এ সংগ্রাম নিঃসন্দেহে সৃষ্টির সংগ্রাম। অর্থাৎ, মানুষ তার মননশক্তি প্রয়োগ করে শুধুমাত্র প্রকৃতি-নির্মিত বাধাই অপসারিত করে না, একই সঙ্গে সে প্রকৃতিজগতে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটিয়ে এই প্রতিকূলতার পুনরুত্থানরোধে সচেষ্ট হয়। এই কারণেই মননশক্তি প্রয়োগ করে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় যে ফল পাওয়া যায়, তা কখনও অশুভ বা বিপজ্জনক বলে বিবেচিত হতে পারে না। একমাত্র মননশক্তির অপব্যবহার ঘটলেই পরিণাম অশুভ হয়ে ওঠে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, মননশক্তি মানুষের একান্ত নিজস্ব হলেও এই শক্তির বিকাশে, সক্রিয়তায় বস্তুজগতের এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। অতএব বস্তুজগৎকে অস্বীকার করে, অর্থাৎ, তথাকথিত বস্তু-বিমুখ নিদিধ্যাসনের মধ্য দিয়ে মানুষ মননশীল হয়ে উঠতে পারে না। একইভাবে মননশক্তির বিকাশে সামাজিক সম্পর্কের গুরুত্বও অনস্বীকার্য। কারণ একজন ব্যক্তির মননশক্তির সাফল্য ও সদর্থকতা সচরাচর নিরূপিত হয়ে থাকে সমাজের অন্তর্ভুক্ত আরও পাঁচজনের ক্রিয়াশীল মননের কষ্টিপাথরে। অর্থাৎ, একজন মানুষ তার নিজের বিচারের মানদণ্ড প্রয়োগ করে নিজেকে মননশীল-রূপে দাবি করতে পারে না; স্বাভাবিকভাবেই এই মননশীলতার মাত্রা নির্ধারিত হয় অন্যের মূল্যায়ন ও মুক্ত স্বীকৃতির মাধ্যমে। আবার একজনের মননশক্তি সততই সঞ্চারিত হয় অন্যের মননে, এক ব্যক্তির উন্নত মননশীলতা অনু-প্রাণিত করে সমাজের শত-সহস্র ব্যক্তিকে। অন্যদিকে সমাজের অন্তর্ভুক্ত জনগোষ্ঠীর ধারণা-ভাবনা, আদর্শ-গত আনুকূল্য অথবা বিরোধিতাও ব্যক্তির মননকে নতুন পথে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা যোগায়, যার পরিণামে সমাজে নতুন চিন্তা ও আদর্শের উদ্ভব ঘটে।

মননশক্তির বিকাশ বস্তুজগতের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার অর্থ এই নয় যে, মননের সৃজনশীল সক্রিয়তায় কল্পনার কোনো ভূমিকা নেই। বস্তুত, কল্পনাশক্তি মননের এক স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য এবং এই কল্পনাশক্তি মননশীলতার এক মৌল উপাদান। অবশ্য যে কল্পনা মানুষকে জড়তায় আচ্ছন্ন করে হতোদ্যম ও গতিহীন করে তোলে, সে কল্পনা প্রকৃতার্থে নিষ্ক্রিয় ও নিরর্থক, এবং তার সঙ্গে মননশীলতার কোনো সম্পর্ক নেই। অন্যদিকে বস্তুকে আত্মস্থ করতে গিয়ে মানুষ অনেক সময় তার সঙ্গে মেশায় আপন মনের মাধুরী অথবা মহৎ সৃষ্টির উল্লাসে মনন অনেক সময় অতিক্রম করে যায় বস্তুর সীমারেখা। এইভাবে জন্ম নেয় যে কল্পনা, তা মানুষকে স্বভাবতই নিয়ে চলে নতুন জিজ্ঞাসা ও অন্বেষণের পথে, অনুপ্রাণিত করে নবতর সৃষ্টির প্রতিজ্ঞা ও উদ্যোগে। এরূপ ক্ষেত্রে কল্পনা স্পষ্টতই মননশীলতার সহায়ক শক্তি।

দুই

ওপরের আলোচনা থেকে যে জিনিসটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল এই যে, দেশ-কালনির্বিশেষে মানুষ মননশীল প্রাণী-রূপে স্বীকৃতি লাভ করলেও ব্যবহারিক জীবনে প্রতিটি ব্যক্তিই মননশীল নয়। কারণ বিনা প্রয়াসে এবং অনুকূল শর্তাদি পালিত না হলে একজন মানুষ

প্রায় প্রতিটি ব্যক্তিরই আচারে, আচরণে ও কর্ম-প্রকরণে মননশীলতার অবক্ষয় ক্রমবর্ধমান। এই কারণেই, অন্তত আমাদের দেশে, বৃহত্তর সমাজজীবন আজ গতানুগতিকতার অচলায়তনে আবদ্ধ; সেখানে আজ আর নিত্য-নতুন ভাবধারার আবির্ভাব দেখা যায় না, একটা নির্বোধ গড্ডালিকাপ্রবাহে গা ভাসাতেই সকলে ব্যস্ত। ফলত, আমাদের শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, শিল্পে ও সাহিত্যে এখন পরিলক্ষিত হয় দুর্ভাগ্যজনক এক সৃষ্টিশীলতার সঙ্কট। এ যুগ যান্ত্রিক গতির যুগ, কিন্তু উদ্ভাবনী প্রগতির নয়।

মনে রাখতে হবে যে, মননহীনতা মানুষের স্বাভাবিক লক্ষণ নয়। অর্থাৎ, যে-কোনো সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষই মননের বৈশিষ্ট্যে ভূষিত, কিন্তু মননের নিছক অস্তিত্ব মানুষকে আপনা-আপনি মননশীল করে তোলে না। মানুষ মননশীল-রূপে স্বীকৃতি লাভ করে তখন, যখন তার জাগ্রত মননশক্তি সৃজনমূলক ও শুভ কর্মের মধ্য দিয়ে নিজের স্থায়ী পরিচয় রেখে যায়। মননশক্তির এই উজ্জীবন এক সচেতন ও নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া যাকে সচল রাখার জন্য একদিকে যেমন চাই মানুষের পক্ষ থেকে সক্রিয় উদ্যোগ, অন্যদিকে তেমনই চাই অনুকূল বিষয়গত অবস্থা। এ বিষয়ে মানুষের সক্রিয় উদ্যোগের মূল ভিত্তি হল তার স্বাতন্ত্র্যবোধ। অর্থাৎ, মানুষ এক অনন্য প্রাণী; প্রাণিজগৎ ও বস্তুজগতের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েও সে অন্য সব-কিছু থেকে পৃথক, বিশ্বচরাচরে তার অস্তিত্ব অবিরাম ও অভাবনীয় সৃষ্টির সূচক—এই প্রত্যয়ে নিরন্তর অনুপ্রাণিত হতে না পারলে মানুষের পক্ষে তার নিজের মননশক্তির বিকাশে উদ্যোগী হওয়া কখনই সম্ভব নয়। প্রকৃতি-জগতের সুবিশাল পটভূমিতে নিজের সুদৃঢ় ও অপরিবর্তিত অবস্থান সম্পর্কে মানুষ নিঃসংশয় হতে পারে এই স্বাতন্ত্র্যবোধের সাযুজ্যে; যার ফলে প্রবুদ্ধ হয় তার আত্মবিশ্বাস, এবং এই আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ স্বাভাবিকভাবেই স্বতঃপ্রণোদিত হয় নব-নব সৃষ্টির উদ্যোগে ও উদ্ভাবনে। যেহেতু প্রতিটি সৃষ্টি ও উদ্ভাবনই সম্ভব হয় মূলত মননের নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণে, সে কারণে যতই এই সৃষ্টি ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়, ততই সুনিশ্চিত হয় মানুষের মননশীলতার অগ্রগতি।

তবে মানুষের মননশীলতার বিকাশ এক দীর্ঘ ও বৈচিত্র্যময় প্রক্রিয়া যার পিছনে মানুষের পারিপার্শ্বিক বহির্জগতের অবদানও উপেক্ষণীয় নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মননের সক্রিয়তা প্রধানত দুই ধরনের। এক ধরনের সক্রিয়তা তাৎক্ষণিক, যা নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, যার মধ্যে ফল-প্রসবের আকুতি অনুপস্থিত এবং যার অনেকটাই বিশৃঙ্খল ও অযৌক্তিক। এই ধরনের সক্রিয়তা দেখা দেয় সাধারণত আবেগের আঘাতে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ-সুখ, প্রত্যাশা ও ব্যর্থতা-বোধের পরিপ্রেক্ষিতে মনোজগৎ স্বভাবতই তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে। কিন্তু এই সক্রিয়তা সাময়িক স্পন্দনমাত্র, ইতিবাচক কর্মোদ্যোগের প্রেরণা দেওয়ার মতো শক্তি যার নেই। অবশ্য এরই পাশাপাশি মননের আর-এক ধরনের সক্রিয়তা আছে যা যুক্তিগামী, স্থির লক্ষ্যাভি-মুখী ও সৃষ্টিশীল। এই সৃষ্টিশীল সক্রিয়তাই মানুষকে মননশীল করে তোলে।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর সক্রিয়তা জন্ম নেয় জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল থেকে, রহস্যভেদের আকর্ষণ থেকে, অন্বেষণের দুর্বার ইচ্ছা থেকে। মানুষের এই জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল এবং অন্বেষণের প্রয়াস দেখা দেয় মূলত মননের বাইরের জগৎকে কেন্দ্র করে। পরিপার্শ্বের প্রকৃতিজগৎ তার বিপুল সামগ্রী-সম্ভার নিয়ে মানুষকে সততই উৎসাহিত করে অনুসন্ধানের নানা রোমাঞ্চকর অভিযানে। একই সঙ্গে এই প্রকৃতি তার প্রবল শক্তি নিয়ে মানুষের সামনে প্রতিনিয়ত প্রতিবন্ধকতার প্রাচীর নির্মাণ করে আঘাত হানে মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও শক্তির অহমিকায়। যতই এই আঘাত আসে ততই মনন সক্রিয় হয়ে ওঠে প্রতিকূলতা অপসারণের

মননশীল হয়ে উঠতে পারে না। এই মননশীলতা অর্জন করতে হলে তার মধ্যে অবশ্যই প্রয়োজনীয় গুণাবলী থাকা দরকার। যেমন, আমরা দেখেছি যে, মানুষের মননশীল হওয়ার প্রাথমিক শর্ত হল তার প্রখর স্বাতন্ত্র্যবোধ। দ্বিতীয়ত, তাকে হতে হবে আত্মপ্রত্যয়ী ও যুক্তিনিষ্ঠ, জিজ্ঞাসু ও কৌতূহলী। তৃতীয়ত, মনন-শক্তির উদ্ভাসে প্রকৃতিজগৎ ও সামাজিক সম্পর্কের অবদান উপলব্ধি করার মতো চেতনা তার থাকা দরকার। তার আরও থাকা চাই সমস্ত জাগতিক প্রতিকূলতা মোকাবিলা করার মতো সংগ্রামী মানসিকতা এবং সৃষ্টিশীল কর্মে অনুপ্রাণিত হওয়ার উপযুক্ত কল্পনাশক্তি।

সব দেশে এবং সব কালে শিক্ষা মানুষ তৈরির শ্রেষ্ঠ মাধ্যম-রূপে স্বীকৃত হয়েছে। কাজেই বাস্তব জীবনে মননশীল হওয়ার জন্য একজন ব্যক্তির যে ধরনের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠা দরকার একমাত্র শিক্ষাই তার আস্তর সুনিশ্চিত করতে পারে। অবশ্য এ ব্যাপারে শুধুমাত্র প্রথাগত ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই যথেষ্ট নয়। সব দেশেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াও অনানুষ্ঠানিক স্তরে যে শিক্ষা চলে একজন ব্যক্তির সমস্ত জীবন জুড়ে, যে শিক্ষার মাধ্যম হল একদিকে পরিবার অন্যদিকে সমাজের প্রচলিত শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারা—সেই পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষার অবদানও নিতান্ত সামান্য নয়। তবে এ বিষয়ে সুফল পেতে হলে সব ধরনের শিক্ষার মধ্যেই যথোপযুক্ত আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রতি সচেতন আনুগত্য থাকা নিতান্ত প্রয়োজন।

যে স্বাতন্ত্র্যবোধ মানুষের মননশীলতায় উত্তরণের প্রাথমিক সোপান, তা প্রকৃতপক্ষে নিজের মনুষ্যত্বের অপরিসীম মূল্য সম্পর্কে মানুষের অবিচল উপলব্ধি ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থায় যদি মনুষ্যত্বের মহৎ আদর্শ বারে-বারে ঘোষিত না হয়, যদি যান্ত্রিক শিক্ষার নিগড়ে আবদ্ধ শিক্ষার্থী তার মনুষ্যজীবনের উৎকর্ষ অনুভব করে ধন্য বোধ করার অবকাশ না পায়, তাহলে প্রাপ্ত শিক্ষার সহায়তায় তার ব্যবহারিক প্রয়োজন মিটতে পারে, কিন্তু তার মনের অন্ধকার দূর হবে না এবং এমতাবস্থায় তার আত্মচেতনার গতি রুদ্ধ হবে। আবার এই আত্ম-চেতনার অভাবে অনিবার্যভাবেই ব্যাহত হবে তার আত্মবিশ্বাস, যা মানুষকে সাহসী করে, সংগ্রামী করে এবং উদ্বুদ্ধ করে যাবতীয় প্রতিকূলতাকে পরাভূত করে বিজয়গৌরব লাভের আকাঙ্ক্ষায়। আবার প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থায়, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় এবং সেইসঙ্গে পারিবারিক জীবনচর্যাতেও কোনো-না-কোনো ভাবে বিশুদ্ধ জ্ঞানস্পৃহার জাগরণ অন্যতম লক্ষ্য হওয়া দরকার। কারণ এই জ্ঞান-পিপাসাই মানুষকে গতানুগতিকতার অবসাদ থেকে মুক্ত করে তাকে জিজ্ঞাসু করে, কৌতূহলী করে এবং প্রবৃত্ত করে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অনুসন্ধানে। কাজেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা যদি নিছক রুটিনসর্বস্ব হয়, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রবক্তারা যদি সমাজজীবনে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে রাখার দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে তথা-কথিত বিনোদনের লক্ষ্য অনুসরণ করেন এবং পরিবার-গুলি যদি জ্ঞানসঞ্চয়ের মহত্তর আদর্শ বিস্মৃত হয়ে কেবলমাত্র বস্তুগত স্বার্থের পিছনে ধাবিত হয়, তাহলে এইসব উৎস থেকে লব্ধ শিক্ষার প্রভাবে ব্যক্তিমানুষ বিনা প্রশ্নে তার পরিপার্শ্বকে মেনে নিতে দ্বিধা বোধ করে না। এই আপোস ও আত্মসমর্পণে অভ্যস্ত মানুষ স্বভাবতই জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে পরিচয় দেয় তার সংগ্রামবিমুখতার।

আরও উল্লেখ্য যে, আদর্শ শিক্ষা মানুষের মনের সংকীর্ণতা দূর করে তাকে উদার করে তোলে। মনন-শক্তির জাগরণে এই উদারতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কারণ আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, একদিকে বিশাল প্রকৃতিজগৎ এবং অন্যদিকে ব্যাপক সমাজজীবন—এই দুইয়ের সঙ্গে নিবিড়, দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক স্বীকার করে নিয়ে দৈনন্দিন প্রয়োজনের নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে বৃহত্তর ও বহুমুখী কর্ম-

ধারায় যুক্ত হতে না পারলে মননের ক্রিয়াপরিধি প্রসারিত হয় না। অর্থাৎ, কবির ভাষায়, 'আত্মমগ্ন যে জন বিমুখ বৃহৎ জগৎ হতে সে কখনও শেখে নি বাঁচিতে।' যথার্থ শিক্ষাই পারে মানুষকে এই আত্ম-মগ্নতার বন্ধন থেকে মুক্ত করে তাকে বিশ্বজনীন ও সমাজমনস্ক অনুভূতির উদারতায় অভিষিক্ত করতে, এবং মননের এই মুক্ত ও উদার প্রেক্ষাপটেই চলে মানুষের বিশ্বলোক ও সমাজজীবন সম্পর্কিত অনুসন্ধান, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ—যার মধ্য দিয়ে স্বভাবতই উজ্জীবিত হয় তার কল্পনাশক্তি ও সংগ্রামী মানসিকতা।

তিন

এই আলোচনার ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্তটি অনিবার্য হয়ে ওঠে তা হল এই যে, আমাদের দেশে সাম্প্রতিক কালে সমাজজীবনের সর্বস্তরে যে মননশীলতার সঙ্কট দেখা দিয়েছে, তার মূলে রয়েছে আমাদের চরম ত্রুটি-পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষা নিয়ে আমাদের দেশে আলোচনা, সমালোচনা ও পরিকল্পনা নিতান্ত কম হয় নি এবং শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে অনেক পদক্ষেপই দেখা গেছে গত একচল্লিশ বছরে। কিন্তু শিক্ষাকে মানুষের আত্মশক্তি উদ্বোধনের যথোপযুক্ত মাধ্যম রূপে ব্যবহার করতে আমরা আদৌ শিখি নি। আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষায় এবং স্কুল- কলেজ - বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির পরিণামে ও বস্তুগত স্বার্থের প্রাবল্যে চিত্ত ও মননের সুষ্ঠু বিকাশের বিষয়টি নিদারুণভাবে উপেক্ষিত। এই কারণেই এদেশে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অনেকেই যথার্থ যুক্তিবাদী ও তীক্ষ্ণ-মননসম্পন্ন মানুষ হয়ে উঠতে পারেন না, এবং সামাজিক ক্রিয়াকর্মে সততই পরিলক্ষিত হয় মনন-শীলতার মন্বন্তর।

ব্যক্তিজীবনে পারিবারিক শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। পরিবারে প্রচলিত আচার, আচরণ ও অভ্যাসের প্রভাবে পরিবারস্থ তরুণ সদস্যদের যে মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে, বাকি জীবনের বহুমুখী সামাজিকীকরণ-প্রক্রিয়ার সচলতা সত্ত্বেও তা কতকাংশে অপরিবর্তিত থাকে সারা জীবন ধরে। কাজেই, পারিবারিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে যদি নিরন্তর মনুষ্যত্বের মহদাদর্শে যথোপযুক্ত গুরুত্ব আরোপিত হয়, তাহলে জীবনের প্রাথমিক পর্বেই একজন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধে উদ্দীপ্ত হওয়ার সুযোগ পায়। দুর্ভাগ্য-ক্রমে আমাদের বর্তমান পারিবারিক শিক্ষায় মনুষ্যত্ব উন্মেষের এই জরুরি প্রশ্নে কোনো গুরুত্বই দেওয়া হয় না। অধিকাংশ পরিবারেই যাঁরা প্রবীণ ও নিয়ন্তা তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হল যে-কোনো উপায়ে বস্তুগত স্বার্থসিদ্ধি এবং জাগতিক সাফল্য লাভ। এই লক্ষ্য-পূরণের প্রমত্ত নেশায় স্বাভাবিকভাবেই বিসর্জিত হয় মহৎ মনুষ্যত্ববোধ এবং নীচতা, সংকীর্ণতা ও স্বার্থ-পরতার ভিড়ে ভূলুণ্ঠিত হয় যাবতীয় মানবিক সদ্-গুণ। এই অবস্থায় পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে তরুণেরা যে শিক্ষা পায় তা তাদেরও আকৃষ্ট করে নিছক বিষয়সুখে, যার ফলে উদার মনুষ্যত্বে সঞ্জীবিত হওয়ার কোনো প্রেরণাই তারা পায় না পরিবারের জীবনধারা থেকে। এইভাবে আমাদের পারিবারিক শিক্ষা একজন ব্যক্তির জীবনের শুরুতেই তার মননের সুস্থ বিকাশে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

আমাদের সমাজে যাঁরা শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, অর্থাৎ, যাঁরা লোকশিক্ষার স্বীকৃত কাণ্ডারী, তাঁদের ভূমিকাও এ ব্যাপারে খুবই হতাশা-জনক। এঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আত্মমুখী শিল্প-সর্বস্বতায় বিশ্বাসী, যার ফলে লোকশিক্ষার সামাজিক দায়িত্ব ও অঙ্গীকার সম্পর্কে এঁরা আদৌ সচেতন নন। এ ছাড়া শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি এখন স্পষ্টতই পর্যবসিত হয়েছে ব্যবসায়ের সামগ্রীতে। আজকের একজন লেখক বা শিল্পী যতটা আগ্রহী তাঁর নিজের সৃষ্ট শিল্পকর্মের বহুল বিপণনে, ঠিক ততটাই তিনি উদাসীন সমাজকল্যাণের বৃহত্তর দায়িত্ব সম্পর্কে।

সাধারণত, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে সমাজে যথার্থ মননসম্পন্ন, আত্মসচেতন মানুষ গড়ে তোলার কাজ তিনি নিজের এক্তিয়ার-বহির্ভূত বলে মনে করে থাকেন। সহজতম উপায়ে জনচিত্তের বিনোদন এবং বিনিময়ে প্রতিষ্ঠা, খ্যাতি ও অর্থ লাভ —এই হল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। এর দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি হল এই যে, আমাদের সামাজিক শিক্ষা এখন অন্তঃসারশূন্য যা মানুষের প্রবৃত্তি ও আবেগকে আন্দোলিত করতে পারে কিন্তু তার মননে সৃষ্টিশীল সক্রিয়তার ঝড় তুলতে পারে না।

তবে সবচেয়ে মারাত্মক গলদ লক্ষ করা যায় আমাদের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায়। আমাদের দেশে প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত যে শিক্ষা- ও পরীক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তা এমনই আদর্শহীন, উদ্দেশ্যহীন এবং প্রাণহীন যান্ত্রিকতায় আচ্ছন্ন যে, শিক্ষার্থীর মননশক্তির বিকাশে কার্যত তার কোনো অবদান নেই। বস্তুত, মননশক্তি ও মনুষ্যত্ববোধের উদ্বোধনই যে শিক্ষার অন্তিম লক্ষ্য—এই কথাটা শিক্ষার্থীর কাছে বারে-বারে পৌঁছে দিয়ে তদনুযায়ী তার চরিত্রগঠনের কোনো প্রয়াসই পরিলক্ষিত হয় না আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায়। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা এমনই আনন্দহীন ও আঙ্কিকসর্বস্ব যে শিক্ষার্থীর কাছে তা এক বিভীষিকা। এই ভয়ের পরিমণ্ডলে আবদ্ধ হওয়ার ফলে শিশুদের সরল ও সুকুমার চিত্তবৃত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ব্যাহত হয় তাদের স্বাভাবিক কল্পনাপ্রবণতা যার ফলে শিক্ষার প্রারম্ভিক পর্বেই তাদের বুদ্ধি ও মন আক্রান্ত হয় জড়তায়। অন্যদিকে আমাদের উচ্চশিক্ষা এখন মূলত কেরিয়ারকেন্দ্রিক যা শিক্ষার্থীর কৃৎকৌশলগত দক্ষতা অর্জনের সহায়ক হতে পারে, কিন্তু মানবিক সদ্‌গুণ জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে যার কোনো ভূমিকা নেই। শিক্ষার প্রত্যক্ষ দায়িত্বে আছেন যে শিক্ষককুল, তাঁরাও এ ব্যাপারে নিরুদ্বিগ্ন থাকাই শ্রেয় বলে মনে করেন। তাই দেখা যায় যে, বিভিন্ন স্তরের পাঠক্রম ও সংশ্লিষ্ট মূল্যায়ন-রীতি এমনভাবে প্রণীত যে কিছু তত্ত্ব ও তথ্য মুখস্থ করতে পারলেই এবং লিখিত প্রশ্নোত্তরকালে সেগুলি সাজিয়ে-গুছিয়ে পরিবেশন করতে পারলেই একজন বিদ্যার্থী সাফল্যের তকমা লাভ করতে পারেন। এই-ভাবে প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে বেরিয়ে আসছেন হাজার-হাজার ডিগ্রিধারী ভ্রান্ত শিক্ষার প্রভাবে, যাঁদের চিন্তাস্রোত গতিহীন, যাঁদের কল্পনা-শক্তি ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা অতীব ক্ষীণ এবং বন্ধ্যা মননশীলতার কারণে যাঁরা সৃষ্টিশীল সংগ্রামে বিমুখ।

আমাদের সমাজে আজকের তরুণ প্রজন্মের আলস্য ও উদ্যোগহীনতা, ভীরুতা ও সংগ্রামবিমুখতা সম্পর্কে প্রবীণ প্রজন্ম অনেক সময় আক্ষেপ করে থাকেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, এর জন্য তরুণেরা প্রকৃতপক্ষে দায়ী নন। আজকের তরুণ সম্প্রদায়ের প্রকৃতি ও চরিত্রে যেসব দুর্লক্ষণ প্রকট হয়ে উঠেছে, যথার্থ মননশীলতার অভাবই সেগুলির অন্যতম কারণ এবং মননের এই দুর্বলতার জন্য দায়ী আমাদের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষাকে মনন ও মনুষ্যত্ব বিকাশের সর্বোত্তম মাধ্যমরূপে স্বীকার করে নিয়ে আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পুনর্বিন্যাসে উদ্যোগী না হলে মননশীল মানুষের অভাবে সমাজের সর্বক্ষেত্রে যে একদিন অচলাবস্থা দেখা দেবে, এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

বাংলাদেশের খুলনা সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যাপিকা শ্রীমতী মেহেরুননেসা মহুয়ার এক জিজ্ঞাসার উত্তরেই বর্তমান নিবন্ধ রচিত হয়েছে। তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাই।
—লেখক

পরিবার-পরিকল্পনার মানসিকতা

অতীন্দ্রমোহন গুণ

এক

১৯৩৮ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেন, 'আমরা যেখানে বর্তমান জনগোষ্ঠীর জন্যই খাদ্য, বস্ত্র ও শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারছি না, দারিদ্র্য, অনশন ও ব্যাধিতে যেখানে সারা দেশ বিপন্ন, সেখানে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস চালিয়ে যেতেই হবে।'[১] এর অল্পদিন পরই কংগ্রেসের উদ্যোগে পণ্ডিত জওহরলালের নেতৃত্বে জাতীয় পরি-কল্পনা কমিটি গঠিত হল। ১৯৪০-এর মে মাসে পরি-কল্পনা কমিটির কাছে জনসংখ্যা-সংক্রান্ত সাব-কমিটি যে-প্রতিবেদন পেশ করলেন তার আলোচনাশেষে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর মধ্যে দুটি প্রস্তাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

[এক] 'আমরা এ-ব্যাপারে একমত যে জাতীয় আর্থনীতিক পরিকল্পনার প্রশ্নে ভারতীয় জনগোষ্ঠীর আয়তন একটি মৌল বিষয়। কারণ জীবনধারণের উপায়গুলির সঙ্গে সঙ্গতি না রেখে একে অবাধে বাড়তে দিলে জীবনমানের অবনতি ঘটবে এবং এর ফলে বহু সামাজিক ও উন্নয়নমূলক ব্যবস্থাও বিঘ্নিত হবে।'

[দুই] 'সামাজিক অর্থনীতি, পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য ও জাতীয় পরিকল্পনার স্বার্থে পরিবার-পরিকল্পনা ও সন্তানসংখ্যা সীমিত রাখা অত্যাবশ্যক, এবং রাষ্ট্রের উচিত এসব ব্যাপারে উৎসাহদানের নীতি গ্রহণ করা.....।'[২]

দেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর আর্থনীতিক যোজনা কর্মসূচীর রূপায়ণ আরম্ভ হলে প্রথম থেকেই সে-কর্মসূচীতে পরিবার-পরিকল্পনা একটি মুখ্য স্থান পেয়েছে। আর এ-গুরুত্ব উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। বস্তুত, প্রথম যোজনায় (১৯৫১-৫৬) পরিবার-পরি-কল্পনা খাতে বরাদ্দ ছিল মাত্র ৬৫ লক্ষ টাকা, আর সমকালীন সপ্তম যোজনায় (১৯৮৪-৮৯) বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৬,৪০০ কোটি টাকা।

মনে রাখতে হবে যে, ভারতের মতো দেশে জনাধিক্য জাতীয় সমস্যা হলেও সভ্যসমাজে এ-সমস্যার সমাধান খুঁজতে হয় ব্যক্তিক স্তরে, পারিবারিক স্তরে। অর্থাৎ, যেহেতু বেশ কিছু মানুষকে মেরে ফেলে বা মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে সমস্যার সমাধান খোঁজা সভ্যসমাজের রীতিনীতির পরিপন্থী হবে, তাই প্রতি দম্পতিকে পরিবারের আয়তন সীমিত রাখার যৌক্তিকতা সম্পর্কে সচেতন করার প্রয়োজন হয়। আর দম্পতিদের জাতিগত লাভ-লোকসানের কথা বললে কাজ হয় না, তাদের বলতে হয় তাদের নিজস্ব লাভ-ক্ষতির কথা। পরিবারের আয়তন বড়ো হলে কী ক্ষতি বা অসুবিধা হতে পারে, আর সন্তানসংখ্যা অল্প হলে কী লাভ বা সুবিধা—এটাই তাদের বুঝিয়ে বলতে হয়। জাতির আর্থনীতিক বিকাশের পথে বিরাট জনসংখ্যা এবং তার উচ্চ-বৃদ্ধিহার বড়ো অন্তরায়, জনাধিক্য পরিবেশদূষণের সমস্যাকে জটিলতর করে তোলে, প্রাকৃতিক সম্পদের বিনাশ ত্বরান্বিত করে—এসব কথা সাধারণ ভারতবাসীকে বলার অর্থ হয় না। বরং তাদের বলতে হয়, পরিবার-পরিকল্পনার—অর্থাৎ অল্পসংখ্যায় সন্তানোৎপাদন এবং পর-পর দুবার সন্তানধারণের মধ্যবর্তী সময়কে দীর্ঘায়িত করার—ফলে তাদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক দিক থেকে কী মঙ্গল সাধিত হবে।

তাই জনসংখ্যানিয়ন্ত্রণ অভিযানে বলা হচ্ছে 'ছোটো পরিবার সুখী পরিবার।' বলা হচ্ছে, পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা আর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে সন্তান-সংখ্যা যথাসম্ভব অল্প রাখতে হবে (বলা হচ্ছে 'হাম দো, হামারা দো'—এটাই প্রকৃষ্ট নীতি)। একই কারণে জননীর স্বাস্থ্যের খাতিরেও পর-পর দুটি সন্তান-ধারণের মধ্যবর্তী সময়কে যথেষ্ট দীর্ঘ রাখা সমীচীন—এ-কথাটাও জনসাধারণকে মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

প্রচারের কাজে বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যম ব্যবহৃত হচ্ছে। সংবাদপত্র, আকাশবাণী, দূরদর্শন, চলচ্চিত্র, যাত্রা আর পুতুলনাচের—এমন-কী রাস্তাঘাটে, যান-বাহনে সুদৃশ্য বিজ্ঞাপনের—সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে পরিবার-পরিকল্পনা নিয়ে পরামর্শ-দানের ব্যবস্থা হয়েছে। দেশের গ্রামগুলিতে পরামর্শ-দানের কাজে গ্রামসেবক ও গ্রামসেবিকাদেরও নিয়োগ করা হচ্ছে।

একই সঙ্গে পরিবার-পরিকল্পনার নানা সরনজাম—যেমন, 'কনডম', 'লুপ', 'পিল'—প্রায় বিনামূল্যে আগ্রহী দম্পতিদের সরবরাহ করার ব্যবস্থা হয়েছে। নির্বীজকরণ ও বন্ধ্যাকরণের ব্যবস্থা এখন শুধু সহজ-লভ্যই নয়, এখন অস্ত্রোপচারে যে পুরুষ বা মহিলা সম্মত হবেন তাঁকে খানিকটা আর্থিক পুরস্কারদানেরও সংস্থান রাখা হয়েছে। একবার ভ্রূণসঞ্চার হয়ে গেলে গর্ভনিষ্কাশনের মধ্য দিয়ে সন্তানজন্ম পরিহারের সুযোগ সহজলভ্য হয়েছে। ১৯৭১ সালে 'মেডিক্যাল টার্মিনেশন অব প্রেগন্যান্সি অ্যাক্ট' বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে গর্ভনিষ্কাশনের জন্যে হাতুড়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে প্রাণসংশয় ঘটানোর আর প্রয়োজন হয় না। হাসপাতালের সুষ্ঠু পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানেই এখন গর্ভনিষ্কাশন ঘটানো যেতে পারে।

দুই

পরিবার-পরিকল্পনা নিয়ে জোর প্রচারাভিযান এবং সাজসরনজাম সরবরাহের সুব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও জনসংখ্যানিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আমাদের সার্বিক সাফল্য খুব চমকপ্রদ, এমন বলা ঠিক হবে না। বস্তুত, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপিনস প্রভৃতি দেশের সরকার পরিবার-পরিকল্পনা কর্মসূচী রূপায়ণে উদ্যোগী হন এ-দেশের প্রায় এক দশক পরে। কিন্তু তাঁরা ই তমধ্যে যোগ্য দম্পতিদের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগকে কর্মসূচীর ছত্রচ্ছায়ায় নিয়ে এসেছেন। আমাদের দেশে কিন্তু এ-অনুপাত ১৯৮৮ সালের হিসেবেও শতকরা মাত্র ৩৫-এর মতো। তাই আমাদের

অভিযান আরও জোরদার করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সরকারি হিসেবে অবশ্য বলা হয়েছে যে, কর্মসূচীর কল্যাণে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত ৭ কোটি ৬৪ লক্ষ শিশুর জন্ম রোধ করা সম্ভব হয়েছে। (অর্থাৎ পরিবার-পরিকল্পনা কর্মসূচী না থাকলে জনাধিক্যের সমস্যা এখন যেমন রয়েছে তার চেয়েও জটিলতর রূপ নিত।) কিন্তু আমাদের জনসংখ্যার শতকরা বার্ষিক বৃদ্ধিহার এখনও ২·১ বা ২·২। এ-হার পৃথিবীর যে-কোনো প্রাগ্রসর দেশের তুলনায় তো বটেই, এমন-কী চীনের তুলনায়ও অনেক ঊর্ধ্বে। (১৯৮৩-৮৪ সালে এ-হার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিল ০·৭, সোভিয়েত ইউনিয়নে ০·৯, ব্রিটেনে ০·০, জাপানে ০·৭, ফ্রান্সে ০·৪, পশ্চিম জার্মানিতে —০·২ এবং চীনে ১·১। আর ভারতের মোট জনসংখ্যা ইতিমধ্যেই ৮০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। ফলে, ভারত যদিও এখন পৃথিবীর জনবহুল দেশ হিসেবে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে, একুশ শতকের দ্বিতীয় দশক নাগাদ এ-দেশ প্রথম স্থানে চলে যাবে—এমন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এর কারণ কী?

কারণ হল কর্মসূচীর সাফল্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করে পরিবার-পরিকল্পনা সংক্রান্ত জ্ঞান ও সাজসরনজাম প্রয়োগের অনুকূল মানসিকতার উপর। এমন মানসিকতা সাধারণভাবে আমাদের সমাজে সঞ্চার করা—অন্ততপক্ষে সমাজের বৃহত্তর অংশে সঞ্চার করা—এখন পর্যন্ত সম্ভব হয় নি।

বলা যায়, ভারতীয় সমাজের অপেক্ষাকৃত উচ্চবিত্ত মানুষ পরিবার-পরিকল্পনা অভিযানে সোৎসাহে সাড়া দিয়েছেন। এমন মানুষদের মধ্যে আছেন শিল্পপতি ও শিল্প-পরিচালক, ডাক্তার, এনজিনীয়র, চার্টার্ড অ্যাকাউনট্যান্ট, উচ্চপদের সরকারি কর্মচারী, বড়ো কাগজের সাংবাদিক আর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। এসব মানুষ তাঁদের উচ্চ জীবনমান উচ্চতর করার মানসে 'ছোটো পরিবার সুখী পরিবার' আপ্ত-বাক্যকে মহোৎসাহে অনুসরণ করছেন। তাঁরা বিচার করতে বসেন, একটা গাড়ি বা ফ্রীজ বা রঙিন দূরদর্শন সেট কেনা উচিত হবে, না (আর) একটি সন্তানলাভ। প্রায়শই তাঁরা প্রথম বিকল্পটির অনুকূলেই সিদ্ধান্ত নেন। অনেক ক্ষেত্রে আবার এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে স্ত্রীদের সৌন্দর্যচেতনাও কাজ করে। এঁদের বাড়িতে গেলে দেখা যাবে পরিবারে মাত্র একটি বা দুটি সন্তান রয়েছে—প্রায় ক্ষেত্রেই মাত্র একটি সন্তান। অর্থাৎ আমাদের সমাজের এই উচ্চতর অংশে পশ্চিমী সমাজের মতোই অল্প সন্তানসংখ্যা স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে।

পক্ষান্তরে, সমাজের অপেক্ষাকৃত অনালোকিত অংশে বা সমাজের নীচুতলায়—গরিব কৃষিক, ছোটো ব্যবসায়ী, বস্তিবাসী দিনমজুর এবং চাষী ও অন্য গ্রামীণ মানুষদের ক্ষেত্রে—পরিবার-পরিকল্পনার অনুকূল মানসিকতা এখনও শেকড় গাড়তে পারে নি। যেহেতু এঁরাই আমাদের সমাজের শতকরা অন্তত ৮০ জন মানুষ, তাই ভবিষ্যতে পরিবার-পরিকল্পনা কর্মসূচী ঢেলে সাজানোর সময়ে সমাজের এই নীচুতলার কথা বিশেষ করে মনে রাখতে হবে।

মানসিকতা সঞ্চারের কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, জোর-জবরদস্ত করে সমাজের নীচু-তলার মানুষদের পরিবার-পরিকল্পনা গ্রহণে বাধ্য করা যায় ঠিকই, কিন্তু এভাবে তাৎক্ষণিক কিছু চমকপ্রদ সাফল্য দেখানো গেলেও পরিণামে এর ফল বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। সামাজিক-আর্থনীতিক বিকাশের কাজ ব্যাহত হয়, আর জনসংখ্যানিয়ন্ত্রণের কর্মসূচীও এর ফলে বিঘ্নিত হয়। ১৯৭৫-৭৭ সালের জরুরি অবস্থার শেষে জনতা সরকারের দিনগুলিতে এমনটিই ঘটেছিল। চীনদেশের সাম্প্রতিক কালের অভিজ্ঞতা থেকেও এটা বোঝা যায়। সেখানে জোর করে এক সন্তানের পরিবার আদর্শ হিসেবে চালানোর ফলে শিশুকন্যা-হত্যার মতো পাপনীতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, ফলে সরকার পিছু হটতে বাধ্য হয়েছেন।[৩]

তিন

সমাজের নীচুতলায় পরিবার-পরিকল্পনা অভিযানে আশাপ্রদ অগ্রগতি কেন সম্ভব হয় নি, তা বুঝতে হলে দেখা দরকার সন্তানের জন্মদানকালে সাধারণ পিতা-মাতার মনে কী ধরনের ভাবনা ক্রিয়াশীল থাকে।

সন্তানলাভে সকল পিতামাতার ক্ষেত্রেই একটা মানসিক সন্তোষ মেলে, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। মানবজীবনের একটি অপরিহার্য কর্মসম্পাদনে—মনস্তাত্ত্বিকের ভাষায়, প্রজাতি-সংরক্ষণ (race preservation)-এ তাঁরা সক্ষম, এটা দেখাতে পেরে তাঁদের মর্যাদাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয়। সন্তানরা মধুর সাহচর্য দিয়ে পিতামাতার জীবনকে পূর্ণতা দান করে, এ-কথাটাও উপলব্ধি করা দরকার। বস্তুত, আধুনিক কালের পারমাণবিক পরিবারপ্রথায় বাড়িতে সন্তান না থাকলে কথা বলার লোকেরই অভাব হয়ে দাঁড়াবে।

দ্বিতীয়ত, সাধারণ মানুষের চোখে একটি অতিরিক্ত সন্তানের জন্মদান শুধু অতিরিক্ত কিছু দায়িত্ব কাঁধে নেওয়া নয়, তার রুজিরোজগারের কাজে অতিরিক্তি সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও বটে। কারণ, স্বল্পবিত্ত পরিবারে একটি সন্তানের—বিশেষ করে পুত্রসন্তানের—জন্ম হলে মনে করা হয় পরিবারের সীমিত আয় বাড়াবার একটি অতিরিক্ত উপায় হল। সাধারণ দিনমজুর বা দোকানি বা সাধারণ চাষির কাজে তার সন্তান—বিশেষ করে পুত্রসন্তান—বেশ অল্প বয়স থেকেই যোগ দেয়—প্রথমে ফাই-ফরমাস খাটে, পরে নিজেই ছোটোখাটো কাজ জোগাড় করে নেয়। যেমন নিজেই ভুকর্ষণে, বীজবপনে, ফসলের পরিচর্যায়, শেষে ফসল কাটার কাজে হাত লাগায়।

তৃতীয়ত, পশ্চাৎপদ সমাজে সন্তানকে অন্য একটি ভূমিকাও পালন করতে হয়। পিতামাতার বার্ধক্যে যখন তাঁদের উপার্জন বন্ধ হয়ে যায়, তখন সন্তানকেই তাঁদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে হয়। সন্তানলাভের সময়ে ভবিষ্যতের এমন সুরক্ষা সৃষ্টির কথাটাও নিশ্চয় পিতামাতার মনে থাকে।

এখন, অধিক সন্তানের জন্মদান পরিহার করেও মানুষের সৃজনস্পৃহা চরিতার্থ করার নানা উপায় আছে—শিল্পসাহিত্য তো বটেই, এমন-কী বস্ত্রবয়নের মতো কারুকর্মের মাধ্যমেও এ-উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। তবে এ-সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করতে হলে, তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা সঞ্চার করতে হলে শিক্ষার প্রসার দরকার।

নাবালক সন্তানের উপার্জনের সাহায্যে সংসারে সচ্ছলতা আনার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় যদি প্রাপ্ত-বয়স্করাই যথেষ্ট পরিমাণে উপার্জন করতে পারেন। এজন্যে পর্যাপ্ত সংখ্যায় কর্মসংস্থান দরকার, দরকার প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের জন্যেও উপযুক্ত সংখ্যায় কর্ম-সৃষ্টি। অন্যভাবে বলা যায়, এজন্যে সামগ্রিক জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ও তার ন্যায়সঙ্গত বণ্টন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

বার্ধক্যের নির্ভরপ্রাপ্তির লক্ষ্য নিয়ে অধিক সন্তানোৎপাদনের প্রয়োজন থাকে না যদি সন্তানদের দীর্ঘজীবনলাভ সম্বন্ধে পিতামাতা যথেষ্ট নিশ্চয়তাবোধ করতে পারেন। এজন্যে জনস্বাস্থ্য-ব্যবস্থা ও চিকিৎসা-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে শিশুমৃত্যুহারের হ্রাস ঘটানোর জন্যে সন্তানজন্মের আগে আর পরে মাতার স্বাস্থ্য এবং নবজাত শিশুর স্বাস্থ্যের প্রযত্নের লক্ষ্যে কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় হয়।

রাষ্ট্র যখন তার উপার্জনে অক্ষম বৃদ্ধ নাগরিকদের ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, তখন সন্তানের এ-ভূমিকা গৌণ হয়ে পড়বে (যেমন হয়েছে পশ্চিমের সমাজতান্ত্রিক ও মূলধনতান্ত্রিক উভয়প্রকারের দেশ-গুলিতে)। অর্থাৎ পশ্চিমী ধাঁচে একটি সুষ্ঠু সামাজিক-নিরাপত্তা-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে বার্ধক্যে সন্তানদের উপর নির্ভরতার প্রয়োজনে অধিক সন্তানের জন্মদান অনাবশ্যক হয়ে পড়বে।

তাই পরিবার-পরিকল্পনার অনুকূল মানসিকতা

সৃষ্টির জন্যে যে কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে জনশিক্ষার প্রসার, বিশেষ করে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার—যার ফলে সন্তানধারণ এবং সন্তান-পালন ছাড়াও নারীর আত্মবিকাশের বিকল্প পন্থা বর্তমান—এ-বোধ তাদের মনে সঞ্চারিত হতে পারে আর পরিবার-পরিকল্পনার উদ্দেশ্য আর উপায় তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে অধিকসংখ্যায় কর্ম-সংস্থান, নারীদের জন্যেও পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান, উৎকৃষ্ট জনস্বাস্থ্যব্যবস্থা, উন্নত এবং সহজলভ্য চিকিৎসাব্যবস্থা এবং সামাজিকনিরাপত্তাব্যবস্থা। ঐতিহ্যমুখী গ্রামীণ সমাজ ত্যাগ করে শহরবাসী হলেও মানুষের মধ্যে এমন মানসিকতা সঞ্চারিত হয় বলে বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে।

চার

উপরে প্রয়োজনীয় মানসিকতা সঞ্চারের যে-কৌশল উপস্থাপিত হল তার রূপায়ণে অনেক পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। অর্থাৎ এ-কৌশলের সবকটি অংশকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে আর্থনীতিক সমৃদ্ধি অত্যাবশ্যক। যেমন, নগরায়ণের কথা যা বলা হয়েছে, তা পরিকল্পনামাফিক করা না হলে শহরগুলি বাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে এবং পরিবার-পরিকল্পনার প্রতিকূল মানসিকতাই উজ্জীবিত হবে। পর্যাপ্ত সংখ্যায় কর্মসংস্থান করতে হলে বা সামাজিকনিরাপত্তাব্যবস্থা চালু করতে হলেও জাতীয় আয়ের যথেষ্ট মাত্রায় বৃদ্ধি-সাধন আবশ্যক হয়। আমাদের দেশে কিন্তু কর্ম-হীনতার সঙ্গেই রয়েছে ব্যাপক দারিদ্র্য। ফলে, কর্মক্ষম পুরুষের জন্যেই যেখানে যথেষ্ট সংখ্যায় উপযুক্ত কাজ পাওয়া অসম্ভব, সেখানে মহিলাদের কর্মসংস্থানের কথা বলা বাস্তব অবস্থার দিকে চোখ বুজে থাকা ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের বর্তমান আর্থনীতিক পরিস্থিতিতে সামাজিকনিরাপত্তাব্যবস্থা চালু করাও অসম্ভব।

কিন্তু শুধু জনশিক্ষা এবং সুষ্ঠু জনস্বাস্থ্যব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারলেই যে অনুকূল মানসিকতা সৃষ্টির কাজ অনেকদূর এগিয়ে নেওয়া যায়, তা পৃথিবীর নানা দেশের অভিজ্ঞতা থেকে সপ্রমাণ হয়েছে। আমাদের দেশে কেরলরাজ্যের অভিজ্ঞতা থেকেও আমরা এ-বিষয়ে খানিকটা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

কেরল কোনোমতেই আমাদের দেশের সমৃদ্ধতর রাজ্যগুলির অন্যতম নয়, বরং আর্থনীতিক মানদণ্ডে তাকে পশ্চাৎপদ বলা চলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে-রাজ্যে জনশিক্ষাপ্রসারের কাজটিকে বেশ কয়েক দশক ধরে খুব গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে সে-রাজ্যে সাক্ষরতার হার ১৯৮১-র আদমশুমারির সময়ে ছিল পুরুষদের ক্ষেত্রে শতকরা ৭৫·৩ আর মহিলাদের ক্ষেত্রে শতকরা ৬৫·৭। (সারা দেশের বেলায় কিন্তু একই সময়ে এ-হার ছিল যথাক্রমে শতকরা মাত্র ৪৬·৯ ও ২৪·৮।) প্রবীণ অর্থনীতিবিদ্ ড. ভবতোষ দত্ত তাঁর সাম্প্রতিক পুস্তক "আট দশক"-এ লিখেছেন, 'কোচিন থেকে সমুদ্রের উপকূল ধরে যে রাজপথ সেই পথে চলেছি কন্যাকুমারী। রাস্তায় একটু পরে-পরেই বই-খাতা হাতে ছেলেমেয়ের দল। কেরলে শিক্ষা-প্রসারের পরিসংখ্যান জানতাম, কিন্তু শিক্ষাবিস্তার যে এখানে স্পষ্ট দৃশ্যমান তাও বুঝলাম। আর প্রত্যেকের হাতে একটা খবরের কাগজ।'[৪]

জনস্বাস্থ্যের বিষয়টিকেও সেখানকার সরকার—তা প্রাক্তন মহারাজার সরকারই হোক, কংগ্রেস সরকারই হোক আর কমিউনিস্ট সরকারই হোক—যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। কেরলের চিকিৎসাব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেখানকার গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতেও ভালো ডাক্তার, ওষুধপত্র ও সাজ-সরঞ্জাম রাখা হয়। এর ফলে অত্যন্ত গুরুতর ধরনের অসুস্থতা ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে রোগীকে শহরের বড়ো হাসপাতালে নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। শিশুমৃত্যুহারের দিকে তাকালে এর সুফল স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বার্ষিক শিশুমৃত্যুহার

বলতে বোঝায় কোনো বর্ষে প্রতি হাজার নবজাতকে শিশুমৃত্যুর (অর্থাৎ জীবনের প্রথম বছরে মৃত্যুর) সংখ্যা। ১৯৮৪ সালে সারা দেশে এ-হার ছিল ১১৪ (শহরাঞ্চলে ৬৫, গ্রামাঞ্চলে ১২৪), কিন্তু কেরলে তা কয়েক বছর আগেই ৫০-এর নীচে নেমে আসে। সামগ্রিক মৃত্যুহারও সারা দেশের বেলায় ছিল শহরাঞ্চলে প্রতি হাজার মানুষে ৭·৭ আর গ্রামাঞ্চলে ১৩·০ ; কিন্তু কেরলে শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চল উভয়-ক্ষেত্রে এ-হার ছিল প্রতি হাজার মানুষে ৬·৭।

কেরলে জনশিক্ষানিয়ন্ত্রণের কাজে জনশিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত এসব ব্যবস্থার শুভ প্রভাব লক্ষণীয়ভাবে পড়েছে। কেরলরাজ্যের দম্পতিরা সাগ্রহে ও বিপুলসংখ্যায় পরিবার-পরিকল্পনা কর্মসূচীর অংশীদার হচ্ছেন। ১৯৭১-৮১-র দশকে সারা দেশে জনসংখ্যাবৃদ্ধি পায় শতকরা ২৫·০ হারে, আর কেরলে বৃদ্ধিহার ছিল ১৯·২। ১৯৮৪ সালের পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে সারা দেশে জন্মহার তখনও প্রতি হাজার মানুষে ৩৩, অন্যদিকে কেরলে এ-হার ছিল হাজার মানুষে ২৫·৬।

সাম্প্রতিক কালে দুজন সমাজবিজ্ঞানী—কে. মহাদেবন ও এম. সুমঙ্গল—তাঁদের গবেষণার ভিত্তিতে যে-সিদ্ধান্তে এসেছেন তার দিকেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যেতে পারে। অন্ধ্র আর্থনীতিক দিক থেকে কেরলের তুলনায় বেশ খানিকটা অগ্রসর রাজ্য। (যেমন, ১৯৭৪-৭৫ সালে কেরলে মাথাপিছু আয় ছিল ৮৬১ টাকা আর অন্ধ্রে ১,০০৩ টাকা, এ-দুয়ের অনুপাত প্রায় ১০ : ১২।) কিন্তু কেরলে জন্মহারের দ্রুত হ্রাস ঘটেছে, অন্যদিকে অন্ধ্রে জন্মহার এখনও বেশ উঁচুতে রয়েছে (১৯৮৩ সালে শহরাঞ্চলে এ-হার ছিল প্রতি হাজার মানুষে ২৭·২ আর গ্রামাঞ্চলে ৩১·৫)। তাই তাঁদের প্রশ্ন ছিল : কীভাবে কেরল তার জনসংখ্যা বা জনসংখ্যার বৃদ্ধিহার সীমিত রাখতে সক্ষম হয়েছে?

তাঁদের অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে গবেষকদ্বয় কেরলের একটি গ্রাম ও অন্ধ্রের একটি গ্রাম বেছে নিয়েছিলেন। নৃতাত্ত্বিক (anthropological) ও সমীক্ষা (survey)—এই উভয় ধরনের তথ্য-আহরণপদ্ধতির সমন্বয়ে তাঁরা দেখাতে সক্ষম হয়েছেন যে, কেরলে প্রজননশীলতা দ্রুত হ্রাসের পেছনে মুখ্য বেশ কিছু সামাজিক-আর্থনীতিক কারণ কাজ করেছে। এগুলো হল বিয়ের বয়সের ঊর্ধ্বমান, শিশুমৃত্যুহারের নিম্নগতি, স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনার ব্যাপক পরিকাঠামো, জন্মশাসনের নানা পদ্ধতির বহুল ব্যবহার এবং পরিযাণ (migration)।

এ-দুই লেখক অন্য কয়েকটি কারণের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিছু পরিবারকে দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করে তাঁরা দেখিয়েছেন পুত্রসন্তান, না কন্যাসন্তান, এমন পছন্দাপছন্দ কেরলের গ্রামটির পিতামাতাদের কাছে গৌণ, তাঁরা কিছু নিকটাত্মীয়ের প্রতি দায়িত্বপালন স্বাভাবিক কর্তব্য বলে মনে করেন; নারীরা সে-সমাজে অধিকতর মর্যাদার অধিকারী; এবং সেখানে আধুনিকতার ব্যাপকতর প্রসার ঘটেছে। এ-সবকিছুই সেখানে জন্মহারের হ্রাস-সাধনে সহায়ক হয়েছে। অন্ধ্রের গ্রামটির বেলায় এসব তেমন প্রভাব ফেলতে পারে নি।

লেখকদ্বয় তাঁদের গবেষণার আলোকে সারা ভারতের (বা অন্য বিকাশশীল দেশের) জন্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণোপযোগী উন্নয়নের যে-মডেল উপস্থাপিত করেছেন তার মধ্যেও সামাজিক বিকাশ ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে, আর্থনীতিক বিকাশের উপর ততটা নয়।[৫]

লাতিন আমেরিকার দুই দেশ, কিউবা ও ব্রাজিলের পরিস্থিতিরও তুলনা করা যেতে পারে। কিউবা আর্থনীতিক মানদণ্ডে মোটেই সমৃদ্ধ দেশ নয়, কিন্তু সেখানকার সমাজবাদী সরকার সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সঙ্কল্পবদ্ধ, তাই শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের যথেষ্ট সংস্থান রেখেছেন এবং এসব সুবিধার সমবণ্টনের ব্যবস্থা করেছেন। পক্ষান্তরে, ব্রাজিলের সমৃদ্ধি সত্ত্বেও সেখানে আয়বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শিক্ষা বা জনস্বাস্থ্যের সুযোগ গরিব মানুষের কাছে তেমন পৌঁছতে পারে নি। এর ফলে কিউবায় জন্মহারের দ্রুত হ্রাস ঘটেছে; ব্রাজিলে কিন্তু এ-হারের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নি।[৬]

উল্লেখপঞ্জী

১. Subhaschandra Bose : *Crossroads-Works of Subhaschandra Bose, 1938-40*, (পৃ ১৪)। Asia Publishing House, Bombay, 1962.

২. National Planning Committee : *Population, Report of the Sub-Committee*, (পৃ ১৪৪-৫)। Vora & Co., Bombay, 1947.

৩. — "Chinese move to stop female infanticide", *The Statesman*, Calcutta (September 9, 1988). (এ-প্রসঙ্গে *The Statesman*-এ ১২ সেপটেমবরের সম্পাদকীয় নিবন্ধ "*Unwanted Daughters*"-ও দ্রষ্টব্য।)

৪. ভবতোষ দত্ত : "আট দশক" (পৃ ২২০)। প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্, কলকাতা, ১৯৮৮।

৫. Mahadevan, K. and Sumangal, M. : *Social Development, Cultural Change and Fertility Decline—A Study of Fertility Change in Kerala*. Sage Publications India, New Delhi, 1987.

৬. Solas, R. and Valentei, D. (ed.) : *Population and Socio-Economic Development* (পৃ ১২৩)। Progress Publishers, Moscow, 1986.

[নিবন্ধে উল্লেখিত পরিসংখ্যান ভারত সরকার প্রকাশিত *India 1986*, *Family Welfare Bulletin* এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘ-প্রকাশিত *Demographic Year Book* থেকে নেওয়া হয়েছে।]

উদ্‌ধৃতিচিহ্নের ব্যবহার

উদ্‌ধৃতিচিহ্ন আছে দু-রকম—এক-এক আঁকড়ির (‘ ’) আর দুই-দুই আঁকড়ির (“ ”)।

যেখানে লেখকের বা বক্তার কথা উদ্‌ধৃত করা হবে, সেখানে "চতুরঙ্গে" আমরা এক-এক আঁকড়ির চিহ্ন ব্যবহার করব। যেমন, কবি ভূমিকায় লিখছেন, 'নীল রঙে আমার গভীর আনন্দ, তাই এই ফুলের বাণী আমার যাতায়াতের পথে প্রতিদিন আমাকে ডাক দিয়ে বারে বারে স্তব্ধ করেছে।'

উদ্‌ধৃতির মধ্যে উদ্‌ধৃতি দিতে হলে, দুই-দুই আঁকড়ি লাগানো হবে।

বই বা পত্রিকার নামের সঙ্গে দুই-দুই আঁকড়ি : "বিষবৃক্ষ", "মহুয়া", "তিন সঙ্গী", "বঙ্গদর্শন", "ভারতী", "প্রবাসী"।

প্রবন্ধ, গল্প বা কবিতার নাম লেটারস্পেস করে দেওয়া হবে : ঝুলন, বর্ষশেষ, সভ্যতার সঙ্কট।

অনৈসর্গিক

বিরাম মুখোপাধ্যায়

জানতে কি এই জাদুময় ছুরি ও কাঁচির খেলা?
অবাধ্য অস্থির কোলেস্টোরাল এ-বেলা ও-বেলা
সূক্ষ্মনালী ধমনীর প্রাণবাহী রক্তের উশ্রীতে
চর্বির শিকড়পিণ্ড তালগোল পলকে জমাট

যমদূত-পরোয়ানা এই বুঝি শিয়রে দাঁড়িয়ে—
এ ম্যাজিক-ছুঁচ জানে বিনষ্ট বুকের নিরাময়
দ্বিমাত্রিক পেথিডিন, শল্যবিদ্ হাজার তস্কায়
আতঙ্কেরে আপাতত টুঁটি চেপে ধরেছে কব্জায়।

পকেটমারের মুখ হুঁশিয়ার সতর্ক যাত্রীরা
ভিড়ভাড়াক্কায় ঠিক চিনে নেয় আঁচে ও আন্দাজে
আড়িপাতা গোয়েন্দা-চাহনি—ম্যাজিক-কাঁচির ধার;
ওস্তাগর দর্জির কাঁচি কিন্তু আড়ে ও ওসারে

সড়গড় অতিক্ষিপ্র কৌণিক কুশলী কাটছাঁটে
ঢ্যাড়া মোটা সেলাইয়ে ষোলোআনা থাপ খেয়ে যায়
কেপ্‌মার বাট্‌পাড় উলঙ্গ উন্মাদ ইস্‌তক্
উঠ্‌তি-নচ্ছার আর ইতরকে ভদ্দর বানায়।

এই ছুঁচ-ছুরি-কাঁচি দৈবজ্ঞের চেতাবনী নয়,
মস্তিষ্কের পুরনো খিলুকে চেঁচেপুছে পালটিয়ে
মেধা আর মনীষার মিহি আলোড়ন-বিলোড়ন
তুলিআঁকা জোড়াভুরু টিকলো নাকের রোমকোঁড়া

সময়ে পায় নি কোনো টোট্‌কার বিহিত শুশ্রূষা
শতাব্দীর শেষ পাদে বিষাক্ত স্ফোটক চিরে ফেড়ে
পচা পুঁজ ক্যাত্‌রানি সাফ করে ছুরির ম্যাজিক
এ-যাত্রায় মুমূর্ষুকে কন্দর্পের কান্তি ফিরে ছায়।

আরশুলা নেঙ্‌টি ইঁদুর আর শিকারী বিড়াল
সহঅবস্থান কিংবা কুটুম্বিতা কখনো সম্ভব?
হাতির পায়ের থাবা নিরুপায় ঘাসফড়িঙের
ইচ্ছামৃত্যু; রাতের প্যাঁচার খাদ্য মাছি ও মাকড়

তুরুপের টেক্কা খোঁজে আচ্ছাদক আদাড়ে পাঁদাড়ে;
সমুদ্রগভীরে ধাবমান তিমি-র চোখের টর্চে

ঝাঁক-ঝাঁক হেরিঙের অক্সিজেন অনটন হ'লে
লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে মরে দৈত্যতুল্য ঢেউয়ের আছাড়ে—
অনিসর্গ মৎস্যগন্ধ তাতল সৈকত ছায় কোনো
নোঙরের সুনিশ্চিত সাবলীল জীবনের মানে

না কি ছুটন্ত উল্কার চক্রনেমি-ছোঁয়া অভিশাপ॥

যেখানেই যাই

আল মাহমুদ

যেখানেই যাই, কী যেন খুঁজতে খুঁজতেই যাই।
সবুজ মাঠে তরমুজগুলো মানুষের মুখের কুটিলতাকে
লজ্জা দিতে চুপচাপ পড়ে থাকে। আমি তরমুজের
স্তব্ধ বিদ্রূপ সহ্য করতে পারি না বলে সেদিকে তাকাই না।
কারণ আমাদের উভয়ের অভ্যন্তরেই তো রয়েছে লাল লজ্জা।
অবশ্য আমার শরমটা কেন যে তরমুজের মতো ঠাণ্ডা নয়,
কাকে জিজ্ঞেস্ করি?
মনে হয় সারা জীবন কিছু একটা জিজ্ঞেস করব বলেই তো
খুঁজতে খুঁজতে যাওয়া। নয় কি?
—কত মাঠ, গোপাট আর
গ্রাম পার হলাম। প্রশ্ন না করতেই পাখিরা ঝাঁক বেঁধে কত
উত্তর দিয়ে গেল। মাটির ভেতর থেকে শব্দ করে উঠল
আর্দ্র পতঙ্গের দল। বাঁশঝাড়ের পরদা সরিয়ে দেখলাম
গাঁয়ের মাঠে পূর্ণিমার পেঁচারা আমাকে কত যে উত্তর দিতে
চাইল। প্রহরে প্রহরে বেজে উঠল আমার খোঁজার জবাব
কিন্তু আমার কালা একভাষী কান কিছুই তো অনুবাদ করল
না। শুধু ভাবল, সুন্দর সুন্দর। শুধু বলল, গান গান।

তরমুজের মাঠে এসে একটু বিশ্রাম নিই। কী আর খুঁজব?
এখানে প্রাণ, পতঙ্গ ও উদ্ভিদের জবাবটা অনুবাদ করার
মতো কাউকে তো পেলাম না পৃথিবীতে। শেষ পর্যন্ত একটা
পাকা তরমুজের কাছে বসে ফলটিকে দুখণ্ড করে দেখি
আমি যা চাই তার চেয়েও অর্থবহ ফাঁক খুলে দিয়ে
লাল হয়ে আছে তৃপ্তি।

যে দূরত্বে ইতিহাস

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

যে দূরত্ব চোখের দৃষ্টিকে স্পষ্ট করে
সে দূরত্ব পেতে আর কতদূর যাব?
দূরত্বেই ইতিহাস প্রতিষ্ঠিত হয়—এ তত্ত্বই
বুদ্ধকে সত্য করে তুলেছিল এবং তাঁর শিক্ষা
করেছে অস্বীকার। অর্থাৎ সমকালের প্রতি
নির্ণীত নেই কোনো দায়। নিকট স্বজনের কাছেও।
অতএব দূরত্ব সৃষ্টি করি পিছু হটে অথবা
দলছুট হয়ে—চরণে নয়নে আড়াআড়ি।
তবু সে স্বচ্ছ দৃষ্টি কই দূরত্বেও যারে চিনে নেব।
সমকাল দূরে সরে যায়। কবে যে ইতিহাস হব?

উত্তরাধিকার

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

যে প্রিয় প্রতিবেশী খুশির ঈদে দিল
আমাকে উপহার এবং ভালোবাসা
আমিও তাকে দিই দশমী পার হলে
অথচ বাঁকা চোখে এখন দেখি তাকে
সেও তো দেখে আজ তেমনি আঁকাবাঁকা

জীবনে রঙ নেই কেবল সন্দেহ
এবং সংশয় পিতৃপিতামহ
রেখেছে উত্তরে এই কি অধিকার!
তাকেই নিয়ে যাব আগামী কাল ভোরে
এমন অবেলায় স্বপ্ন দেখা ভালো!

নদীতে যাই যদি তেমনি নদী যায়
যেমন গিয়েছিল সুদূর ইতিহাসে
রক্তে ভাসা নদী স্নানের সুখ দিল
খরার মুখ মুছে সবুজ ফসলের
জননীসম্ভবা দিনের পাটরানী।

ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক-আন্দোলন, ১৮২৪-১৯২০

বিনয় চৌধুরী

৯.৫

সাঁওতাল মানসিকতার রূপান্তরে ছুটি বিশিষ্ট পর্যায় লক্ষ করা যায়। দেবতার আবির্ভাবের ঘটনার ঠিক পরে সাঁওতালদের দীর্ঘদিনের সংশয় কেটে যায় বটে; কিন্তু বিদ্রোহের মানসিকতা তখনও গড়ে ওঠে নি। স্পষ্টত সিধু-কানু তখনও দিখুগোষ্ঠী আর ব্রিটিশ-রাজের সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘর্ষের কথা ভাবে নি।

নূতন রেলপথ বানানোর কাজে নিযুক্ত সাঁওতালদের তখনকার মনোভাব সম্পর্কে টেলরের প্রতিবেদন[১২৯] গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নিজেই দেখেছেন, ওই ঘটনার কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে সাঁওতাল অঞ্চলে কী বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

'এর ফলে বহু সাঁওতাল রেলপথ বানানোর কাজ ছেড়ে চলে যায়; পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, তারা ভয়ানক আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। তাদের বলা হয়েছিল, তারা যেন যত সম্ভব শীগগির গঙ্গা পার হয়ে চলে যায়। এর পর আবার কিছুদিন সব শান্ত। জুন মাসের (১৮৫৫) শেষ পর্যন্ত নূতন ঠাকুর সম্পর্কে আর কিছু শোনা যায় নি। তখনই শুনতে পেলুম, আবার ঠাকুরের আবির্ভাব ঘটেছে; আর সহস্র-সহস্র সাঁওতাল তাকে দেখার জন্য যাচ্ছে; লুঠতরাজ বা খুনখারাপি সম্পর্কে একটা কথাও শুনি নি।'

কেন সিধু-কানু সঙ্গে-সঙ্গেই বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত নেয় নি, তার একটা কারণ—তাদের এ গভীর বিশ্বাস যে, ভগবদ্-নির্দেশ-সংবলিত তাদের ঘোষণার কথা জানতে পেরে ব্রিটিশরাজ, মহাজন ইত্যাদি শত্রুরা সতর্ক হবে; তাদের ভুল শুধরে নিয়ে সাঁওতালদের আর হেনস্তা করবে না। নেতাদের ধারণা ছিল, সাঁওতালদের আর্জি, আবেদন-নিবেদন তারা হেলায় উপেক্ষা করেছে; কিন্তু ঐশী নির্দেশ তারা অমান্য করবে না। বিদ্রোহের কিছুদিন আগে সিধু-কানু তাদের সবাইকে পরোয়ানা মারফত সতর্ক করে দিয়েছিল। সম্ভবত, দেবতার আবির্ভাবের পরে-পরেও এসব পরোয়ানার মূল কথা সবাইকে জানানো হয়ে-

ছিল।[১৩০]

নেতাদের প্রত্যাশা বিফল হল। শত্রুরা তাদের পরোয়ানা গ্রাহ্যই করল না। সহিংস বিদ্রোহ ছাড়া আর কোনো পথ নেতাদের সামনে খোলা রইল না।

৯.৬

বিদ্রোহের আগে সাঁওতাল মানসিকতার একটা দিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মূল উদ্দেশ্য এবং উপায় সম্পর্কে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সাঁওতালরা একইরকম-ভাবে ভাবছিল। রাজপুরুষদের কাছে বিভিন্ন অঞ্চলের সাঁওতালের সাক্ষ্য এবং বীডওয়েল কমিশনের[১৩১] কাছে নানা জমিদার, নীলকর, য়ুরোপীয় ইত্যাদিদের লিখিত প্রতিবেদন থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায়। পুনরাবৃত্তি থাকলেও আমরা বিভিন্ন ধরনের এ সাক্ষ্যের কিছু-কিছু উদ্ধৃত করব। বিদ্রোহের মানসিকতা কী অল্প সময়ের মধ্যে সব সাঁওতাল অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল, এতে বোঝা যায়।

উদ্ধৃতিগুলি দেবার আগে এ মানসিকতার কয়েকটা বিশিষ্ট ধর্মের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হবে।

(ক) দেবতার আবির্ভাবের ঘটনা সম্পর্কে সাঁওতালদের বিশ্বাস সর্বব্যাপী। কিন্তু কী ঘটেছিল তা নিয়ে নানা জনের নানা ধারণা।

(খ) নেতাদের ঘোষণায় দিব্যশক্তির অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে; সাঁওতালদের সপক্ষে এ শক্তির হস্তক্ষেপে প্রবল শত্রুকুলের পরাভব অনিবার্য; সীমিত শক্তি সত্ত্বেও সাঁওতালরা থাকবে অপরাজেয়।

(গ) বিদ্রোহের ফলে সাঁওতালরাজের প্রতিষ্ঠা হবে; হবে ন্যায়ধর্মের জয়, আর দিথু-শাসন-শোষণের অবসান।

(ঘ) এরই সঙ্গে ঘটবে ব্রিটিশ-রাজের বিলোপ। কিন্তু বহুব্যাপ্ত এ ক্ষমতার বিনাশের উপায় সম্পর্কে সাঁওতালদের কোনো পরিষ্কার ধারণা ছিল না।

(ঙ) বিদ্রোহের ফলে য়ুরোপীয় 'সাহেব'গোষ্ঠীও নিরমূল হবে।

(চ) সাঁওতালরাজের সমাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল কিছুটা স্ব-বিরোধী। একদিকে তারা বলছে, দিথুরা নিশ্চিহ্ন হবে। কিন্তু নেতাদের নানা ঘোষণা থেকে মনে হয়, তারা শুধু চাইত, দিথুদের কাজকর্মের উপর সাঁওতালরাজের নিয়ন্ত্রণ; যেমন জমির খাজনার 'ন্যায়সঙ্গত' হার ঠিক করবে এ নূতন রাজ; পুরনো কায়দায় মহাজনি কারবার চলতে দেওয়া হবে না।

সাঁওতালদের নূতন বিশ্বাসের জগৎ সিধু-কানুর ঘোষণা এবং নির্দেশকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল বলে আমরা তাদের কিছু পরোয়ানা বা নির্দেশ প্রথমে উদ্ধৃত করব।

বীরভূম ম্যাজিস্ট্রেটের লেখা (২৪ জুলাই ১৮৫৫) এক চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি, আগের দিন সন্ধ্যাবেলা এক বৃদ্ধা রমণী বিদ্রোহীদের সদর কার্যালয় থেকে এক পরোয়ানা এনে জেলার সদরে দিয়ে যায়।[১৩২] সম্ভবত সেটা কিছুদিন আগের লেখা—বিদ্রোহ শুরু হবার (৭-১০ জুলাই) আগে তো বটেই। সিধু-কানুর স্বাক্ষরিত এ পরোয়ানার মূল ঘোষণা সাঁওতালদের তখনকার চিন্তাভাবনাকে গভীর-ভাবে প্রভাবিত করেছিল।

'বাগনাদিহির বাসিন্দা কানু ও সিধু। সিধু, কানু এবং তাদের ভাইদের বাড়িতেই ঠাকুর দেখা দিয়েছেন। ঠাকুর যাই বলেছেন, সবটুকুই দূর আকাশ থেকে এসেছে; কানু মাঝি ও সিধু মাঝি যা বলেছে, তাই ঠাকুর। ঠাকুর বলেছেন: "গরিব লোকেরাই যুদ্ধ করুক; কানুমাঝিকে তা করতে হবে না; ঠাকুর নিজেই যুদ্ধ করবেন; তোমরা ঠাকুরের কাছে থেকে যুদ্ধ করো; গঙ্গামা ঠাকুরের কাছে যাকে পাঠাবেন, তিনি অগ্নিবৃষ্টি ঘটাবেন; ঠাকুরের করুণা নিয়ে যারা থাকতে রাজি, তারা যেন গঙ্গা পার হয়ে যায়…" ঠাকুরের নির্দেশ, প্রতি বলদের (হালের) জন্য এক-আনা, প্রতি মোষের (হালের) জন্য দুআনা খাজনা ধার্য হবে। ধর্ম ও বিচারের যুগ শুরু হবে। বেধর্মী

কাজ যারা করবে, পৃথিবীতে তারা আর থাকতে পারবে না। মহাজনরা পাপ করেছে; তারা অন্যায় কাজ করেছে। সব আইনকানুনকে আমলারা অকেজো করে রেখেছে; এটা সাহেবদের পাপ; সাহেবরা ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব নেন বটে; আসলে তাদের নায়েব-সেজওয়ালরাই তদন্তটা করে; আর জোরজুলুম করে ঘাট, আশি টাকা আদায় করে নেয়। এটা সাহেব-দের পাপ; এজন্যই ঠাকুরের নির্দেশ, দেশের শাসন-ভার আর সাহেবদের ওপর থাকবে না। তোমরা যদি এ হুকুম না মান, পরোয়ানা মারফত তোমাদের যা বলার আছে বলবে; তোমরা সাহেবরা যদি হুকুম মানতে রাজি থাক, তাহলে গঙ্গার অপর পারে থাকবে; না মানলে গঙ্গার এপারে থাকতে পারবে না। আকাশ থেকে অগ্নিবৃষ্টি ঝরবে; নিজের হাতেই ঠাকুর সাহেবকুলকে খতম করে দেবেন; তোমাদের বন্দুক আর গুলি সাঁওতালদের গায়েই লাগবে না; ঠাকুরই তাদের অস্ত্রের যোগান দেবেন;…যদি তোমরা সাঁওতালদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, দেখবে দুদিন, দুরাত একদিন একরাতের মতোই কেটে যাবে।'

১০ই শ্রাবণ ১২৬২ সালে ভাগনাদিহি থেকে রাজমহলের 'সাহেব'দের কাছে পাঠানো'[১৩৩] আর একটা 'ঠাকুরের পরোয়ানা'য় উপরে উদ্ধৃত পরো-য়ানার বেশ কিছু অংশ অন্তরভুক্ত করা হয়েছে। বাকি অংশটা একরকম:

'…সাহেব ও গোরা সৈন্যরা লড়াই করবে, কানু ও সিধু মাঝি করবে না। ঠাকুর নিজেই যুদ্ধ করবে। সাহেব আর সৈন্যরা, তোমরা ঠাকুরের সঙ্গে লড়বে; ঠাকুরের সাহায্যের জন্য মা-গঙ্গা আসবেন…সত্যযুগ শুরু হয়েছে; সত্যিকারের ন্যায়বিচার এবার প্রতিষ্ঠিত হবে। যারা সত্যভাষী নয় এই পৃথিবীতে তাদের থাকতে দেওয়া হবে না।'

'পুনঃ আমি অগ্নিবৃষ্টি ঝরাব; ঠাকুর নিজ হাতে সব সাহেবদের খতম করবে; তোমরা বন্দুক নিয়ে যুদ্ধ করলেও গুলি সাঁওতালদের গায়ে লাগবে না; তোমাদের হাতি-ঘোড়া সব ঠাকুর সাঁওতালদের দিয়ে দেবেন।'

ভাগলপুর বিভাগের কমিশনারের এক চিঠি[১৩৪] থেকে জানা যায়, বিদ্রোহীদের মধ্যে প্রচারিত 'ঠাকুরে'র বাণী-সংবলিত একটা চিরকুট পূর্ণিয়াতে ধরা পড়েছে। উপরে উল্লেখিত পরোয়ানার কোনো-কোনো বিষয় এখানেও বলা হয়েছে, বিশেষ করে ব্রিটিশবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে ঠাকুরের প্রত্যক্ষ ভূমিকার কথা:

'ভাগনাদিহি থেকে দুজন ঠাকুর যাবেন; ঠাকুরের নিজের নাম এসেছে আকাশ থেকে। সুবা ঠাকুর স্বেচ্ছায় যাবেন। কেষ্টঠাকুর, আর রামচন্দ্র, যার বাহু উপরদিকে তোলা—এ-দুই ঠাকুর যাবেন। ঠাকুরের নিজের নামই যুদ্ধ করবে। ঠাকুরের আদেশেই রায়তেরা মাদল বাজায়; য়ুরোপীয় সৈন্য আর ফিরিঙ্গীদের মুণ্ড তিনিই কাটবেন; ঠাকুর নিজেই যুদ্ধ করতে আগ্রহী। ঠাকুরের যুদ্ধ বারো দিনের মধ্যেই শুরু হবে। ঠাকুর নিজেই এ পরোয়ানা পাঠিয়েছেন; দুরাত একরাতে আর দুদিন একদিনে পারণত হবে। ঠাকুরের এ নির্দেশ।'

বিদ্রোহ শুরু হবার ঠিক পরেই সাঁওতাল মানসিকতায় যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে, তা বীডওয়েলের কাছে টেলরের লিখিত প্রতিবেদন থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়।[১৩৫]

'জুলাইয়ের ছয় বা সাত তারিখ নাগাদ আমি শুনতে পেলুম, সাঁওতালরা অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করছে; তারা তখন বলতে শুরু করেছে, এবার তাদের রাজত্ব কায়েম হবে; আর বাকি সবাইকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে। তারপর খবর এল তারা দারোগা, এবং আরো পনেরো-ষোলো জনকে খুন করেছে… দশই জুলাই পর্যন্ত পঞ্চাশ জনের মতো সাঁওতাল আমার সঙ্গে ছিল। সেদিন সবাই একসঙ্গে আমার কাছে এসে বলে, তাদের ঠাকুর খবর পাঠিয়েছে, তারা যেন তৎক্ষণাৎ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চলে আসে;

না হলে তাদের প্রাণসংশয় ঘটবে; তাই তাদের যেতেই হবে। কারও সম্পর্কে তারা কোনো অভিযোগ করে নি; তাদের যেতে হবে, কারণ তা ঠাকুরের হুকুম। ঠাকুরের খবর যে নিয়ে এসেছিল, সে তখনও রান্না করছিল। আমি তাকে ধরতে চেষ্টা করেছি; কিন্তু খাবারদাবার উনুনের উপর রেখেই পালিয়ে গেছে সে। এই সাঁওতালরাই মাত্র দু-একদিন আগে তাদের জন্য ঘর বানিয়ে দিতে কতই না অনুনয়-বিনয় করেছে; বলেছে তারা গ্রাম ছেড়ে এসে শ্রীকুণ্ডে থাকবে। আর আমার জন্য কাজ করবে (রেলপথ বানানোর কাজ)। এখন শুনলুম, তারা পরের দিন আমাদের আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছিল···তারা ···আরও খবর পাঠিয়েছে, সুবার চড়ার জন্য আমার একটা ঘোড়া তাদের চাই; ঠাকুরের নৈবেদ্য হিসেবে আমার মুণ্ডুটাও দরকার।'

তাদের সঙ্গে কথাবার্তা থেকেই[১৩৬] টেলর সাঁওতালরাজের আসন্নতা সম্পর্কে তাদের ধারণার কথা জানেন।

'এসবের (বিদ্রোহ, হিংসা ইত্যাদি) কারণ, তাদের এক দেবতা নাকি সশরীরে আবির্ভূত হয়েছেন; তাঁর অভিপ্রায়, ভারতবর্ষের এ এলাকায় তিনি রাজত্ব করবেন।'

ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর নানা আঞ্চলিক অধিনায়ক এবং অন্যান্য রাজপুরুষদের কাছে বন্দী সাঁওতালদের সাক্ষ্য থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি, সিধু-কানুদের নানা ঘোষণা আর নির্দেশ কী গভীরভাবে তাদের অনুপ্রাণিত করেছিল। তারা সবাই বলেছে, সাঁওতাল-রাজের আসন্নতা সম্পর্কে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস তাদের সব কর্মপ্রয়াসকে উদ্দীপিত করেছে। এ ধরনের কিছু সাক্ষ্য আমরা উদ্‌ধৃত করছি।

বিদ্রোহ শুরু হবার দু-একদিনের মধ্যেই (৯ জুলাই) ঔরঙ্গাবাদের সাব-ডিভিশন্যাল অফিসার ইডেন গুপ্তচর সন্দেহে এক সাঁওতালকে আটক করেন। তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে লেখা ইডেনের এ প্রতিবেদন:[১৩৭]

'বিদ্রোহীরা উদ্দেশ্য হিসেবে বলছে, সব য়ুরোপীয় এবং প্রতিপত্তিশালী দেশীয় লোকদের খতম করবে··· দিনে চার-পাঁচটা গ্রাম লুট করছে। তারা বলছে, এ সবই ভগবানের নির্দেশে; এক শিশুর বেশে তার আবির্ভাব; তারা এ শিশুকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়; এ শিশুই ভগবান এবং রাজার মতো দেশশাসন করবে ···প্রধান নেতার নাম সিধু, তারা ফৌজের কথা বলছে; সিপাহী এবং উচ্চপদাসীন সেনানায়ক, ফৌজের এ দুই ভাগ। স্পষ্টত, এটা সুপরিকল্পিত এবং সংঘবদ্ধ বিদ্রোহ···আমার নিশ্চিত ধারণা, কারো প্ররোচনা না হলে এটা ঘটতে পারত না···'

এর পরের দিন (১০ জুলাই) ইডেন আরো কিছু জানতে পারেন।[১৩৮]

'তারা বলছে, তারা সরকার বা জমিদারের জন্য কোনো কাজই করবে না। জমির জন্য তারা নির্দিষ্ট একটা হারে মাত্র খাজনা দেবে···প্রতিটি পুলিশ-বরকন্দাজ এবং কোমপানির সঙ্গে যুক্ত সবাইকে তারা খুন করবে বলছে।'

তিনজন সাঁওতাল নদীয়া বিভাগের কমিশনারকে বলে[১৩৯]: '···সিধু ও কানুর নির্দেশে তারা জমায়েত হয়েছে···এ দুই প্রধান নেতা ভগবানের আদিষ্ট প্রতিনিধি···তাদের উদ্দেশ্য, সারা মুলুক তারা দখল করে নেবে। তারা ভালোই জানত, তাদের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনী পাঠানো হবে; কিন্তু সিধু-কানু তাদের বলেছেন, বন্দুক থেকে শুধুমাত্র জল বেরুবে।'

সিউড়ির দারোগা পাঁচজন সাঁওতাল মাঝিকে গ্রেপ্তার করে বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের কাছে নিয়ে আসে। তাদের সাক্ষ্য:[১৪০]

'তারা আমাকে বলল, বিদ্রোহের একটামাত্র কারণ, তাদের মনের উপর সুবার (স্বাধীন সাঁওতাল-রাজ) কল্পনার অনন্যসাধারণ প্রভাব। কানুমাঝির নির্দেশেই ভাগলপুর থেকে এসে এসব কথা প্রচার করেছে।···তারা (পাঁচ মাঝি) সুবাকে (কানুমাঝি)

কখনও দেখে নি; তারা নামও শোনে নি; [সুবা নামেই অনেকে কানু / সিধুকে জানত]; কিন্তু সাঁওতালরা আবার এক মহান জাতিতে পরিণত হবে, এ কল্পনায় তারা পরম উল্লসিত হয়েছিল; তাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, (লড়াইয়ের সময়) কেউ তাদের কাছে দাঁড়াতেই পারবে না; তাদের কেউ মরবে না; মরলেও তারা আবার জীবন ফিরে পাবে; [ব্রিটিশ] সৈন্যের বন্দুকের গুলি জল হয়ে যাবে; (তাদের) একটা ছোটো ছুরিরও এমন অলৌকিক ক্ষমতা থাকবে যাতে বিশালসংখ্যক বিপক্ষদল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।'

আসলে, বিদ্রোহ শুরু হবার অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সাঁওতালরা বিশ্বাস করতে শুরু করে, সাঁওতাল-রাজ শুধুমাত্র অস্পষ্ট কোনো ধারণা নয়, একান্তই বাস্তব সত্য।

১৫ জুলাইয়ে লেখা বীরভূম ম্যাজিসট্রেটের চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি[১৪১]: 'দামিন-ই-কো এবং রাজমহল পাহাড় থেকে বিশেষ দূতেরা এসে বীরভূমের আপামর সাঁওতাল সম্প্রদায়কে রাজদ্রোহে উদ্‌বুদ্ধ করেছে···সাঁওতালরা ঘোষণা করেছে, তারা এখন সারা দেশের মালিক; য়ুরোপীয়দের তারা নিশ্চিহ্ন করে ছাড়বে; ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে তারা বদ্ধপরিকর। কোনো গ্রাম লুঠ করার পর তারা চামড়ার তৈরি দুটো পতাকা উড়িয়ে দেয়; এটা তাদের সার্বভৌমত্বের প্রতীক।'

'প্রত্যক্ষদর্শী'দের সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে লেখা[১৪২] (১৫ জুলাই) ভাগলপুর বিভাগের কমিশনারের চিঠিতেও এ ধরনের ঘোষণার উল্লেখ আছে: 'কোম্পানির জমানা শেষ; তাদের সুবার রাজত্ব শুরু হয়ে গেছে।'

নূতনরাজের সঙ্গে নূতন রাজার ধারণা অনিবার্য-ভাবে সম্পৃক্ত। রাজকীয়তা সম্পর্কে সাঁওতালদের ধারণা মুর্শিদাবাদ ম্যাজিসট্রেটের এক চিঠি (১৩ জুলাই) থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়: 'জানতে পেরেছি, বিদ্রোহীরা এক রাজা নির্বাচিত করেছে; তাকে পালকি করে তারা নিয়ে যায়; সঙ্গী পারিষদবর্গের পোশাক ও ভাবভঙ্গি রাজকীয় মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতি-পূর্ণ।'[১৪৩]

সাঁওতালদের কোনো-কোনো রাজনৈতিক কর্ম-সূচীতে "সুবা" সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস প্রতিফলিত। বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের কাছে লেখা এক চিঠিতে (৩ অগস্ট) এ সম্পর্কে খানিকটা জানা যায়: 'অনেক সাঁওতাল মৌর নদীর উত্তরে কোমুরাবাদে জড়ো হয়েছে। নানা জমিদারি এলাকাকে তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিচ্ছে; দারোগাদের নিয়োগ করা হয়ে গেছে; ভূমিজ এবং অন্যান্য রায়তদের চাষবাস সম্পর্কে নির্দেশ জারি করা হয়েছে···বলদ-টানা হালের উপর চার আনা, আর মোষ-টানা হালের উপর আট আনা রাজস্ব ঠিক হয়েছে।'[১৪৪]

বস্তুত বিদ্রোহ চলায় সময় 'সুবা' সম্পর্কে প্রচার কখনও থামে নি। (এক অর্থে 'সুবা' সাঁওতালরাজ; অন্য অর্থে সাঁওতালদের রাজা)। পরে-পরে সিধু-কানুর মতো স্থানীয় নেতাদেরও অনুগামীরা 'সুবা' ডাকত। এরকম এক সুবা তিনপাতার শালের ডাল পাঠিয়ে সবাইকে জানায় (সেপটেমবর), শীগগির সে সিউড়িতে যাবে; রায়তেরা যাতে ভয়ে না পালিয়ে যায়। এ ঘোষণা স্থানীয় সাঁওতালদের মধ্যে নূতন এক উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। বীরভূম কালেকটর লেখেন (২২ সেপটেমবর): 'তারা ঘোষণাটা পেয়েছে; এর ভিত্তিতে রটিয়ে দিয়েছে, ফিরিঙ্গিদের রাজত্ব শেষ; কাকেও তারা ডরায় না।'[১৪৫]

বিদ্রোহের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নেতারা খোলাখুলি সবাইকে একই কথা বলেছে; এ বিষয়ে কোনো গোপনীয়তা ছিল না। অসাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোকদেরও বিদ্রোহীদের লক্ষ্য এবং কাজকর্ম সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ছিল। রাজপুরুষদের কাছে তাদের এবং সাঁওতালদের সাক্ষ্যে বিশেষ কোনো গরমিল নেই।

ঔরঙ্গাবাদের সহ-ম্যাজিস্ট্রেট (৯ জুলাই) শেখ সাম্মু নামক একজনের সাক্ষ্য নেন[১৪৬] :

'ভাগনাদিহিতে মাটি ফুঁড়ে এক ঠাকুরের আবির্ভাবের ঘটনা শুনে আমি দিন তেরো আগে তা দেখতে যাই। সেখানে দেখি প্রায় হাজার সাতেক সাঁওতালের জমায়েত—তাদের হাতে ধনু, তীর আর তলোয়ার। আমি তাদের ঠাকুরের কথা জিজ্ঞেস করাতে কানু সাঁওতাল এবং তার দুই ভাই বললে, এ ঘরেই ঠাকুর দেখা দিয়েছেন; আমাকে লেখা এক কাগজের টুকরো দেখিয়ে বললে, ঠাকুরই এটা তাদের দিয়েছেন; ঠাকুর আরও বলেছেন, এ মুলুক পাপে ভরে গেছে; ঠাকুর তাই তাদের রাজত্ব দিলেন; যারা তাদের শাসন মানবে না, তাদের মেরে ফেলা হবে, এবং তাদের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হবে; ইংরেজদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে। আমি বললুম, এ-কাগজ তো ভগবান থেকে পাওয়া নয়; কোনো য়ুরোপীয়ের লেখা। এজন্য তারা আমাকে গ্রেপ্তার করলে···।'

বন্দী সাঁওতালদের স্বীকারোক্তি, সাক্ষ্য, এবং অন্যান্য নানা সূত্র থেকে পাওয়া প্রতিবেদন থেকে দুটি বিষয় পরিষ্কার বোঝা যায় : স্বল্প সময়ের মধ্যে সাঁওতালদের মানসিকতায় আমূল রূপান্তর ঘটে; এবং বিদ্রোহের প্রেরণা, মূল লক্ষ্য এবং কর্মসূচী সম্পর্কে সাঁওতালদের ধারণা মোটামুটি অভিন্ন ছিল।

৯.৭

কোন্ ঘটনা থেকে বিদ্রোহের শুরু, তা নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা নেই। মাতনৈক্য তার পটভূমিকা নিয়ে।

বিদ্রোহের শুরু দীঘা থানার দারোগা মহেশ দত্ত আর তার চার বরকন্দাজের খুন দিয়ে। দারোগাকে সিধুই খুন করে। গ্রেপ্তারের পর তাকে এ-বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে নির্দ্বিধায় তা স্বীকার করে: 'আমি নিজের হাতে তলোয়ার দিয়ে মহেশ দত্তকে খুন করি; স্বেচ্ছায় ভগবানের নির্দেশে আমি তা করেছি।'[১৪৭]

কিন্তু কেন এ খুন, এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা নানারকম। আমরা প্রধানত রাজপুরুষদের কাছে সিধুকানুর এবং কোনো-কোনো 'প্রত্যক্ষদর্শী'র সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করব। কী ঘটেছিল, সিধুকানুরই সবচাইতে ভালো জানার কথা।

এ ধরনের সাক্ষ্য থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায়, ব্রিটিশরাজের "ন্যায়পরায়ণতা" সম্পর্কে সাঁওতালদের আস্থা যখন প্রায় সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে, তখন স্থানীয় পুলিশ ও মহাজনের মধ্যে গূঢ় যোগ-সাজসের প্রমাণ আবার তারা নূতন করে পেল। থানা কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র মহাজনের মর্জিমতো সবকিছু করছিল —তা নয়। তাদের হাবে-ভাবে আচারে-আচরণে ছিল আগের মতো ক্ষমতার উগ্র আস্ফালন। থানার হুকুম না মানলে তার পরিণাম কত সাংঘাতিক হতে পারে —এ সম্পর্কে সাঁওতালদের শাসানি দেওয়া হল। আবার তারা বুঝল, থানার লোক তাদের কী তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে। এটাকে তারা শুধু মহাজন কেনারাম ভকত আর দারোগা মহেশ দত্তের মধ্যে গোপন ষড়যন্ত্রের বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখল না। অসহায় সাঁওতালদের রক্ষায় স্থানীয় প্রশাসনের ব্যর্থতা তাদের মানসিকতায় এক প্রতীকী রূপ পেল: তা হল গোটা ব্রিটিশরাজের ব্যর্থতা।

খুনের কারণ সম্পর্কে সিধু আর কানুর সাক্ষ্যে যথেষ্ট গরমিল, কিন্তু মিল আছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। তা হল, মহাজনদের কার্সকলাপ নিয়ে দারোগা আর তার বরকন্দাজদের সঙ্গে সিধুকানুদের প্রচণ্ড বচসা। তাদের বিরুদ্ধে সাঁওতালদের দীর্ঘদিনের নিরুদ্ধ অন্ধ আক্রোশ চকিত খুনের মধ্য দিয়েই মুক্তি পায়। এ খুনের পরিণাম নিয়ে সাঁওতালদের কোনো ভয় ছিল না। ছিল না বিন্দুমাত্র অনুশোচনা।

সিধুর সাক্ষ্যমতে[১৪৮] : পাঁচকোঠীবাগান নামক এক জায়গা থেকে ফেরার পথে মহেশ দত্তর সঙ্গে তার দেখা হয়। দারোগাকে সে সরাসরি জিগ্যেস করে—পাঁচ বছর ধরে সাঁওতালরা মহাজনদের বিরুদ্ধে

নালিশ করে আসছে; তার কাছেও আর্জি পেশ করা হয়েছে; অথচ কোনো তদন্ত তখনো পর্যন্ত হয় নি। দারোগাদের কাছে এর কৈফিয়ত দাবি করা হয়। দারোগা কোনো সদুত্তর তো দিলই না, বরং সিধুকে গালিগালাজ করে। এর ফলে উত্তেজনা। তার ফলে খুন।

কানুর ব্যাখ্যা[১৪৯] ভিন্ন : দেবতার আবির্ভাবের ঘটনার পর সিধু-কানু নানা জনের কাছে পরোয়ানা পাঠায়। জবাব দেওয়া দূরের কথা, কেউ প্রাপ্তি-স্বীকারও করে নি। এ অবস্থায় তাদের করণীয় সম্পর্কে সাঁওতালরা মাঝে-মাঝে একসঙ্গে মিলে আলাপ-আলোচনা করত। পুলিশ এসব জমায়েতের কথা জানতে পারে। থানার এক সেপাই একদিন এ-ধরনের এক জমায়েতে আসে, এবং উপস্থিত সব সাঁওতালদের গুনতে থাকে। তাকে বলা হল, সে যাতে দারোগার হাতে পরোয়ানাগুলো দেয়; আর যাতে দারোগা ঠিক ঠিক জায়গায় সেগুলো পাঠিয়ে দেয়। সে ভয়ানক রেগে যায়। যাবার আগে শাসিয়ে যায়, পরের দিন সে ফের আসবে, দারোগা আর একশ সেপাই নিয়ে। সত্যিই সে এল; সঙ্গে দু-গাড়ি ভরতি দড়ি। সেদিন সাঁওতালদের শিকারে যাবার কথা ছিল। দরকারি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা বেরিয়ে পড়েছিল। পথে পুলিশ-বাহিনীর সঙ্গে দেখা। দারোগা তাদের জিগ্যেস করে, কেন তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জড়ো হয়েছে। শিকারের কথা সে বিশ্বাস করে নি; বলল, তাদের আসল মতলব 'ডাকাতি'। সঙ্গে যে মহাজনরা এসেছিল, তারা এ নালিশই করল। এ অভিযোগে সাঁওতালরা তীব্র বিক্ষুব্ধ হয়। বলে, যদি মহাজনরা এর যথাযথ প্রমাণ না দিতে পারে, তাহলে মিথ্যা নালিশের জন্য প্রত্যেক মহাজনকে পাঁচটাকা জরিমানা দিতে হবে। দারোগা এ প্রস্তাব গ্রাহ্যই করল না। গাড়িভরতি দড়ি দেখে কানু দারোগাকে বলে, কী করবে সে আগে থেকেই ঠিক করে এসেছে; তাদের বাঁধার জন্যই এত দড়ি আনা হয়েছে। এর থেকেই কথা-কাটাকাটি। কানু খুন করল দারোগার সঙ্গে আসা মানিকচাঁদ মহাজনকে। আর সিধু, দারোগা এবং আরো তিন-জন মহাজনকে। বরকন্দাজদের কেউ-কেউ খুন হল।

সাঁওতালদের ঘন-ঘন জমায়েতের ব্যাপারটা যে মহাজনদের আতঙ্কিত করে তুলেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। বিশেষ করে দেবতার আবির্ভাবের ঘটনার পর সাঁওতালরা তাদের উদ্দেশ্যের কথা প্রকাশ্যেই বলেছে। বস্তুত, মহাজনদের কাছেও পরোয়ানা পাঠিয়েছে। সম্মিলিত প্রতিরোধের জন্য সাঁওতালদের প্রস্তুতির কথা তাদের অজানা থাকার কথা নয়। তাদের ভয় ছিল, গত বছরের মতো আবার তাদের উপর হামলা হবে। সম্ভবত তারাই তৎপর হয়ে সাঁওতালদের উপর নজর রাখার জন্য থানা-পুলিশকে বলে। দলবল নিয়ে দারোগা যখন সাঁওতালদের শাসাতে যায়, কয়েকজন মহাজন সঙ্গেই ছিল। দারোগার সঙ্গে সাঁওতালদের বচসার একটা প্রধান কারণ: মহাজনদের বিরুদ্ধে তাদের এতবার নালিশেও কাজ হয় নি; অথচ মহাজনদের নালিশে দারোগা গাড়িভরতি দড়ি নিয়ে তাদের হুমকি দিতে আসে।

বিদ্রোহ শুরু হবার সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে ভাগলপুরের কমিশনারও নানা সূত্র থেকে জানতে পারেন[১৫০], মহাজনদের প্রসঙ্গ নিয়েই দারোগার সঙ্গে সাঁওতালদের বাক-বিতণ্ডা শুরু। সাঁওতাল-জমায়েতের খবর পেয়ে দীঘার থানাদার সেখানে পৌঁছলে, সাঁওতালরা নাকি তাকে বলে, বাঙালি মহাজনরা তাদের উপর ভয়ঙ্কর জোরজুলুম চালাচ্ছে; তাই শাস্তিস্বরূপ মাথাপিছু পাঁচ টাকা করে জরিমানা ধার্য করা হোক; আর যারা-যারা এ জরিমানা দেবে না, তাদের ধরে এনে সাঁওতালদের হাতে তুলে দেওয়া হোক।

মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট প্রাথমিক তদন্তের ফলে জানতে পারেন[১৫১], দারোগার সঙ্গে দেখা হলে সিধু তাকে জিগ্যেস করে, সে তার পরোয়ানার জবাব দেয় নি কেন। দারোগা নাকি বলে, এর কারণ সে

থানায় ছিল না। এ নিয়েই বচসা।

দীঘা থানার এক বরকন্দাজ আর এক পেয়াদা ছিল প্রত্যক্ষদর্শী। তাদের সাক্ষ্যে[১৫২] তারা খোলাখুলি বলেছে, দলবল নিয়ে দারোগার সাঁওতাল-জমায়েতে যাবার কী অর্থ হতে পারে, সিধু-কানু তা ঠিকই বুঝতে পেরেছিল। তারা দারোগাকে সোজাসুজি বলে, তাদের বেঁধে নেবার জন্যই তার আসা। সিধু তাকে ব্যঙ্গের সুরে বলে, সে সৈন্যসামন্ত নিয়ে এলেই বরং ভালো করত। তর্কাতর্কির শুরু এখান থেকেই।

অন্য এক অসাঁওতাল প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মেলে। সাঁওতালরা দারোগাকে জিগ্যেস করে—মতু পরেশনাথ বলে তাদের একজনকে দারোগা গ্রেপ্তার করল কেন? দারোগা বলে, গত বছর কয়েকটা ডাকাতি হয়ে গেছে; এ বছরও সাঁওতালদের নানা বেআইনি জমায়েত হয়েছে; মতুকে আটকে রাখার এই কারণ। সিধু বলে, তার ঘরেই দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে; দারোগা তাকেই বাঁধলে পারে। এভাবেই বচসার শুরু।

৯.৮

আমরা দেখেছি ধর্মের প্রভাবে সাঁওতাল প্রতিরোধ-আন্দোলন কী ভাবে স্বল্প সময়ের মধ্যে রূপান্তরিত হয়ে গেল। এ বিষয়ে দুটো জিনিস লক্ষণীয়। যে ধর্মীয় ধারণার ফলে এ রূপান্তর ঘটল, তা অংশত মাত্র পুরনো। আর অখণ্ড সাঁওতাল উপজাতিসত্তা সম্পর্কে যে বোধ বিদ্রোহীদের অনুপ্রাণিত করেছিল তাও পুরনো বিশ্বাসমাত্র নয়। ধর্মবোধ আর উপজাতিসত্তাবোধে নূতন লক্ষণের উন্মেষ এবং বিকাশ লক্ষণীয়।

কোনো বিশেষ ব্যক্তির কাছে ভগবানের আবির্ভাবের ঘটনা প্রাচীন সাঁওতালি ধর্মচিন্তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সাঁওতাল ভগবান অদৃশ্য। এ অদৃশ্য শক্তির মূর্তরূপের কোনো উল্লেখ সাঁওতাল পুরাণে (মীথোলজিতে) নেই। শুধু তাই নয়, ঠাকুর যাঁর কাছে আবির্ভূত, সাঁওতালমানসে তিনিই রূপান্তরিত হয়ে গেলেন ঠাকুরে। সাঁওতাল ভগবানের কোন্-কোন্ বিভূতি তার উপর আরোপিত হয়েছিল, তা জানা যায় না। তবে সাঁওতাল সমাজে এ-বিশ্বাস ক্রমেই ব্যাপক হয়ে যায়, তিনি অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী। মূল ঘোষণায় সিধু-কানু শুধু বলেছিল, শত্রুর বিরুদ্ধে সাঁওতালদের বিদ্রোহে দিব্যশক্তি তাদের সপক্ষে হস্তক্ষেপ করবে। কিন্তু ক্রমেই এ অলৌকিক শক্তি নেতার উপর আরোপিত হয়। দিব্যশক্তির হস্তক্ষেপ যেভাবেই ঘটুক, সাঁওতাল ধর্মবোধের নূতন একটা লক্ষণ এই ছিল যে, এ হস্তক্ষেপ কোনো ব্যক্তি, কোনো বিশেষ সাঁওতাল গ্রাম বা গ্রামসমষ্টির কল্যাণের জন্য মাত্র নয়, বা আকস্মিক কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মহামারী থেকে পরিত্রাণের জন্য নয়; তা গোটা সাঁওতাল উপজাতির মুক্তির জন্য, এক আদর্শ সাঁওতাল সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য। নেতা কিন্তু তাঁর প্রচারে যে ভাষা, যে প্রতীক ব্যবহার করেছেন, তা একান্তভাবেই সাঁওতালপুরাণ, লোকগাথা ও সৃষ্টিতত্ত্বে ব্যবহৃত ভাষা আর প্রতীক। শত্রুদের সঙ্গে সাঁওতালদের সংঘর্ষ বিচ্ছিন্ন, আঞ্চলিক কোনো ঘটনা নয়; এটা যেন সারা বিশ্বব্যাপী আসন্ন প্রলয়ের আভাস; কারণ 'পৃথিবী' 'পাপে' ভরে গেছে; প্রলয় আনবে নূতন সৃষ্টির অঙ্কুর; আকাশ থেকে নিরবচ্ছিন্ন 'অগ্নিদৃষ্টি'তে সাঁওতালশত্রুকুলের বিনাশ ঘটবে; আর এ ঘোর দুর্যোগে সময় সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে যাবে; 'দুদিন দুরাত্রি একদিন একরাত্রি হবে।'

অখণ্ড সাঁওতাল উপজাতিসত্তা সম্পর্কে ধারণাতেও নূতন লক্ষণ সুস্পষ্ট। পুরাণ, লোকগাথা, সামাজিক ও ধর্মীয় নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাঁওতালরা গ্রাম বা 'ক্ল্যান'-এর থেকে বৃহত্তর কোনো সত্তার ধারণা করতে পারত। ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক থেকে তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট ধারণাও ছিল; কিন্তু সেটা যেন অবচেতন যৌথ স্মৃতি। এ স্মৃতিও নানাভাবে ঝাপসা হয়ে যেতে পারত। পাড়ায়-পাড়ায় রেষারেষি, সংঘর্ষ অবিরতই ঘটত। উল্লেখযোগ্য এই, আলাদা পাড়ার আলাদা প্রতীকচিহ্ন ছিল। দিখুদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান জটিলতার মধ্য দিয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সাঁওতালদের ধারণা প্রখর হতে থাকে। কিন্তু বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এক অভিন্ন সাঁওতালি অস্তিত্ব সম্পর্কে বোধ শুধু এভাবে বিকশিত হয় নি।

এ বোধের বিকাশে সাঁওতাল ধর্মগুরুর সচেতন প্রয়াসের গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। যতদূর জানা যায় এ চেষ্টার শুরু বিদ্রোহের প্রায় বারো বছর আগে। এ সম্পর্কে যৎসামান্য যা আমরা জানতে পেরেছি, তা এক খ্রীষ্টান মিশনারির প্রতিবেদন[১৫৩] থেকে: এ চেষ্টা এক 'মাঝি' বা 'পরগনাইত' মোগো রাজার। তার বাস ছিল দামোদরের পাশে। বারো বছরের চেষ্টায় তার শিষ্যের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল তিনশোয়। সংখ্যাটা নগণ্য বটে; কিন্তু তারা এক বিশেষ আদর্শে অনুপ্রাণিত। নানা অঞ্চলের সাঁওতালদের ঐক্যবোধে উদ্‌বুদ্ধ করাই ছিল প্রধান আদর্শ। নানা ধরনের জাদুবিদ্যা, তুকতাকে তারা ছিল কুশলী। সংগঠন ছিল গুপ্ত; এর শক্তির একটা প্রধান উৎস নেতার প্রতি অবিচল আনুগত্য।

বিদ্রোহ পর্যন্ত এ সংগঠনের প্রভাব স্থায়ী হয়েছিল কিনা বলা শক্ত। সম্ভবত বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। এ ধরনের চেষ্টা নূতন করে শুরু হয় ১৮৫৪ সালের মে-জুনের কাছাকাছি কোনো সময়। 'ডাকাতি'র অভিযোগে কঠোর দণ্ডবিধানের পর বহু গ্রামের মর্মাহত, বিক্ষুব্ধ মাঝিরা মিলে প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে পরামর্শ করতে থাকে। কিন্তু বিশাল সাঁওতাল-অঞ্চলের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় বিদ্রোহের কয়েক মাস মাত্র আগে। তাও সম্ভব হয় সাঁওতালরাজ সৃষ্টির প্রেরণায়, এবং নূতন এক নৈতিক এবং ধর্মীয় চেতনার প্রভাবে। ধর্মগুরুরা কীভাবে এ চেতনা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, তা আগেই উল্লেখ করেছি।

৯.৯

দিব্যশক্তির হস্তক্ষেপ সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস বিদ্রোহের সিদ্ধান্তকে গভীরভাবে প্রভাবিত করলেও সাঁওতালরা কিন্তু সম্পূর্ণ দৈবনির্ভর ছিল না। সামরিক প্রস্তুতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা তারা করেছে।

সংগঠনের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য দিক—বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়ানো সাঁওতালদের বিদ্রোহে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা। সম্ভবত, প্রথম যোগাযোগ হয়েছিল সিংভূমের সাঁওতালদের সঙ্গে। সরকারি মহল প্রথম থেকেই সতর্ক ছিল, সিংভূম থেকে সাঁওতালরা যাতে না আসতে পারে। কিন্তু দামিন এলাকার সাঁওতাল এবং সিংভূমের সাঁওতালদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্কের জন্য সরকারের এ চেষ্টা বিশেষ সফল হয় নি। শেরউইলের বিবরণ থেকে জানতে পারি, দামিন অঞ্চলে যেসব সাঁওতাল সাম্প্রতিক কালে বসতি স্থাপনের জন্য এসেছে, তাদের একটা বড়ো অংশ এসেছে সিংভূম থেকে।[১৫৪]

অল্প সময়ের মধ্যে অন্যান্য সাঁওতাল অঞ্চলেও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহের এ আকস্মিকতা এবং বিপুল প্রসারে শাসককুল আতঙ্কিত এবং বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। হতবুদ্ধি ভাগলপুর ম্যাজিসট্রেট বিদ্রোহ দমনের এক উপায় বাতলাল। তার মতে, দামিন থেকে সব সাঁওতালদের 'উন্‌মূলন' ছাড়া শান্তি আসবে না। 'তারা একজোট হয়ে বিদ্রোহ করেছে।[১৫৫]

অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যেও বিদ্রোহের সপক্ষে প্রচার চালানো হয়েছিল। বিদ্রোহে তাদের ভূমিকা ঠিক কী ছিল, তা বলা শক্ত। তবে পাহাড়িয়ারা ছাড়া কেউ সাঁওতালদের প্রকাশ্য বিরোধিতা করে নি।

বিদ্রোহ অতিদ্রুত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, এ কথার উল্লেখের পর বর্ধমান বিভাগের কমিশনার বলেন: 'আরো উদ্বেগের কারণ, পাশাপাশি সব জেলাতেই এটা ছড়িয়ে পড়ছে। সাঁওতাল, ধাঙড়,

ধানুকদের বড়ো-বড়ো দল নলহাটি থেকে নানুগুলিয়া পর্যন্ত পাহাড়ের পাদদেশে জমা হয়েছে।'[১৫৬]

আগেই বলেছি, প্রধান ব্যতিক্রম পাহাড়িয়া উপজাতি। বিদ্রোহীদের প্রতি কোনো সহানুভূতি তারা তো দেখায়-ই নি, সবরকমে তাদের প্রতিকূলতা করেছে। বিদ্রোহের শুরুতেই ঔরঙ্গাবাদের সাব-ডিভিশন্যাল অফিসার উল্লসিত হয়ে জানায়: 'একমাত্র ভালো খবর, পাহাড়িয়ারা বিদ্রোহে যোগ দেয় নি।'[১৫৭] রাজমহল ও ভাগলপুরের উত্তরাংশে সাঁওতাল-বিরোধী অভিযানে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী পাহাড়িয়াদের থেকে বিশেষ সাহায্য পায়। সাঁওতালদের গোপন আস্তানার খবর তারাই সৈন্যদের দিয়েছিল।[১৫৮]

এটার ব্যাখ্যা সহজ। পাহাড়িয়াদের আস্তে-আস্তে উচ্ছেদ করেই সাঁওতালরা নিজেদের চাষাবাদ বাড়ায়। পাহাড়িয়ারা তাই ক্রমেই পিছু হটতে থাকে; সাঁওতালদের সঙ্গে না পেরে উঠে দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে চলে যায়। সাঁওতালরা তাই তাদের জাতশত্রু।

উপজাতিরা ছাড়া সাঁওতাল সমাজ ও অর্থনীতির সঙ্গে দীর্ঘকাল গভীরভাবে সম্পৃক্ত নানা সম্প্রদায়ও বিদ্রোহীদের বিশেষ সাহায্য করেছিল। এক য়ুরোপীয় নীলকরের প্রতিবেদন-মতে, পাঁচটা জাতের লোকদের বিদ্রোহীরা বিন্দুমাত্র ক্ষতি করে নি—কামার, ছুতোর, কুমোর, তেলী আর গোয়ালা।[১৫৯] বিশেষ করে, কামার এবং গোয়ালা বহু জায়গায় সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছে। অস্ত্রশস্ত্র তৈরি এবং মেরামতিতে কামারের সাহায্য ছিল অপরিহার্য। গ্রাম "লুঠ" করার সময় ছুটো জিনিসের উপর সাঁওতালদের বিশেষ নজর ছিল—খাদ্যশস্য আর লোহা। লুঠের লোহা তারা সঙ্গে-সঙ্গে কামারকে দিয়ে দিত। অস্ত্রশস্ত্রের অব্যাহত যোগান এতেই সম্ভব হয়েছিল। গোয়ালারা পাহাড়ি পথঘাটের অন্ধিসন্ধি জানত—সম্ভবত গোরুর পাল নিয়ে তাদের হামেশা ঘুরতে হত বলেই এটা সম্ভব হত। সৈন্যদলের আসার খবর তারা সঙ্গে-সঙ্গে সাঁওতালদের জানিয়ে দিত।

সরকারি মহলে তাই এসব সম্প্রদায়ের উপর তীব্র আক্রোশ ছিল। ভাগলপুর বিভাগের কমিশনার জানান: 'সব পাওয়া খবর থেকে মনে হচ্ছে, গোয়ালা, তেলী এবং অন্যান্য জাতের লোকেরাই সাঁওতালদের হিংসার কাজে প্ররোচিত করেছে, তারা সংবাদ যোগায়; সাঁওতালদের মাদল বাজায়; অন্য সব কাজে তাদের নির্দেশ দেয়; তাদের হয়ে গোয়েন্দাগিরি করে ···লোহারেরা তাদের তীর আর কুড়োল বানিয়ে দেয়।'[১৬০]

এ বিষয়ে শেরউইল তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন[১৬১]: 'গতকাল আমি নিজে দেখেছি, গোয়ালারা খবর পাচার করছে; আর সাঁওতালদের কাছে দই আর দুধ নিয়ে যাচ্ছে; আমাদের সৈন্যদলের আসার খবর তারাই মাদল বাজিয়ে সাঁওতালদের জানিয়ে দেয়···এ গোয়ালারাই সাঁওতালদের লুঠের জন্য নিয়ে যায়; আর দেখিয়ে দেয় কোথায় লুঠের জন্য সেরা মাল জুটবে।' অন্য এক সরকারি প্রতিবেদন-মতে, গণপৎ গোয়ালা ছিল 'প্রধান গোয়েন্দা ও পথ-প্রদর্শক।'[১৬২] পরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ভাগলপুরের শরিয়াহাট গ্রামের বেচু রাউত গোয়ালাকে বিদ্রোহে বিশিষ্ট ভূমিকা নেওয়ার জন্য ফাঁসি দেওয়া হয়।[১৬৩] তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, কানু সাঁওতাল তাকে 'সুবা' বলে মনোনীত করে; পদমর্যাদার প্রতীক হিসেবে কানু নিজেই তার মাথায় পাগড়ি পরিয়ে দেয়। যেদিন (১৭ নভেম্বর) তাকে ধরা হয়, সেদিন এক সাঁওতাল-জমায়েতে সে সভাপতি হিসেবে কাজ করছিল।

জামতারার এক গ্রামে হানা দিয়ে সৈন্যরা যে ষাট জন বিদ্রোহীকে গ্রেপ্তার করে, তার মধ্যে চল্লিশ জন অসাঁওতাল। জাতিতে তারা তেলী, কুমোর, কুলওয়ার। 'সর্বপ্রকারে তারা বিদ্রোহীদের তাদের তৈরি জিনিস দিয়ে সাহায্য করেছে। সবাই জানে, এদের সাহায্য ছাড়া সাঁওতালরা কিছুই করতে পারত না।'[১৬৪]

সাঁওতালরা জানত, শুধুমাত্র নিজেদের শক্তি, অন্যান্য উপজাতি বা সম্প্রদায়ের সাময়িক সহযোগিতার উপর নির্ভর করে প্রবলপ্রতাপশালী শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব নয়। প্রথম থেকেই তাদের চেষ্টা ছিল কোনো-কোনো স্থানীয় জমিদার বা বাইরের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির সমর্থন আর সাহায্য যেন তারা পায়। জমিদার সম্পর্কে তারা জানত; কিন্তু সাঁওতাল-অঞ্চলের বাইরের কোনো-কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির কথা তারা শুনেছিল মাত্র; তাদের সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। উল্লেখযোগ্য এই, তবুও নানা ক্ষীণ যোগসূত্র ধরে সাঁওতালরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে। সামরিক প্রস্তুতির জন্য চেষ্টার কোনো কসুর তারা করে নি।[১৬৫]

অন্যদিকে নেতারা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে, যাতে বিদ্রোহীদের নিজেদের মধ্যে যোগসূত্র অব্যাহত থাকে, এবং সাংগঠনিক শৃঙ্খলা আর সংহতি অটুট থাকে। সব নির্দেশ আসত সিধু-কানুর থেকে। বিভিন্ন অঞ্চলের সামগ্রিক দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল তাদের মনোনীত প্রতিনিধির উপর। মৌখিক এবং লিখিত নির্দেশ পাঠানো হত দূতমারফত। লুঠের মাল সম্পর্কে কঠোর নির্দেশ ছিল, সবকিছু যেন নেতা বা তাদের মনোনীত প্রতিনিধির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। খাদ্যশস্য সম্ভবত এ-নির্দেশের আওতায় ছিল না। স্থানীয় বিদ্রোহীদের প্রয়োজনেই তা ব্যবহার করা হত। নেতারা বিশেষ সতর্ক ছিল, যাতে লুঠের মালের বখরা নিয়ে কোন্দল আন্দোলনের সংহতি নষ্ট না করে। পরিষ্কার বোঝা যায়, পরে-পরে এ নির্দেশ সবক্ষেত্রে মানা হয় নি।

বিদ্রোহীদের সংগঠন যতই মজবুত হোক না কেন, ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে পেরে ওঠা তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। একেবারে গোড়ার দিকে কোনো-কোনো সাফল্যে তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে। তারা ভাবল, অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রভাবে ব্রিটিশ বাহিনীর পরাক্রম নিষ্ফল হয়ে যাবে, সিধু-কানুর এ ভবিষ্যদ্বাণী যথার্থ হতে চলেছে। কিন্তু অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ব্রিটিশ সৈন্যের হাতে সাঁওতালদের অপরিসীম ক্ষয়ক্ষতির কথা কোথাও অজানা থাকল না। নেতাদের মন্ত্রপুত শরীর ব্রিটিশদের গোলাগুলিতে অক্ষত থাকবে, এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভেঙে গেল। এসব ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর সাঁওতালদের সংগঠনও ক্রমেই দুর্বল হয়ে যায়। খুদে ব্যবসায়ীরা সিধু-কানুর কাছে নালিশ জানাল, সাঁওতালরা যথেচ্ছ লুঠতরাজ করছে। নেতাদের থেকে আবার কড়া নির্দেশ এল, এসব যাতে আর না ঘটে। কিন্তু লুঠতরাজ সম্পর্কে বিদ্রোহীদের মনোভাবও তখন পালটে গেছে। তা আর সংগঠনের শক্তিবৃদ্ধির উপায় বলে গণ্য হল না। ব্যক্তিগত স্বার্থ সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠল।[১৬৬]

কানু সাঁওতাল কিন্তু দৈববাণীর অমোঘতায় বিশ্বাস হারায় নি। তার ধারণা, তার ভবিষ্যদ্বাণীর নিষ্ফলতার আসল কারণ, তার অনুগামীদের চারিত্রিক অশুদ্ধি। নির্দিষ্ট দিনে দেবতার পুনরাবির্ভাব না ঘটার কারণ হিসেবে কানু বলেছিল, দেবতার পুজার উপচার হিসেবে সাঁওতালদের আনা দুধ বিশুদ্ধ নয়। রাজপুরুষদের কাছে বন্দী কানু বলে: 'অনেক গোলা পড়তে থাকে; সিধু এবং আমি দুজনেই জখম হই। ঠাকুর বলেছিলেন, (ব্রিটিশের) বন্দুক থেকে জল বেরুবে; কিন্তু আমার সৈন্যরা অপরাধ কিছু করেছে। তাই ঠাকুরের কথা ফলল না।'[১৬৭]

বন্দী সব সাঁওতালরা কিন্তু একই ধরনের সাক্ষ্য দেয়: এ নিষ্ফলতা থেকে আসে চরম মোহভঙ্গ, আর তীব্র এক হতাশাবোধ। 'এসব ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হল। কত সাঁওতাল হতাহত হল; বাকিরা ধরে নিয়েছে, সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া নিরর্থক।'[১৬৮] নদীয়া বিভাগের কমিশনারকে কয়েক-জন ধৃত সাঁওতালের স্বীকারোক্তির কথা জানানো হয়: 'তারা অবশ্যই জানত, তাদের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনী পাঠানো হবে; কিন্তু সিধু-কানু তাদের বলেছে, গাদা-বন্দুক থেকে শুধুমাত্র জল বেরুবে। এটা যে কী মারাত্মক

ভুল, মহেশপুরে তা তারা বুঝল। একটা গোলা সিধুর বাহুতে এসে পড়ে, এবং তার বুকের মধ্যে ঢুকে যায়; কানুও বুকের পাশে আঘাত পায়।[১৬৯]

এ পরাজয়ের মুহূর্তে বিদ্রোহীদের নৈতিক বল সম্পূর্ণ ভেঙে গেল। সিধু-কানুকে অ্যাদ্দিন তারা 'ঠাকুর' বলে মেনেছে; অথচ তাদের নির্দেশ তারা এখন হেলায় উপেক্ষা করল। তাদের স্বার্থপ্রণোদিত আচরণে সংগঠনের সংহতি প্রায় লোপ পেল। নেতাদের কঠোর শাসানিও বিভ্রান্ত অনুগামীদের মধ্যে শৃঙ্খলা আনতে পারল না। যে প্রেরণা এতদিন সব সাঁওতাল-কর্মপ্রয়াসকে উদ্দীপিত করেছে, তার উৎস ক্রমেই শুকিয়ে এল।

৯.১০

১৮৭৪ সাল পর্যন্ত কোনো-কোনো অঞ্চলে বিক্ষুব্ধ সাঁওতালরা আবার মাঝে-মাঝে সংগঠিত হয়েছে। কিন্তু ১৮৫৫-র 'হুলে'র মতো ব্যাপক বিদ্রোহ ঘটে নি।

এর কারণ সাঁওতালরা নিজেরাই অংশত ব্যাখ্যা করেছে। তাদের অনেকেই বলেছে, 'হুলে'র নিষ্ফলতাই নূতন আন্দোলন সম্পর্কে তাদের দ্বিধার প্রধান কারণ। এ ব্যর্থতাবোধের সঙ্গে জড়িত ছিল এক পরম নিশ্চিত প্রত্যয়ের বিলোপ। তাদের গভীর বিশ্বাস ছিল, লড়াইয়ে তারা অপরাজেয়, অপ্রতিরোধ্য। এ বিশ্বাস ভেঙে গেল। চোখের সামনে তারা দেখল, কতশত সাঁওতাল লড়াইয়ে অসহায়ভাবে প্রাণ দিয়েছে; কত গ্রাম পুড়ে ধ্বংস হয়েছে; কী বিপুলপরিমাণ শস্য সৈন্যরা নির্বিচারে জ্বালিয়ে দিয়েছে। সাঁওতালরা পরে বলত: দিখু-দুশমনদের হাত থেকে নিস্তার পাবে বলে তারা হুলে নেমেছিল; পরিণামে তাদের ভাগ্যে জুটেছে সীমাহীন দুর্দশা; শক্ত হয়েছে দিখুদের হাত; পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি থেকে কত সাঁওতাল এখন উন্মূল; দিখুদের 'গোলামি' করে কোনোরকমে তারা দিন গুজরান করছে।[১৭০]

তা ছাড়া, ব্রিটিশ সৈন্যের দুর্ধর্ষ শক্তি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সাঁওতালদের মনের উপর এক স্থায়ী প্রভাব হয়ে রইল। তারা খোলাখুলি বলত, ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে লড়াই মূঢ়তা বই কিছু নয়। ১৮৭৪ সালের বিদ্রোহের নেতা ভগীরথ মাঝি বলেছিল: 'নির্বোধ আমি মোটেই নই; আমি দুটি মাত্র আঙুল যদি তুলি, তারা (ব্রিটিশেরা) পাঠাবে পুরো এক পলটন।'[১৭১] ভগীরথ-অনুগামীদের বানানো নূতন মন্দির যখন সৈন্যরা এসে ভেঙে দেয়, মন্দিরের সাঁওতাল পাণ্ডা খুবই 'বিষণ্ণ' হয়; 'অবাক' আর 'বিরক্ত' হল গ্রামের মাঝি; কিন্তু সবাই বলল, 'আচ্ছা, সরকার কা হুকুম।'[১৭২] সাঁওতাল পরগনার কমিশনারের কাছে সাঁওতালরা নাকি শপথ করে বলেছে, বিদ্রোহ করার কোনো ইচ্ছেই তাদের নেই। 'আমার প্রশ্নের উত্তরে সব জায়গা থেকে মোটামুটি এক ধরনের জবাব পেয়েছি—'গতবারের বিদ্রোহ, এবং তার ফলস্বরূপ আমাদের দুঃখ-দুর্দশা ভুলে যাবার মতো বোকা আমরা নই।'[১৭৩]

শুধু পরাজয়ের গ্লানি, আর মোহভঙ্গজনিত হতাশাই নূতন বিদ্রোহ সম্পর্কে তাদের দ্বিধা আর সতর্কতার কারণ নয়। বিদ্রোহের উপযুক্ত সংগঠন গড়ে তোলার মতো শক্তিও তাদের ছিল না। এর প্রধান কারণ, 'হুলে'র সময় এবং পরে তাদের যৌথ গ্রামীণ সংগঠন প্রায় ভেঙে যায়। অনেক গ্রামপ্রধান (মাঝি) প্রাণ হারিয়েছে; অনেকে শাস্তির ভয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। যারা গ্রামে থেকে গেল তাদের অনেকেই পুরনো মর্যাদা এবং অধিকার বজায় রাখতে পারে নি। প্রধানত এটা জমিদারি এলাকায় ঘটেছে। বিদ্রোহের পরে-পরেই জমিদারি পরিচালনার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে প্রথমে য়ুরোপীয়-পরিচালিত জমিদারিতে, পরে অন্য জমিদারিতেও। বিদ্রোহে যেসব মাঝির সক্রিয় ভূমিকা ছিল, জমিদার স্বভাবতই গ্রামের উপর তাদের পুরনো কর্তৃত্ব খর্ব করতে চায়। তা ছাড়া, তারা ভাবল, পুরনো মাঝিদের বদলে

বাইরের কাউকে এনে বসালে খাজনা বাড়ানোর কাজটা অনেকটা সহজ হয়। তারা এক নূতন ফন্দি আঁটল। তারা বলতে শুরু করল, ক্ষমতার দিক থেকে মাঝিরা অন্যান্য অঞ্চলের অস্থায়ী ইজারাদারদের মতোই; তাদের একটিমাত্র দায়িত্ব, কৃষকদের থেকে খাজনা আদায় করে জমিদারের হাতে তুলে দেওয়া। গ্রামের নানা পালে-পার্বণে, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য তাদের যে বিশিষ্ট সামাজিক মর্যাদা ছিল, জমিদার তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করল। জমিদার চাইল, তার মর্জিমতো মাঝিরা নূতন হারে খাজনা আদায় করুক; যদি তারা গররাজি হয়, তাহলে তাদের সরিয়ে দিয়ে বাইরের লোককে এ দায়িত্ব দেওয়া হবে। মাঝিরা এ নূতন বিধান মানে নি; তাদের সব স্বাতন্ত্র্য এবং মর্যাদা হারিয়ে তারা শুধুমাত্র জমিদারের হুকুমবরদার হতে চায় নি। আদালত কিন্তু তাদের যুক্তি মানল না; রায় দিল, গ্রামে মাঝিদের স্থায়ী কোনো অধিকার নেই। ফলে, পুরনো মাঝিরা টিকে থাকুক বা না থাকুক, সাঁওতালদের গ্রামীণ সংগঠনের সঙ্গে তাদের যোগ ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে এল।[১৭৪]

[ক্রমশ

সূত্র-নির্দেশ ও টীকা

১২৯. Bengal Judicial Proceedings ; 14 Feb. 1856. No. 166. বীডওয়েলের কাছে W. C. Taylor (East India Railway)-এর চিঠির তারিখ ২ অকটোবর, ১৮৫৫

১৩০. আগেকার আবেদন এবং আর্জির সঙ্গে এসব পরোয়ানার পার্থক্য মৌলিক। এখানে বিশেষ কোনো সাঁওতাল অঞ্চলের অভিযোগ নেই। অভিযোগ আসছে নূতন সাঁওতাল ধর্মগুরু সিধু-কানুর থেকে; অভিযোগ স্থানীয় আদালত বা থানার কাছে নয়; সাঁওতালদের সব শত্রু-গোষ্ঠীর কাছে, সরাসরি। সবথেকে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য—এ পরোয়ানা আসলে এক সতর্কবাণী: সাঁওতালদের সম্পর্কে দিখুরা তাদের অভ্যস্ত হালচাল পালটে ফেলুক; পরোয়ানা সম্পর্কে তাদের প্রতিক্রিয়া একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জানাতে হবে।

১৩১ A. C. Bidwell-কে 'Special Commissioner for the Suppression of the Sonthal Insurrection' নিযুক্ত করা হয়। বিদ্রোহের কারণ, প্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে প্রতিবেদন লেখেন তিনি।

১৩২. Bengal Judicial Proceedings ; 23 Aug. 1855, No. 221। এ পরোয়ানার নকল ভাগলপুর ম্যাজিস্ট্রেটের চিঠির (২৪ জুলাই ১৮৫৫) সঙ্গে পাঠানো হয়েছিল।

১৩৩. Bengal Judicial Proceedings ; 4 Oct. 1855 , No. 20.

১৩৪. Bengal Judicial Proceedings ; 23 Aug. 1855, No. 219.

১৩৫. এ চিঠির সূত্রের জন্য পাদটীকা নং ১২৯ দ্রষ্টব্য

১৩৬. Bengal Judicial Proceedings ; 19 July, 1855, No. 17. 'ত্রিকুট' থেকে টেলরের লেখা চিঠির তারিখ 7 July 1855.

১৩৭. Bengal Judicial Proceedings ; 19 July, 1855, No. 2. A. Eden এর চিঠির তারিখ ৯ জুলাই ১৮৫৫।

১৩৮. Bengal Judicial Proceedings ; 19 July, 1855, No. 3.

১৩৯. Bengal Judicial Proceedings ; 30 Aug. 1855, No. 129. নদীয়া বিভাগের কমিশনারের কাছে এ বিবৃতিসহ লেখা চিঠির তারিখ ২১ জুলাই, ১৮৫৫।

১৪০. Bengal Judicial Proceedings ; 6 Sept. 1855, No. 118 ; বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের চিঠির তারিখ ৯ অগস্ট ১৮৫৫। Para 5.

১৪১. Bengal Judicial Proceedings ; 23 Aug, 1855, No. 116. বীরভূম ম্যাজিস্ট্রেটের চিঠির তারিখ ১৯ জুলাই, '৫৫।

১৪২ Bengal Judicial Proceedings ; 23 Aug. 1855, No. 57.

১৪৩. Bengal Judicial Proceedings; 19 July, 1855, No. 46.

১৪৪. Bengal Judicial Proceedings ; 30 Aug. 1855, No. 30.

১৪৫. Bengal Judicial Proceedings ; 4 Oct.

1855, No. 60. ২২শে সেপটেম্বর ১৮৫৫-এ লেখা বীরভূম কালেক্টরের ডায়েরি।

১৪৬. Bengal Judicial Proceedings ; 19 July, 1855, No. 21. "The Deposition of Sheikh Summoo taken on oath on 9 July 1855 before the Assistant Magistrate of Aurangabad.

১৪৭. Bengal Judicial Proceepings ; 8 Nov. 1855, No. 26. 'Examination of Sedoo Sonthal, late Thacoor'.

১৪৮. একই

১৪৯. Bengal Judicial Proceedings ; 20 Dec. 1855, No. 83. 'Statement of Kanoo Manjhee of Bagnodee, Tacoor Sobah, aged 34...'

১৫০. Bengal Judicial Proceedings ; 23 Aug. 1855, No. 205. ভাগলপুর কমিশনারের চিঠির তারিখ ২১ জুলাই, '৫৫।

১৫১. Bengal Judicial Proceedings ; 23 Aug. 1855, No. 306.

১৫২. একই ; 19 July, 1855 ; No. 45. ভাগলপুর ডিভিশনের কমিশনারের কাছে তারা সাক্ষ্য দেয়। কমিশনারের চিঠির তারিখ, ১০ জুলাই, ১৮৫৫।

১৫২. একই ; 14 Feb. 1856 ; No. 161. Droese, Church Mission Society to Bidwell, 8 Oct. 1855. 'মোর্গো রাজা'কে Droese বলেছেন : 'a Sonthal Chief, a Chief of Chiefs'.

১৫৪. একই ; 14 Feb. 1856, No. 159. W. S. Sherwill to Bhagalpur Commissioner, 24 July, 1855, Para 4.

১৫৫. একই ; 23 Aug, 1855 ; No. 47. ভাগলপুর ম্যাজিসট্রেট লেখেন (16 July 1855) : '...the entire extirpation of the Sontal tribe will be the only way to ensure peace' ; Para 2

১৫৬. Bengal Judicial Proceedings ; 23 Aug. 1855, No. 63. কমিশনারের চিঠির তারিখ ১৮ জুলাই, ১৮৫৫।

১৫৭. Bengal Judicial Proceedings ; 19 July 1855, No. 2.

১৫৮. Bengal Judicial Proceedings ; 6 Sept. 1855, No. 76. Officiating Secretary to the Government of India, Military Department-এর চিঠিতে (20 Aug. 1855) পাহাড়িয়াদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : 'the hillmen who are the deadly enemies of the Sonthal tribes, and are now aiding us in hunting them out of their jungles"

১৫৯. Bengal Judicial Proceedings ; 14 Feb. 1856, No. 160. J. H. Barnes to Bidwell, 15 Oct. 1855.

১৬০. Bengal Judicial Proceedings ; 23 Aug. 1855 ; No. 301. কমিশনারের চিঠির তারিখ 28 July 1855। কমিশনারের মতে, এদের এবং বিদ্রোহে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত সাঁওতালদের একই ধরনের শাস্তি হওয়া উচিত। Para 7

১৬১. Bengal Judicial Proceedings ; 23 Aug. 1855, No. 303. শেরউইলের চিঠির তারিখ ২৮ জুলাই, ১৮৫৫।

১৬২. Bengal Judicial Proceedings ; 30 Aug. 1855, No. 140. ভাগলপুর কমিশনারের চিঠিতে (3 Aug. 1855), গণপতকে বলা হয়েছে : 'the head spy and guide'. Para I.

১৬৩. Bengal Judicial Proceedings ; 6 Dec. 1855, No. 170. বেচুর এ কাজকে বলা হয়েছে : 'an overt act of rebellion'.

১৬৪. Bengal Judicial Proceedings ; 22 Nov. 1855, No. 60. H. L. Pester নামক এক সৈন্যাধ্যক্ষের চিঠি (3 Nov. 1855)।

১৬৫. হাজারিবাগে "মীর সাহেব" বলে পরিচিত একজনের সঙ্গে সাঁওতালরা যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে। সরকার পক্ষের অনুমান, মীর সাহেব আসলে সিন্ধুপ্রদেশের প্রাক্তন এক আমীর আব্বাস আলি। সাঁওতালরা তাকে 'সুবা' বলে জানত ; বলত, সে কোনো রাজার ছেলে। মহেশ দত্তের খুন হবার (৬ জুলাই '৫৫) চারদিন আগে সিধু মাঝি ধানু মাঝির হাত দিয়ে তার কাছে চিঠি পাঠায়। নিঃসন্দেহে উদ্দেশ্য ছিল, আসন্ন বিদ্রোহে তার সহযোগিতা চাওয়া। 'মীর সাহেবের' সঙ্গে সাঁওতালদের আগের পরিচয় ছিল খুবই সামান্য। ভাগলপুর বিভাগের কমিশনার খোঁজ নিয়ে জানেন, মীর সাহেবের শিকারে যাওয়ার সময় সাঁওতালদের কেউ-কেউ শিকার ধরার কাজে সাহায্য করার জন্য যেত ('jungle-beaters')। মীর সাহেবের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত কিন্তু যোগাযোগ হয়নি। সে সময় সাহেব নাকি হাজারিবাগে ছিল না। চিঠি পড়ে তার এক 'ভৃত্য' নাকি বলে, সাঁওতালদের উচিত সরকারের সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে ফেলা। এ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত সরকারি দলিল দ্রষ্টব্য : (ক) Bengal Judicial Proceedings ; 30 Aug. 1855, No. 146. ভাগলপুর কমিশনারের সহকারীর লেখা চিঠি (২৫ জুলাই '৫৫) ; (খ) Bengal Judicial Proceedings ; 6 Sept. 1855, No. 107. ভাগলপুর কমিশনারের লেখা চিঠি (২০ অগস্ট, ১৮৫৫). (গ) Bengal Judicial Proceedings ; 6 Dec. 1855, No. 52. "Statement of Ranjeet Manjee". (রণজিৎ এক সৈন্যাধ্যক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে)।

১৬৬. Bengal Judicial Proceedings ; 30 Aug. 1855, No. 130. সিধু-কানুর কাছে লেখা কিছু চিঠি এবং তাদের কোনো-কোনো উত্তর এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর হাতে এ গোপনীয় চিঠিগুলি পড়ে। তাদের একটা মূল কথা হল : ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ক্রমেই বিদ্রোহীদের ঘিরে ফেলছে ; ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে পেরে ওঠা খুবই শক্ত হয়ে উঠছে ; তাই সিধু কানু যাতে যত সত্বর সম্ভব, আরো সামরিক সাহায্য পাঠান। 'Paper No. 6' বলে উল্লেখিত চিঠিতে জানতে চাওয়া হয়েছে, সাঁওতালরা যে নির্বিচারে গ্রাম 'লুঠ' করছে, তার জন্য সিধু-কানুর সম্মতি আছে কিনা। 'সব শ্রেণীর ব্যবসাদারেরা' সিধু-কানুকে লিখছে, তারা যেন সেখানে এসে সব খোঁজ নেয়। এসব ব্যবসাদারের ধারণা, এ লুঠে সিধু-কানুর কোনো সম্মতি নেই ; সাঁওতালরা তাদের নির্দেশ সরাসরি 'অমান্য' করছে।

১৬৭. Bengal Judicial Proceedings ; 20 Dec. 1855, No. 132. 'Examination of Kanoo Sonthal'.

১৬৮. Bengal Judicial Proceeding ; 6 Sept. 1855, No 118. পাঁচজন সাঁওতাল মাঝি বর্ধমান বিভাগের কমিশনারকে এসব কথা বলে। তাদের নাকি বলা হয়েছিল : 'they were assured that no one could stand before them, that none of their people should be killed, that [if killed] they would be restored to life...that a small knife should have a miraculous power to sweep away a mass of opponents...' Para 5. কমিশনারের চিঠির তারিখ ৯ অগস্ট, ১৮৫৫।

১৬৯. Bengal Judicial Proceedings, 30 Aug. 1855, No. 129 ; কমিশনারের কাছে লেখা চিঠির (২১ জুলাই) Para 11.

১৭০. *Man in India* : Rebellion Number, Dec. 1945 ; W. J. Culshaw & W. G. Archer, "The Santal Rebellion" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। Chotrac Desmanshi-র মন্তব্যের অনুবাদ : '...We Santals came in sorrow and misfortune through the rebellion...instead of blessing a great curse fell upon us...after the rebellion we Santals began to scatter because of our hunger. For hunger, we Santals who set out to rule ourselves attached ourselves by hundreds to Deko for our living. Many returned to Sikar as day labourers, and for the most part people went to Bengal to work for Dekos as day labourers...'. P. 222.

১৭১. Bengal Judicial Proceedings ; Nov. 1874, Nos. 1-3 ; Boxwell, Offg. Deputy Commissioner, Sonthal Parganas to the Commissioner, Sonthal Parganas, 1 Oct. 1874, Para 46.

১৭২. একই ; Para 52.

১৭৩. Bengal Judicial Proceedings ; June 1861, No. 371, Offg. Commissioner of the Sonthal Parganas to the Govt. of Bengal, 24 May 1861 ; Para 25.

১৭৪. Bengal Judicial Proceedings ; July 1871 ; No. 156 ; Demi-official from A. Money Commissioner, Sonthal Parganas, 21 June, 1871. কমিশনারের মতে : 'Since 1859 it [Rent Act X] has been the guide in all rent disputes...The Zamindars and the law recognise the manjee in his capacity of settlement holder, merely

as a farmer.' ইজারাদার ('farmer') হিসেবে মাঝির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার পর জমিদার যদি খাজনা বাড়িয়ে দেয়, তাহলে মাঝির করণীয় কী? কমিশনারের মতে, মাঝি এ বিষয়ে আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করবে। আদালতের মামলা ব্যয়সাপেক্ষ বলে মাঝি মামলার ঝামেলায় যেতে চাইত না। আর মাঝি জমিদারের খাজনা বাড়ানোর দাবি মেনে নিলে গ্রামের সাঁওতালরা স্বেচ্ছায় মাঝিকে দেয় অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে দিত। সাঁওতালদের সমাজ-সংগঠনে এ সংহতিবোধ কমিশনার বুঝতে চান নি। তাই তাঁর এ উদ্ভট সিদ্ধান্ত: 'Unfortunately the Sonthals are stupid, and as a rule, consider their lot and the manjee's lot as bound up together.'

বাঙলা, বাংলা

বাঙলা বর্ণমালা থেকে অনুস্বার (ং) তুলে দেবার একটি প্রস্তাব এসেছে। প্রস্তাবটি ভালো। সমর্থনযোগ্য। অনুস্বারের উচ্চারণ 'ঙ' দিয়ে ঠিকই প্রকাশ করা যায়।

প্রস্তাবকরা কি অহঙ, এবঙ, বরঙ, সুতরাঙ লিখতে রাজি? এবঙ, সরাসরি সংস্কৃত থেকে উদ্‌ধৃতিতে? যেমন, 'জানামি ত্বাঙ প্রকৃতিপুরুষঙ কামরূপঙ মঘোনঃ॥'

আর-একটি সমস্যা। 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্রের নামের বানানে কী করা হবে? ওঁরা না পালটানো পর্যন্ত সম্ভবত ওঁদের সংবিধানসম্মত নামের বানান যা আছে তা-ই রাখতে হবে।

তিন বোন ১

গুণময় মান্না

রবিবারের সকাল, বেলা নটার কাছাকাছি। বাজারটা সেরে আসা দরকার, বেশি দেরি হলে স্ত্রী বিরক্ত হবেন বুঝতে পারছি। কিন্তু এমন আলসেমি লাগছে যে আরাম-কেদারার হেলান ছাড়তেই ইচ্ছে করছে না, ওঠা তো দূরের কথা। খবরের কাগজটা চোখের সামনে রাখছি একবার, একবার টিপয় থেকে তৃতীয় কাপ চায়ের শেষ চুমুক দিচ্ছি, ফস করে দেশলাই জ্বালছি সিগ্রেট ধরাবার জন্য। শরীরটা অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে দেখছি। বছরখানেক পরে রিটায়ার করব, তখন না জানি কী হাল হবে।

একটি ষোলো-সতেরো বছরের মেয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। কাগজ আর সিগ্রেট সরিয়ে একবার চোখ না তুলে পারলাম না। মেয়েটির মুখে একচিলতে মুচকি হাসি, চোখে বোধহয় একটু দুষ্টু-বুদ্ধি। পরেছে শালোয়ার-পানজাবি, উড়না সমেত। তিনটে তিনরকম রঙের। আমিই পালটে মনে-মনে হাসলাম—মেয়েটির সাজবার শখ খুব, কিন্তু রুচি নেই, নেই হয়তো সঙ্গতিও। চোখে ধ্যাবড়া কাজল, শালোয়ারটা খাটো, তবু সেটাই পরেছে।

কে, কেন এসেছে এসব প্রশ্ন না করেই চালান করে দিলাম, 'ভিতরে মাসিমার কাছে যাও, ডান দিকে দরজা…'

খবরের কাগজে চোখ রাখলাম, কিন্তু আজকাল মনঃসংযোগ হয় না দেখছি। তা ছাড়া সব বাসি, একঘেয়ে খবর—কোথায় তেলের ট্যাঙ্কারের ওপর আক্রমণ, কোন্ রাজ্যের শাসকদলের বিধায়করাই বিদ্রোহী, আর নারীনির্যাতন। কাকে পুড়িয়ে মেরেছে, কতগুলোকে চাকরি দেবার ছল করে এনে বিক্রি করে দিয়েছে। দিনকাল যে কী পড়ল! কই, বছর দশ আগেও মেয়েদের নিয়ে এত খবর ছিল না। বিশেষ করে এইসব ধিক্কারজনক খবরগুলো।

রাখলাম কাগজখানা, সিগ্রেটে শেষ টান দিয়েছি,

এইবার উঠতেই হবে—ভেতর থেকে স্ত্রীর রূঢ় কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, 'কী নাম, মিনতি? মিনতিই বটে …ওঁদের অফিসের বেয়ারার মেয়ে? তা আমার কাছে কেন, ওঁর কাছেই যাও…'

এই রে, অজান্তেই সাপের লেজে পা দিয়ে ফেলেছি। তখন না ভেবেই মেয়েটিকে স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম—মানে, এইটুকু ভেবে যে মেয়েরা মেয়েদের কাছেই যাক। ভুলেই গিয়েছিলাম, স্ত্রী মেয়েদের ছু-চক্ষে দেখতে পারেন না, বিশেষ করে এই এখনকার উচ্চিংড়ে (কথাটা তাঁরই) মেয়েগুলোকে। আমাদের দুটিই ছেলে, প্রবীর বর্তমানে বিদেশে আছে রিসার্চের জন্য; ছোটো সুবীর উচ্চ-মাধ্যমিক দিয়ে জয়েনট এন্ট্র্যান্সের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আমাদের মেয়ে নেই। স্ত্রী ছেলেদের নিয়ে গর্ব করেন, তা গর্ব করার কারণ আছে বটে, আবার মেয়ে নেই বলেও তাঁর গর্ব। বলেন, 'আমার খুব ভাগ্য ভালো আমার গর্ভে মেয়ে জন্মায় নি…' মানে, তিনি আজকালকার মেয়েদের রীত-ব্যাভার দেখে লজ্জায় মরে যান, ক্রোধে টগবগিয়ে ওঠেন। বুঝলাম, কিন্তু যদি মেয়ে থাকত তাহলে তিনি কী করতেন—ফেলে দিতেন?

আরাম-কেদারা ছেড়ে উঠেছি, মিনতি ভেতর থেকে বেরিয়ে আবার এ-ঘরের দরজার সামনেই এল। আশ্চর্য হলাম যে তার মুখে কোনো অপমান কি লজ্জার চিহ্নমাত্র নেই। খুব খুশি, যেন মাসিমা আদর করেছেন। উচ্ছল কণ্ঠে বলল, 'বাবা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিল, দিয়ে বাজারে গেল বোনদের জন্য জামা-কাপড় কিনতে…আপনি আমাকে ডেকে-ছিলেন, জ্যেঠু?'

আবার সেই রুচির অভাব, বাবা পাঠিয়ে দিল, কিনতে বাজারে গেল! অবাকও হলাম অন্য কারণে, আমি ডেকে পাঠিয়েছিলাম! মিনতির চোখ তখন পড়েছে রাস্তার ওপর, 'এই যে বাবা…'

একটু আগেই শুনেছি মিনতির বাবা আমাদের অফিসের বেয়ারা, কিন্তু কোন্ জন? ঘরের বাইরে আসতে হল না, রাজেন দরজার মুখে মিনতির পাশে এসে হাতজোড় করে একটু নত হয়ে নমস্কার করে হাসল, 'আপনি স্যার বেরোচ্ছেন? একে আনতে বলেছিলেন…স্যার, একে একটু বুঝিয়ে বলবেন তো, আমার কথা তো শোনে না। একটুও লেখাপড়া করে না, স্যার, কিন্তু আপনার কথা ঠেলতে পারবে না…'

আমার একটু গোলমাল লাগছিল। রাজু আমাদের অফিসের পুরনো বেয়ারা—লোকটি সাদা-সিদে, মাথায় টাক, গোলগাল মুখ, সব সময়ই সেই মুখে হাসি, আর কাজ বললেই তৎক্ষণাৎ তালিম করে, আজকাল লয়ালটির খুব অভাব দেখা যায় সর্বস্তরেই, কিন্তু রাজু সম্বন্ধে সেকথা বলা যায় না। ওকে দেখলেই ভালো লাগে। তাছাড়া, অফিসের কাজের বাইরেও আমার চা-সিগ্রেট আনা, কি টিফিনের কৌটো এগিয়ে দেওয়া, এসব কাজে আমি ওর কাছে কতকটা বাঁধা।

কাজেই, এই বেলা হয়ে গেছে, বাজারে বেরুবার মুখেই এই বাধাটা ভালো না লাগলেও, আমি হেসে বললাম, 'রাজু, তোমার মেয়ে তো তোমার কথা ঠেলেও না। এই তো, আমার কাছে আসতে বলেছ, এসেছে। তুমিই ওকে শান্ত-সুবোধ মেয়ে হয়ে পড়া-শুনো করতে বোলো…'

'ওরে বাস্‌রে, আমি বলব লেখাপড়ার কথা! আমার কানাকড়ির যোগ্যতা আছে? স্যার, আপনি আমাদের মাথার উপর বাপ-মা আছেন, কত শিক্ষা আপনার, আমরা সব বলাবলি করি। আপনার ছেলেদের কথা, স্যার…সারা শহর গুণগান করে, বড়োবাবু, ছোটোবাবু…'

ওর কথা শেষ হল না, ছোটোবাবু অর্থাৎ আমাদের ছোটো ছেলে সুবীর বাইরে থেকে ঘুরে ঢুকল, তার হাতে একগোছা কাগজপত্র, 'বাবা…'

একটু থমকে গেল সুবীর, এদেরকে দেখে। পরক্ষণেই যোগ করল, 'বাবা, হেড-স্যার বললেন কাল অফিসে যেতে, সেখানেই সই করবেন। বললেন যে

বাড়িতে সীল নেই…'

হল কী, মিনতি সুবীরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ খিকখিক করে হেসে ফেলল, তারপর হাসি চাপতে না পেরে বাঁ-হাতের রুমালটা মুখে চাপা দিল।

'মিনু-মা, ছি, বড়োদের সামনে হাসতে নেই। দাদা গুরুজন, লেখাপড়ায় হীরের টুকরো…নে, প্রণাম কর, জ্যাঠামশায়কে করেছিলি? একটু পায়ের ধুলো পেলেও…'

মিনতি কী করত বলা যায় না, কিন্তু ঠিক তখনই ওদিকের ঘরের ভেতর থেকে স্ত্রী ভারী গলায় বলে উঠলেন, 'খোকা, শোন্, এদিকে আয়, পরে বাবাকে বলিস…'

সুবীর চলে গেল।

আমার মাথার ভেতরটা গরম হয়ে উঠেছে, রমার রূঢ়তার কোনো সীমা নেই। বুঝলাম, ওরা ঠিক এই মুহূর্তে অবাঞ্ছিত অতিথি, এমন-কী তর্কের খাতিরে ধরা গেল মিনতি এক কথাটে মেয়ে, কিন্তু আমাদের সৌজন্যবোধ থাকবে না কেন। সুবীর প্রণাম নিলে, কি একটা কথা বললে ছোঁয়াচ লেগে যেত!

ব্যাপারটা চাপা দিতে হল আমাকে, হেসে বললাম, 'রাজু, বেলা হয়ে গেছে, বাজারে বেরোচ্ছি আমি…তোমাদের সঙ্গে আর-এক সময় কথা বলব…' ঘরের কোণ থেকে ঝোলাটা তুলে নিলাম, 'মিনতি, শোনো, মন দিয়ে লেখাপড়া কোরো, বাবার মনে কষ্ট দিও না…'

এতেও একটু হেসে ফেলল মিনতি, কিন্তু সায় দিয়ে মাথাও কাত করল। দরজার বাইরে বেরোতেই আর-এক দৃশ্যের সম্মুখীন হলাম, মিনতি সোৎসাহে বলল, 'ওরা আমার বোন…'

দেখলাম, রাস্তার পাশে দুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাত ধরাধরি করে। মিনতি মতোই মুখের আদল, মনে হল পিঠোপিঠি বোন সব, বয়সের তফাত এক বছর কি দু বছরের বেশি নয়। এও মনে হল, ওরা এখনো মিনতির মতো শৌখিন, কি চালিয়াত হয় নি। তবে কী রকম করে আমাকে দেখছিল, পরীক্ষার দৃষ্টিতে —যেমন বিরুদ্ধ পক্ষকে দেখে।

যাকগে। পাছে এদের সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ আটকে যেতে হয়, তাই তাড়াতাড়ি সেরে দিতে চাইলাম, 'তোমার নাম কী?'

'সুমতি…'

'আর তোমার?'

'আমার নাম রত্না দাস…'

'সে কী রাজু, মেয়েদের কী নাম রেখেছ? মিনতি-সুমতি তো বেশ মিলেছে, কিন্তু…'

উত্তর দিল মিনতি, 'জ্যেঠু, ও আমাদের মাসতুতো বোন। মেসো-মাসি দুজনেই মরে গেছে, তাই বাবা নিজের মেয়ে বলে মানুষ করছে…'

'ও…', তাড়াতাড়ি চলে গেলাম। মিনতিকে মনে-মনে বললাম, তোমার সঙ্গগুণে অন্য দুটো বোন কি আর মানুষ হতে পারবে।

২

দুপুরবেলা খেতে দিয়ে স্ত্রী সোজাসুজি চার্জ করে বললেন, 'ওই মেয়েটাকে ডেকে পাঠিয়েছিল কেন?'

'না, ঠিক ডেকে পাঠাই নি। আরে, শোনো, মিনতি তাই বলছিল তো?…হ্যাঁ, ওরা চলে যাবার পর মনে পড়ল। অফিসে একদিন কথায়-কথায় রাজুকে তার ছেলেমেয়ের কথা জিজ্ঞেস করছিলাম… জান, আমাদের ঠিক উলটো, ওর ছেলে নেই। ঘরের কথা, মেয়েদের কথা বলল, আমি শুধিয়েছি, তাইতেই খুব খুশি। স্ত্রী রুগ্‌ণ, মেয়েদের সব দেখাশোনা রাজুকেই করতে হয়। ওর ইচ্ছে, মেয়েদের লেখা-পড়া শেখায়। বলেছিলাম বটে, তোমার মেয়েদের নিয়ে এসো একদিন…'

'লেখাপড়া শেখার মেয়েই বটে…', স্ত্রী মুখ টিপে হাসলেন, 'তা তোমার সঙ্গে কী?'

হাসলাম আমিও, 'রাজুর চোখে আমি কেবল বস

নয়, আমি দারুণ পণ্ডিত। আর আমাদের ছেলেরা এক-একটি শংকরাচার্য, যদি একটু বাতাস-টাতাস লাগে, মানে রাজু তাই মনে করে…'

'আমিও বাতাস-টাতাস লাগার ভয় করি…', রমা গম্ভীর স্বরে বললেন, 'ছেলেদের সঙ্গে ওদের কখনো দেখা হয় এ আমি একেবারেই চাই না…'

'না চাইলে…'

একটু খারাপ লাগল, এতটা ছুঁইছুঁই কেন। খেতে-খেতে রাজুর কথাটা ভাবছিলাম। বললাম, 'দেখো, রাজুর মেয়েরা ভালো কি মন্দ এক মিনিট দেখেই বলা যায় না। কিন্তু রাজুকে আমি অনেক দিন থেকে জানি, খুব ভালো মন ওর। আর বাবা হিসেবে…'

'থাক, যে বাবা মেয়েকে কনট্রোল করতে পারে না, তাকে আর সার্টিফিকেটটা না-ই দিলে…'

'কনট্রোলের বাইরে কী দেখলে তুমি…সাজ-পোশাক? আজকাল কে না সাজে…তোমার ছেলেরা সাজে না?'

'ইস, কী রকম তুলনা করলে, তোমার কিছুতেই ঘেন্না হয় না…'

স্ত্রী উঠে গেলেন। ধরে নিচ্ছি, পাতে দেবার জন্য কিছু আনতে গেলেন। রাজুকে বা তার মেয়েকে নিয়ে আর কোনো কথা হয় নি।

পরের দিন বিকেলে রোজকার অভ্যেসমতো বেড়াতে বেরিয়েছি, শহরের পাশ দিয়ে যে নদী বয়ে গেছে তার ধারে। স্ত্রী কখনো সঙ্গে থাকেন, কখনো থাকেন না, আজ ছিলেন। কিছুটা যেতে না যেতে স্ত্রী বললেন, 'আমাকে ছুটিয়ে মারবে নাকি, অমন ঝড়ের মতো চললে…'

গতি মন্থর করে তাঁর সমান হলাম, 'সরি, আমি মনে করেছিলাম, ব্রিস্‌ক্ ওঅকিং তুমি পছন্দ কর…'

একটু যেতে না যেতেই রমা আবার বিরক্তি প্রকাশ করলেন, 'নদীর ধার ছাড়া কি বেড়াবার জায়গা নেই? বলো ফিরি…'

'তখন বিকল্প পথের কথা তো বল নি। আজ যখন এসে পড়া গেছে…'

'তাহলে বাপু তাড়াতাড়ি চলো একটু…' চাপা স্বরে বললেন, এবং বেশ জোরে জায়গাটা পেরিয়ে যেতে চাইলেন।

'আরে, উলটো হয়ে গেল যে…' হেসে বললাম।

কিন্তু তার কারণটাও বুঝলাম। এই বিকেল-বেলাটা গঙ্গার ধারে মুক্তবায়ুলোভী আমাদের মতো লোকজন কিছু আসে বটে, কিন্তু সে আর ক-জন। ছেলেমেয়ে, আর যুবক-যুবতীরাই সব গুলজার করে রাখে; নদীর ধারে, পার্কে, যেখানে যাও সেখানেই তাই। স্বামী-স্ত্রীর জুটি থাকে ঠিকই, কিন্তু যারা স্বামী-স্ত্রী নয়, কোনোকালে হবেও না, তারাই বেশি। আবার একটা গোটা দলের পিছনে আর-একটা দল লেগেছে, এমনও আছে। ওরা নেমে পড়ছে নদীর কোলে, ছুটি বকের মতো বসে আছে, কথা বলছে কি বলছে না, উঠে আসছে বাঁধের গা বেয়ে।

স্ত্রী এইসবের মধ্যে এসে পড়তে হয়েছে বলে এমনিতে বিরক্তবোধ করছিলেন, আবার ঠিক তখনই আমাদের সামনে একটি ঘটনা। তেইশ-চব্বিশ বৎসরের এক বিবাহিতা মেয়ে তারই সমবয়সী কিংবা একটু ছোটো এক যুবককে হাত ধরে টেনে নিয়ে বাঁধের ওপর উঠল, রাস্তাটা তাড়াতাড়ি পেরিয়ে নামল গিয়ে নদীর কোলে। স্বল্পবাস মেয়েটির থেকে চোখ সরিয়ে চকিতে তাকালাম স্ত্রীর মুখের দিকে। বললাম, 'আর খানিকটা গেলেই ভিড় কমে যাবে, ওদিকটায় নিরিবিলি…'

রমার মুখখানা শুকনো, কঠিন। চোখ সোজা সামনের দিকে, তাঁর পক্ষে যতটা সম্ভব দ্রুত এগোচ্ছেন, রাস্তায় যেন তাঁর চোখে কিছুই পড়ে নি।

সেটা ঠিক কথাই। আমাদের তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, রাস্তায় মেয়েরা বেলেল্লাপনা করলে আমাদের কী। তা ছাড়া, মাথা নেই তার মাথাব্যথা, আমাদের কোনো মেয়েই নেই। আমি

বরঞ্চ অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতে চাইলাম, 'দেখো, জয়েনট এনট্রান্স তো এসেই গেল…কিন্তু তারপর কী? সুবীর কোন্ লাইনে যাবে…'

আশাতীত ফল পাওয়া গেল। স্ত্রী সঙ্গে-সঙ্গে যোগ দিলেন আমার সঙ্গে—বোঝা গেল, মন থেকে বিচ্ছিরি জিনিসগুলো তিনিও মুছে ফেলতে চাই-ছিলেন। বললেন, 'তোমার সঙ্গে তো আমার মেলে না, আমি বলি ডাক্তারি পড়ুক। তুমি তো এনজি-নীয়র আছই, আবার কেন…'

'বড়ো ছেলে কী বলে…লেখে তোমাকে কিছু?'

'ও গেল চিঠিতে লিখেছে, ভাই নিজে যেটা চায় সেই লাইনেই দিও। খোকাকে জিগ্যেস করেছিলাম, সে বলে, আগে পরীক্ষা তো দিই। ছুটোতেই চান্স পাব এটা ভাবছ কেন…'

'ঠিক কথাই। তবে আমাদের হাতে এখনো অনেক সময় আছে…'

কিন্তু আমাদের মন্দভাগ্য, আবার আমরা একই রকম—বরং এবারে একটা অতি বিচ্ছিরি ঘটনার সম্মুখীন হলাম। এদিকটা আমাদের প্রত্যাশামতো নিরিবিলি ঠিকই, কিন্তু নিরিবিলির সুযোগ অন্যরাও খোঁজে।

আমাদের ডান দিকে নদীর পরপারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, বাঁ দিকে গ্রামের বনজঙ্গলে আবছা আঁধার নেমে এসেছে—জায়গাটা মনোরম সন্দেহ নেই। পথে কিছু লোক আছে, তবে দেখে মনে হয় গ্রামের মুনিষ-মজুর সব, শহরে সারাদিনের কাজকর্মের পর তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছে। একেবারেই তৈরি ছিলাম না, হঠাৎ আমরা ওদের চার জনের দলটির একেবারে কাছে এসে পড়লাম—জায়গাটা বাঁকের মাথায়, একটা ঝাঁকড়া বটগাছের আড়াল ছিল বলে আগে থেকে চোখে পড়ে নি।

স্ত্রী চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের মিনতি না?…'

'হুঁ…'

আমার গলার মধ্যে আটকে গিয়েছিল, যেন পা ছুটোও। মিনতিকে এক যুবকের সঙ্গে এই অবস্থায় দেখব একটুও আশঙ্কা করি নি। যদিও ওরা রাস্তা থেকে খানিকটা নীচে নদীর কোলে বসেছে, এদিকে পেছন-ফেরা, নিজেদের নিয়েই মশগুল—তবু মনে হল, দৈবাৎ যদি পিছন ফেরে। তাহলে লজ্জার শেষ থাকবে না।

'চলে এসো…'

স্ত্রীই বাঁচিয়ে দিলেন, আমরা সেখান থেকেই একেবারে উলটোমুখে ফিরলাম, এবং দ্রুত জায়গাটা ছেড়ে এলাম। যা দেখেছি, সে নিয়ে যে স্ত্রীর সঙ্গে কোনো কথা হতে পারবে তা ভাবি নি, কিন্তু একটু অবাক লাগল যে তিনিই কথাটা তুললেন।

'সঙ্গে আর ছুটো মেয়ে কে?'

'মিনতির বোন…তুমি কাল দেখ নি। ওরা গেটের বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল…'

'ছেলেটাকে তুমি চেন?'

'চেনার কোনো প্রশ্নই নেই, কী করে চিনব। মনে হল ভদ্রঘরের ছেলে…'

'ছেলেটাকে গিলে খাচ্ছে…আর শয়তানি দেখেছ ওই ছোটো মেয়ে ছুটোর। একটু নীচের দিকে বসেছে বোন ছুজনে, যেন নিজেদের মধ্যে কত কথা আর নদীর জলে কী নাই জিনিস দেখছে…দিদিকে যা-খুশি করার সুযোগ দিচ্ছে আর কী। শয়তান, শয়তান, ওদের প্রত্যেকটার রক্তের মধ্যে শয়তানি আছে…'

আমি কিছু বলতে পারলাম না। এমন অপ্রস্তুত লাগছিল—কাল স্ত্রীর কাছে ওদের পক্ষে কিছু বলে-ছিলাম!

হঠাৎ রাগ চলে গিয়ে স্ত্রী একটু হেসে উঠল খিক করে, 'কেমন, তোমার-রাজুর মেয়েরা লেখাপড়া শিখবে তো?'

'দেখছি তাই…' স্ত্রীর বলার টোনটা আমার ভালো লাগছিল না।…'রাজুর জন্য ছুঃখ হয়, মেয়েদের জন্যে সে এত করে…'

'এত বোকামি করে, বল···তুমি বরঞ্চ তাকে বোলো লেখাপড়ার আর দরকার নেই, মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিক···'

'তাই বলব ··' ক্লান্ত স্বরে বললাম, চাইছিলাম যে প্রসঙ্গটা স্থগিত থাক।

৩

বলব বললাম বটে, কিন্তু রাজুর সঙ্গে পরের দিন পনেরো-কুড়ি আমার দেখাই হল না। সে কী জন্যে কয়েক দিন ছুটি নিয়েছিল, আমাকেও টুরে যেতে হয়েছিল বার দুয়েক, আর টিফিনের সময়ও প্রায়ই ফাইল ঠেলি। তখন রাজু কাছে এলেও ওসব কথা বলার উপযুক্ত অবকাশ হয় না।

রাজুকেও দেখলাম একটু অন্যরকম যেন, একটু রোগা, চুপচাপ, তবে সেটা আমার ভুল হতে পারে। আর সত্যি কথা বলতে কি, সেই দুদিন মনের মধ্যে একটা আলোড়ন উঠেছিল বটে, সেটা একরকম ভুলেও যাচ্ছিলাম। কোনো এক বেয়ারার মেয়ের বিয়ে নিয়ে আলোচনা করতে উৎসাহও ছিল না।

একদিন টিফিনের পর খালি কাপ-ডিশ নিয়ে চলে যেতে গিয়েও রাজু দরজার পরদার কাছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি সিগ্রেট ধরিয়ে জিগ্যেস করলাম, 'কী, রাজু, কিছু বলতে?···তোমার বাড়ির সব খবর ভালো তো?'

দেয়ালের পাশে মেঝেতে কাপ-ডিশ নামিয়ে ফিরে এল রাজু, দেখলাম তার চোখ দুটো ভিজে-ভিজে। একটু বিহ্বল স্বরে বলল, 'মেয়েটা অথৈ জলে পড়ল, স্যার···মনটায় খুব কষ্ট আছে, কিছু প্রতিকার করতে পারছি নি···'

'অথৈ জলে পড়ল? কী বলছ তুমি ··'

'শুনবেন, স্যার, সে অনেক বিত্তান্ত। আপনাকে বলব বলে ভেবেছিলাম, স্যার, পাছে বিরক্ত হন তাই বলি নি। স্যার, পল্লব বলে একটি ছেলে···ওদের ফ্যামিলি ভালো, স্যার, স্বচ্ছল গেরস্ত, বাপ-মা, আরো দুই ভাই আছে, কিছুটির অভাব নেই···সে ছেলের সঙ্গে মিনু-মা যে কবে ভাব-ভালোবাসা করে আসছিল, কিছুটি জানি নি, স্যার···'

চকিতে সেদিনের সেই নদীতীরের কথা মনে পড়ল। আন্তরিক দুঃখিত হলাম, মনে-মনে বললাম, 'রাজু, তুমিই জানতে না, তা না হলে ওরা তো এক-হাট লোকের মধ্যে সব কিছুই খোলাখুলি করে।'

রাজু আপসোস করে বলল, 'মেয়ে কি একদিনের জন্যও আমাদিকে বলেছিল, তা হলে তো বারণ করতাম। সে ছেলে একদিন এসে বলে, আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিন। আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম ···ছেলে ভালো, স্যার, সেকথা একশ বার স্বীকার করব, লম্বা চওড়া চেহারা, মুখখানি দেখলে চোখ জুড়ায়, লেখাপড়া শিখেছে, রোজগারও আছে কিছু। এমন ছেলে জামাই পেলে কে না লুফে নেবে। কিন্তু আমার ভয় হল, বললাম এ-বিয়ে কী-রকম হবে, তোমরা হলে উঁচু জাত, তোমার বাপ-মা আছেন, তাঁদের কাছে যেয়ে আমার অনুমতি নিতে হবে। ছেলে বলল, কেন অপমান হবেন, রেজিস্ট্রি বিয়ে দিন ···তা আমার অতটা সাহস হল না। বললাম, আমাকে মাপ করতে হবে, সে আমি পারব না। ছেলে চলে গেল তখনকার মতো, পরের দিন মিনুর মায়ের কাছে এসে ভয় দেখিয়ে গেল, মেয়েকে আপনারা আটকে রাখতে পারবেন? মেলামেশা আমরা করবই, তাতে যদি মেয়ের কিছু খারাপ হয়ে যায়, কলঙ্ক হবে কার? বিয়েটা দিলে ভালো হত না কি···'

অসহিষ্ণু হয়ে রাজুকে থামালাম, 'ভয় পেয়ে ছেলেটার সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দিয়েছ তো? তুমি এই রকম কাপুরুষ কেন? একটা গুণ্ডা তোমাকে শাসাল, আর তুমি···সেই রাস্কালটা তোমাকে কিসের ভয় দেখিয়েছিল বুঝতে পার নি?'

'স্যার, রাগ করবেন না···রাগ আমারও হয়েছিল।

মাথার ভিতর আগুন জ্বলেছিল। কটা দিন আমি যেন পাগলের মতো হয়ে গেছলাম···মুখে খাবার তুলতে পারি না, অফিসে আসতে পারি না। ক্যাজুয়েল লীভ নিয়েছিলাম, স্যার···'

মনে পড়ল বটে, মাঝখানে রাজু কয়েক দিন অনুপস্থিত ছিল।

আমি কিছু বললাম না, এবং অপেক্ষা করে রয়েছি দেখে রাজু বলল, 'তবে কিসে আমার মত হল, তাই জানতে চাইছেন তো? তাই বলি। আমার ছেলে নাই, ভাই-ভাগারি নাই, ওই দুই মেয়ে, কি তিন মেয়ে বলতে পারেন। আর আমার স্ত্রী···মানুষের নিজের আর কতটুকু, বলুন? যাদের নিয়ে আপনার সংসার, তারা সবাই যদি আপনার বিরুদ্ধে যায়, আপনি কী করবেন? স্ত্রী ওকেই জামাই করতে চায়, বড়ো মেয়ের কথা ছেড়েই দিলাম, তাকে নিয়েই তো কথা, অন্য দুইমেয়েও ওই এক দিকে। তাতেও শক্ত হয়ে ছিলাম আমি। শেষে আমার মত বদলে গেল···সে ওই ছোটো মেয়ে রত্নার জন্য। নিজের মেয়েকে বাগে না আনতে পেরে, আমি শালীর মেয়ে রত্নাকেই ধরলাম, তুই একটু তোর দিদিকে বুঝিয়ে বল, মা। উলটে সে কী বলল জানেন? বলল, মেসোমশাই, পল্লবদার সঙ্গেই দিদির বিয়ে দিন, তা না হলে ও সুইসাইড করবে। আর দিদি যদি সুইসাইড করে, তাহলে আমরা···সবটা বলল না রত্না, চেপে গেল। শেষে আর-একটা কথা সে বলেছিল, কাঁদতে-কাঁদতে, পল্লবদার মুখ আমরা ভুলব কী করে···পাগল, পাগল, ওরা সবাই যেন পাগল হয় গেছল···'

'কথাটা তোমার ছোট মেয়ে বলল!···তার মানে কী হল, সে-ই বা কাঁদে কেন?'

রাজু ঘাড় নেড়ে বলল, 'জানি না, স্যার, ওদের কথার মানে বুঝতে পারি নি। শুধু এইটুকু বুঝলাম, ওরা সবাই যখন একদিকে ছুটেছে, তখন আমি আর বাধা দিই কেন? ওদের ভালো হলেই হল···'

'তাহলে বলছিলে কেন, মেয়েটা অথৈ জলে পড়ল?

ছেলে ভালো, ঘর ভালো, মেয়েরাও চাইছিল···'

'বলছি, স্যার। ছেলের বাপ-মা, ছেলে-বউকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, ছদিনও পেরায় নি···'

'তা মেয়ে-জামাই তোমার কাছেই আছে তো?'

ফ্যাকাশে রক্তহীন মুখে রাজু হাসল, 'তা হলে ত ভাগ্য মানতাম। কাছে রাখবার জন্যে কত সাধাসাধি করলাম, জামাই যদিও মত করে, মেয়ে কিছুতেই আসবে না···'

'তা ওরা কোথাও তো আছে···'

'তা আছে, স্যার। ওই নদীর ধার দিয়ে মাইল চারেক যেয়ে গাঁয়ের মধ্যে একটা ঝুপড়ি ভাড়া নিয়ে আছে। পাশেই গো-বাথান···শহরের গোয়ালারা সেখানে গোরু রাখে···'

'ঠিক জায়গাতেই আছে, তুমি চিন্তা কোরো না···'

রাজুকে এরকম কথাটা বলা আমার উচিত ছিল না, কিন্তু আমার কী রকম রাগ হচ্ছিল, নিজেকে ঠেকাতে পারলাম না। রাজুর সেটা লক্ষ করার মতো মানসিক অবস্থা নয়। সে বলল, 'না, চিন্তা আমি করি না, ওর বোনেরা প্রায় যায়। খপর টপর নিয়ে আসে, খুব গরিবের মতো থাকে, মিনুমা নাকি তাতেও খুব খুশি···কিন্তু স্যার, দুঃখ কী জানেন, বিয়ের পর মিনু আমার ঘরে আসে নি, জামাইকেও আসতে দেয় না···নিজের বাপ-মাকেও তার ঘরে যেতে দিবে নি, ই কী রকম খেপামি বলুন তো স্যার! আমরা কী দোষ করলাম? ছুটো পয়সা, কি কিছু জিনিসপত্র পাঠালেও নেবে না। বাপের মনে দুঃখ হয় কিনা বলুন···'

'মনে করো, তোমার মেয়ে সুখী হয়েছে, যা চেয়েছিল পেয়েছে। তাহলে তোমার নিজের আর দুঃখ থাকবে না। আচ্ছা, এখন তুমি এসো···'

'হ্যাঁ, স্যার···' থতমত খেয়ে থেমে গেল রাজু, এতক্ষণ যে আমার সময় নষ্ট করেছে, তার জন্য লজ্জিত। নমস্কার করে চলে গেল।

সেদিন রাত্রে স্ত্রীকে সমস্ত কথাই বললাম, রাজুর কাছে যা শুনেছিলাম। ভেবেছিলাম, স্ত্রী উত্তেজিত হয়ে উঠবেন, কি মিনতির শ্রাদ্ধ করবেন, কিন্তু তিনি সেসব কিছুই করলেন না। আগাগোড়া শুনলেন কাহিনীটা, তাও বিচিত্রভাবে, যেন এসব যে ঘটবে সেটা তিনি আগেই জানতেন, আমি বলছি অগত্যা তাঁকে শুনতে হচ্ছে, ভাবটা এইরকম। শোনার পর উঠতে যাচ্ছিলেন, আমি ক্ষুণ্ণ হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কিছু বলবে না? অন্তত বাবা হিসেবে রাজু যে দুঃখ পেয়েছে…'

'তোমরা পুরুষেরা মেয়েদের কথা কিছুই বোঝ না…' বলে তিনি চলে গেলেন।

যা বাব্বা, স্ত্রীই আমাকে যেন ধাঁধা লাগিয়ে দিলেন। মিনতি, বা মিনতির মতো মেয়েদের সম্বন্ধে তিনি যেসব বিষোদ্‌গার করে থাকেন, কই, সেসব তো কিছুই শুনলাম না।

যাকগে, এসব কুটকচালে ব্যাপার নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাতে চাই না। সিগ্রেটের প্যাকেটটা টেনে নিয়ে কেদারায় গা এলিয়ে দিলাম।

অবশ্য মাথা ঘামানোর আমার নিজেরই অনেক জিনিস ছিল। এক বছর পরেই আমি রিটায়ার করছি, তারপর মফসসল ছেড়ে কলকাতার কাছে আমাদের পৈতৃক বাড়িতে চলে যাব। আজকাল অফিসে কাজের চাপ বেশি, তাছাড়া আমার সার্ভিস বুক সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র ঠিক করার ব্যাপারে আমাকে দিনের পর দিন ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। এদিকে, ছোটো ছেলের পরীক্ষার পর তাকে ঠিক লাইনে দেওয়ার সমস্যাও ছিল।

এসব কারণে, এবং রাজুর মেয়েদের ব্যাপারে কী রকম একটা অ্যালারজি হয়ে গিয়েছিল, সেইজন্য ওকে আর কোনো কথা জিজ্ঞেস করি নি। আর লোকটা যতই বশংবদ হোক, জিজ্ঞেস না করলে নিজের থেকে কিছু বলেও না। তবে লোকটার ভাগ্য মন্দ, কলকাতা যাবার আগে শুনলাম, ওর বড়ো মেয়ে মারা গেছে, এবং মেজো মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে।

আমাদেরই অফিসের আর-এক বেয়ারা বিপিন আমাদের জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদা এবং গাড়িতে তোলার ব্যাপারে খুব সাহায্য করছিল। স্ত্রীকেই সে কথাগুলো জানিয়েছে—রাজুর পাড়াতেই নাকি তার ঘর। মিনতির স্বাস্থ্য খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল—ছেলে হতে গিয়ে মারা যায়। বিপিনের ধারণা, জামাইটা অত্যন্ত বদ, তার চরিত্রদোষও আছে, প্রসব-বেদনার সময় বউকে হাসপাতালেও দেয় নি—কে জানে, বউটা যাক, সেরকমই হয়তো চেয়েছিল। রমা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আর মেজো মেয়ের বিয়ে হল কোথায়?' বিপিন সজোরে মাথা নেড়েছিল, 'উটি বলতে পারব নি, মাসিমা। রাজুদার ফ্যামিলিটাই ওইরকম। বড়ো মেয়ের বিয়ে হয়েছিল রেজিষ্ট্রি করে, মেজো মেয়ের হল কালীবাড়িতে পুজো দিয়ে, আবার ছোটো মেয়ের কী রকম হয়…তা কোথায় বিয়ে হল, কার সঙ্গে হল, কেউ কিছু জানে নি, মাসিমা, জামাইকেও দেখে নি, মেয়েও হাওয়া। কে জানে, বাবা, মেয়েকে বিক্রি করে দিল নাকি, আজকাল তো সেরকমও হচ্ছে…'

রমার কাছে বিবরণ শুনে আমি মাথা নাড়লাম, 'হতে পারে না, এটা বিপিনের রটনা। আচ্ছা, কালই আমি জিজ্ঞেস করব রাজুকে…'

'পরের মেয়ে নিয়ে তোমার অত মাথাব্যথা কেন? কিছু জিগ্যেস করতে হবে না তোমাকে…'

আচ্ছা-আচ্ছা। তাই হবে। কিন্তু তিনি যে পরের মেয়ের সাত কাহন কথা শুনে রিপোর্ট করছিলেন, তার কী?

কলকাতায় গিয়ে বছরখানেক কোথা দিয়ে যে কেটে গেল বুঝতে পারি নি। রাইটার্স বিল্ডিংসে পেনসন সেলে বারবার ছুটতে তো হচ্ছিলই, ইতিমধ্যে আমাদের বড়ো ছেলে বিদেশ থেকে ফিরে এসেছিল, তার বিয়েও দিয়েছি। বউ নিয়ে সেখানেই সে ফিরে

গেছে। পাত্রী-নির্বাচন ইত্যাদি ব্যাপার স্ত্রীর ওপর পুরো ছেড়ে দিয়েছিলাম, কেননা, তাঁর ধারণা ওটা আমি একেবারেই পারব না। মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, আমার পাত্রী কিন্তু আমিই নির্বাচন করেছিলাম—বলি নি, কারণ আজকাল তাঁর মেজাজের ঠিক থাকে না, পরিহাসও বোঝেন না কখনো-কখনো, সে নিয়েই যদি ঝাঁকিয়ে ওঠেন। ছোটো ছেলে সুবীর মেডিক্যালেই পড়ছে, বাড়িতে থেকে। এ ব্যাপারেও স্ত্রীর জেদটা শেষ পর্যন্ত বজায় থেকেছে।

সে যাই হোক, বছরখানেক পরে আবার আমাকে পূর্বতন কর্মক্ষেত্রে একবার আসতে হল। পেনসন-সংক্রান্ত আরো কিছু কাগজ উদ্ধার করবার জন্য, এ জিনিস যেন শেষ হয়েও শেষ না। স্ত্রীও সঙ্গে এলেন, আমরা দুজন উঠলাম আমাদের এক সহকর্মীর কোয়ার্টার্সে। তাঁরা বেশ সমাদরেই গ্রহণ করলেন।

দুদিন ছিলাম। দুপুরবেলা অফিসে চলে যেতে হত, ফিরতে সন্ধের কাছাকাছি। স্ত্রী বন্ধুর বাসাতেই থাকেন। দ্বিতীয় দিন ফিরে বললাম, 'কাজ মিটল, কাল ভোরের গাড়িতেই ফিরছি। তুমি এর মধ্যে সব গুছিয়ে নিও…ওঁরা সব কোথায়, কারুর সাড়া-শব্দ পাচ্ছিনে…'

স্ত্রীর মুখের দিকে না তাকিয়েই বলে যাচ্ছিলাম, উত্তর না পেয়ে তাকাতেই একটু চমক লাগল। মুখ-খানা থমথমে।

'জান, রাজুর সঙ্গে দেখা হল…রাজুকে মনে আছে তো তোমার, তোমাদের অফিসের বেয়ারা, রাজু? কী চেহারা হয়েছে ওর, চেনা যায় না…'

আমি মাঝে-মাঝে তাই ভাবি, সব জিনিসেরই উলটো রথের পালা আছে। এক সময় রাজুকে আমি ভালো বলতাম। হয়তো ভালোও বাসতাম, তখন স্ত্রী তার ওপর খাপ্পা ছিলেন, সে মিনতির মতো মেয়েদের বাপ বলে…আর এই যে আমি এখন রাজুকে ভুলেই গেছি, তার বা তার মেয়েদের কথা মনে আনতে চাই না, এখন দেখছি তার সম্বন্ধে স্ত্রীর কণ্ঠে সমবেদনার সুর। আবার আমাকেই জিজ্ঞেস করা, রাজুকে তোমার মনে আছে তো? মায়ের কাছে মামাবাড়ির গল্প।

আমিও একটা খবর দিলাম স্ত্রীকে, 'অফিসে গিয়ে শুনলাম, সেও মাস তিনেক হল রিটায়ার করেছে। কিন্তু তাকে তুমি পেলে কোথায়?'

'যাচ্ছিল কোথাও, এই কোয়ার্টারের সামনে দিয়ে…আমি তো চিনতেই পারি নি, এমন চোখ-মুখ হয়েছে তার। ডাকলাম তাকে…সেও প্রথমটা চিনতে পারে নি, তারপর প্রণাম করে ধপ করে বসে পড়ল, হাঁপাচ্ছিল লোকটা। একটু চা করে দিতে চাইলাম, খেল না। এত করে বললাম তোমার সঙ্গে দেখা করে যেতে…প্রথম তো খুব খুশি হয়ে রাজি হল, তারপর হঠাৎ উঠে চলে গেল। মনে হয় ওর মাথার ঠিক নেই…'

'আমারও মাথা বেঠিক হবার জোগাড়…কথাটা কী বলবে?'

আমার বিরক্তিটা স্ত্রী লক্ষ করলেন না, ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'জান, রাজুর ছোটো মেয়েরও বিয়ে হয়ে গেছে, আর…দাঁড়াও, আগে তোমায় চা করে দিই…'

'সেই ভালো…'

স্পষ্টই লক্ষ করলাম স্ত্রী উত্তেজনা চাপবার জন্যে সরে যেতে চান, যেতে দিলাম। আমি জামা-কাপড় ছেড়ে হাতমুখ দিয়ে বসলাম বারান্দায়। স্ত্রী চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'রাজুর জামাই পল্লবকে তো তুমি দেখেছিলে…আচ্ছা, ওকে কি তোমার খুব সুপুরুষ বলে মনে হয়?'

'দেখেছিলাম সেই নদীর কোলে তো, বটগাছ-তলায়? তা সে তুমিও তো দেখেছিলে। আর সুপুরুষ কিনা সেই সার্টিফিকেট আমি না দিয়ে মহিলারা দিলেই ভালো হত না কি?'

আবার একটু চমক লাগল, আমার এই পরিহাসটা তাঁকে স্পর্শই করল না। স্পষ্টত, তিনি নিজের

ভাবনাতেই মগ্ন ছিলেন, মনের মধ্যে মেলাচ্ছিলেন কিছু, আমি উপলক্ষ মাত্র।

বললেন, 'আচ্ছা, মেয়েদের মধ্যে কী আছে বলতে পার? পুরুষদের মধ্যে কী দেখে তারা পতঙ্গের মতো পুড়ে মরে?'

এটারও উত্তর মেয়েদেরই দেওয়া উচিত—কিন্তু কথাটা বললাম না। অন্য দিকে আমার একটু লাগছিল—যে পুরুষ জাতের কথা স্ত্রী বলছিলেন, আমি নিশ্চয়ই তার বাইরেই রইলাম। আমার স্ত্রী কোনোদিন দগ্ধ হয়েছেন বলে তো মনে হয় না—না কি হয়েছিলেন?

স্ত্রী বললেন, 'জান না, রাজুর তিন মেয়েই পর-পর ওই পল্লবকেই বিয়ে করেছে…দুটো মেয়ে মরেছে, কে জানে ছোটোটাও মরবে কিনা…'

আমি আর নিস্পৃহতা বজায় রাখতে পারলাম না, 'মানে, কী বলছ তুমি…'

'তাই বলছি। মিনতিকে গ্রামে নিয়ে গিয়ে রেখে-ছিল পল্লব, কথাটা ঠিক কী কেউ জানে না, খুব কষ্ট দিত মেয়েটাকে, তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয় নি। মেজো মেয়ে সুমতি…তিন বোনই সেই প্রথম দিন থেকে ওকেই ভালোবেসেছিল কিনা কে জানে। পাছে বাবা বিয়ে না দেয়, তাই সুমতি কালীবাড়ি গিয়ে ভগ্নী-পতিকে বিয়ে করেছিল, দিদির মতো সেও বাপের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখত না। তারপর সে সুইসাইড করেছে…'

'ওটা একটা অভিশপ্ত ফ্যামিলি…কিন্তু ঘটনাটা কী?'

'না গো, অভিশপ্ত নয়, মেয়েদের মধ্যে কী আছে …তুমি সেই যে শুনেছিলে, ছোটো মেয়েটা বলেছিল, পল্লবদার মুখ ভুলতে পারব না, তো সেই দিকেই চেয়ে আছে সব মেয়ে…' স্ত্রীর কণ্ঠস্বর আবেগে ভারী হয়ে এল, 'মেয়েরা নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারে। সুমতি সুখেই ছিল, স্বাস্থ্যও নাকি ভালো হয়েছিল তার, গর্ভের পর মাতৃসদনে গিয়ে ফুটফুটে মেয়ে কোলে নিয়ে ফিরেও এসেছিল…সে মেয়ে এখন মানুষ হচ্ছে মাসির কোলে…হয়েছিল কী জান, ছোটো বোন এসেছিল পোয়াতি মেয়েকে সাহায্য করতে, দিদি-জামাইবাবুর সংসার চালাতে, আর কী, এদিকে তার পেটে ছেলে এসে গিয়েছিল। যখন চার মাস, তখন সুমতি সব টের পায়…'

চায়ের কাপটা ঠিক করে নামালাম টিপয়ের ওপর, 'সুমতি যখন টের পেল তখন ওই ট্রেটার সুপুরুষ, আর স্নেহের বোনটিকে গুলি করে মারতে পারল না!…'

স্ত্রী সরোদনে বললেন, 'সেটাই উচিত ছিল, কিন্তু মেয়ে তো…মেয়েদের মন তোমরা কিছুই বোঝ না…'

'অন্তত এক বয়স্কা মহিলার মন বুঝছি না, এটা ঠিক…' তিক্ত কণ্ঠে বললাম॥

রবিবাসরের আসরে

১

সন্তোষকুমার দে

প্রস্তাবনা

কলকাতায় অশ্বিনী দত্ত রোডে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে একটি আনন্দ-অনুষ্ঠান হবে। রাসবিহারী অ্যাভিনিউ কাছেই, তার অপর পারে, অল্প দূরে হিন্দুস্থান পার্কে, বাঙলার ব্রাউনিং দম্পতি কবি নরেন্দ্র দেব ও রাধারানী দেবীর বাসভবন "ভালোবাসা"। কবিদম্পতি শরৎচন্দ্রের বিশেষ অনু-রাগী, তাই তাঁরা উভয়েই শরৎচন্দ্রের আহ্বানে এসেছেন অনুষ্ঠানের উপযুক্ত আয়োজন করতে। শরৎচন্দ্রের মাতুল "বিচিত্রা" মাসিক পত্রের সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও হাজির।

শরৎচন্দ্রের বিরাট বৈঠকখানার সব আসবাবপত্র বের করে, ঘর ঝেড়েপুছে পরিষ্কার করে, সারা মেঝে জুড়ে ফরাস বিছানো হয়েছে। সভাকক্ষ সাজাবার জন্য এসেছে প্রচুর পরিমাণে ফুল—শ্বেতপদ্ম, বেল, জুঁইয়ের গোড়ে মালা, রজনীগন্ধার ঝাড় আর বর্ষার কদমফুল। বারান্দায় আর সভাকক্ষের প্রতিটি দোর-গোড়ায় বিচিত্র আলপনা আঁকা হয়েছে। প্রধান ফটকের দুই পাশে সুদৃশ্য কলাগাছ, চিত্রিত ঘট, জল ভরে সশীর্ষ ডাব দিয়ে কলাগাছের গোড়ায় সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কবিদম্পতি সতর্ক দৃষ্টিতে সযত্নে সকল সজ্জাকর্ম তদারকি করছেন।

অন্যত্র রান্নাবান্নার আয়োজন চলছে। সেখানে ঠাকুর চাকর ছুটাছুটি করছে। অন্তত শতখানেক লোক খাবে, তার উপযোগী প্রচুর উপাদেয় ভোজ্য বস্তু প্রস্তুত করবার আয়োজন হয়েছে।

এত আয়োজন কিসের জন্য? যেন শরৎচন্দ্রের বাড়িতে আজ কারো বিয়ে বা বউভাতের উৎসব। না, সেসব কিছু নয়, শরৎচন্দ্র একটি সাহিত্যসভার সদস্য, সেই সভার একটি অধিবেশন ডেকেছেন তাঁর বাড়িতে, তাই এই আয়োজন। সভাটির নাম রবিবাসর, যেখানে বাঙলা সাহিত্যের দিকপাল ব্যক্তিগণ সদস্য—শরৎচন্দ্র,

উপেন গঙ্গোপাধ্যায় এবং নরেন্দ্র দেবও সদস্য। রাধারানী দেবী সদস্য নন, কিন্তু শরৎচন্দ্র বিশেষ করে তাঁর সহায়তা চেয়েছেন আজকের সভাস্থলটি রুচিশীলভাবে পরিপাটি করে সাজিয়ে দিতে, কারণ আজ এখানে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আসবেন। রাধারানী শুধু শরৎচন্দ্রেরই স্নেহধন্যা নন, রবীন্দ্রনাথেরও তিনি পরম আদরের পাত্রী। তিনি তাই সুনিপুণভাবে আজ রবিবাসরের সভাস্থলটি সাজিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন।

সেদিন রবিবার, ৩ শ্রাবণ, ১৩৪৩ (১৯ জুলাই, ১৯৩৬), রবিবাসরের সপ্তম বর্ষের সপ্তম অধিবেশন। বিকেল বেলা দু-এক জন করে সদস্যরা আসতে শুরু করেছেন, তখন শরৎচন্দ্র তাঁর গাড়ি পাঠালেন, জোড়াসাঁকো থেকে রবীন্দ্রনাথকে আনতে। গাড়িতে গেলেন রবিবাসরের সদস্য কবি গিরিজাকুমার বসু আর শরৎচন্দ্রের এক বালিকা ভ্রাতুষ্পুত্রী। কবি এসে পৌঁছালে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে গাড়ি থেকে হাত ধরে নামালেন রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষ জলধর সেন, তাঁর পাশে শরৎচন্দ্র, নরেন্দ্র দেব এবং অন্য কতিপয় বিশিষ্ট সদস্যসহ রবিবাসরের তৎকালীন সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ বসু। কবি সহাস্যে জলধর সেনকে বললেন—এই যে, জলধরদাদা যে!

জলধর সেন ছিলেন সে সময়ে সাহিত্যিক সমাজের সার্বজনীন দাদা। বয়সে প্রবীণ, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক হিসাবেও বিশেষ খ্যাতিমান। তিনি "বঙ্গবাসী", "বসুমতী", "হিতবাদী", "সুলভ সমাচার" প্রভৃতি পত্রিকায় কাজ করবার পর ১৩২০ সালে "ভারতবর্ষ" পত্রিকার সম্পাদক হয়ে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সেই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বয়সে তিনি রবীন্দ্রনাথ থেকে যদিও প্রায় দুই বছরের বড়ো ছিলেন (তাঁর জন্ম—১লা চৈত্র, ১২৬৬) তবু রবীন্দ্রনাথ একে জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাতে তাঁর গাঁয়ের জমিদার, এজন্যও জলধর রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। সেই রবীন্দ্রনাথও তাঁকে সবার সামনে দাদা সম্বোধন করায় তাঁর গৌরব নিঃসন্দেহে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

সেদিন সভায় অতি অন্তরঙ্গ পরিবেশে এসে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে আনন্দিত হয়েছিলেন। এমনকী জলধর সেন যখন সংক্ষিপ্ত ভাষণে তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়ে বললেন, সেদিন সদস্যদের কোনো রচনা পাঠ করা হবে না, শুধু কবির ভাষণ শোনা হবে, তখনও রবীন্দ্রনাথ তাতে স্বীকৃত হলেন। শুধু সভার প্রারম্ভে সর্বাধ্যক্ষের আদেশে উপেন্দ্রনাথ একটি স্বরচিত গান শোনালেন এবং সর্বাধ্যক্ষের অনুরোধেই মুখে-মুখে একটি কাহিনীও শোনালেন যা ঘটেছিল উপেন্দ্রনাথ একবার শান্তিনিকেতনে গেলে। গল্পটিতে এমন হাসির খোরাক ছিল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যাতে কবি নিজে পর্যন্ত উচ্চস্বরে হেসে উঠেছিলেন। পরিবেশটি যে তাঁর কাছে সত্যই মনোরম হয়েছিল এতে তা সহজেই বোঝা যায়। কারণ সদস্যদের অনুরোধে কবি রবিবাসরের 'অধিনায়ক'-পদ গ্রহণেও সম্মত হলেন। আমৃত্যু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রবিবাসরের সেই সম্বন্ধ বজায় ছিল এবং তাঁর তিরোধানের পর আর কাউকে রবিবাসরের 'অধিনায়ক'-পদে বসানো হয় নি।

সদস্যদের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ সেদিন তাঁর "বলাকা" কাব্য হতে ছবি কবিতাটি ('তুমি কি কেবলি ছবি শুধু পটে লিখা') তাঁর অতুলনীয় স্বকীয় ভঙ্গিতে আবৃত্তি করেছিলেন এবং সর্বাধ্যক্ষ জলধর সেনের অভ্যর্থনার প্রত্যুত্তরে অতি অন্তরঙ্গভাবে নিজের কথা কিছু বলেছিলেন। রবিবাসরে রবীন্দ্রনাথ যেসব ভাষণ দিয়েছেন তার সঙ্গে এটিও আমার "রবিবাসরে রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থেথানিতে (প্রকাশকাল রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী—১৩৬৮) সংকলিত আছে।

এই রবিবাসর সভাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৩৩৬ সালে (১৯২৯), তাই ১৩৯৬ সালে তার হীরকজয়ন্তী-বর্ষ হতে চলেছে। ইতিপূর্বে ১৩৬১ সালে রজতজয়ন্তী এবং ১৩৮৬ সালে সুবর্ণজয়ন্তী যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়েছে। সেসব অধিবেশনের বিবরণ যথাস্থানে বলা যাবে।

আমার সৌভাগ্য হয়েছিল মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে

রবিবাসরের সংস্পর্শে আসবার। সেটা ১৩৪৬ সালের কথা। ছাত্রজীবনেই "ভারতবর্ষ", "বিচিত্রা" প্রভৃতি পত্রিকায় লিখতাম, তখনও কলকাতায় আসি নি। কলকাতায় আসবার পর "ভারতবর্ষ" পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নরেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। ঘটনাক্রমে নরেন্দ্রনাথ এবং আমি একই বৃহৎ বাড়ির (৪৫ আমহার্স্ট স্ট্রীট) দুই পৃথক অংশে বাস করতাম, তাই পরস্পর পরিচিত ছিলাম। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ আমার সাহিত্যিক পরিচয় কিছুই জানতেন না, আমিও গায়ে পড়ে তাঁকে কিছু বলতে সঙ্কোচ বোধ করতাম। ফণীন্দ্রনাথ সেই সঙ্কোচ ভেঙে দিয়ে আমাকে নরেন্দ্রনাথের সহকারী করে ছাড়লেন। সেই থেকে রবিবাসরের পুণ্য সংস্পর্শ হতে আর বিচ্ছিন্ন হই নি। মাঝে-মাঝে বিদেশে গেলেও ফিরে এসে আবার রবিবাসরের কর্মভার গ্রহণ করেছি। দেখতে-দেখতে রবিবাসরের সঙ্গে যোগাযোগ অর্ধশতাব্দীব্যাপী হতে চলেছে। এই বিশিষ্ট সাহিত্যপ্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত থাকায় একদিকে যেমন বাঙলা সাহিত্যের দিক্‌পাল ব্যক্তিদের সান্নিধ্যলাভে ধন্য হয়েছি, তেমনি রবিবাসরের বহু স্মরণীয় অধিবেশনে উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য হয়েছে। আজ জীবন-সায়াহ্নে "চতুরঙ্গ"-সম্পাদকের আহ্বানে রবিবাসরের বিষয়ে লিখতে বসে বিমূঢ় বোধ করছি। প্রস্তাবনা শেষ করবার আগে রবিবাসরের সদস্য অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কটি কথা উদ্ধার করি :

> রবিবাসরের কথা যে ভাবে, যে লেখে, যে শোনে সে-ই পুণ্যবান। রবিবাসরের কথা ভাবতে গেলে মনে হয় যেন প্রকাণ্ড ফাঁকা মাঠের একপ্রান্তে একটিই মাত্র ডালপালা-মেলা ঘনপত্র গাছ নীরবে দাঁড়িয়ে আছে, আর তারই ধার ঘেঁসে বয়ে চলেছে একটি স্বাদুসলিলা স্বচ্ছ নদী। জায়গাটি যেন অনেক স্নিগ্ধতা ও হৃদ্যতা দিয়ে তৈরী। নদীটি যেন কোন্ অতীত স্মৃতির আশীর্বাদ দিয়ে ভরা। মনে হয় সমস্ত মাঠের শূন্যতার দাহ পেরিয়ে এখানে এসে বসলে শুধু শান্তি পাব তা নয়, কৃততীর্থ হয়ে যাব।
>
> —রবিবাসরের স্মৃতি, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
> রবিবাসর (বার্ষিকী)-১, (১৯৬৮), পৃ ২১৭

২

সূচনা

পত্র-পত্রিকার অফিসে স্বভাবতই সাহিত্যিকদের সমাগম ঘটে থাকে, বিশেষ করে সেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ যদি মজলিসি মানুষ হন তবে তো সোনায় সোহাগা, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ "ভারতী"র আড্ডা। সেখানকার আকর্ষণ এত দুর্বার ছিল যে একবার গেলে বার-বার যেতে হত। "রবিবাসর" সাহিত্যসভাটির পত্তনও হয়েছিল প্রথমে একটি নামকরা মাসিকপত্রের দপ্তরকে অবলম্বন করে। পত্রিকাটির নাম "মানসী ও মর্মবাণী"। যে সময়ে এই পত্রিকার সূতিকাগারে রবিবাসরের জন্ম হয় তখন তার অফিস ছিল কলকাতার ২৩-বি বেথুন রো বাড়িটিতে। এই বাড়িটি রবিবাসরের অন্যতম প্রবীণ সদস্য শ্রদ্ধেয় চপলাকান্ত ভট্টাচার্যের বাড়ির কাছে। তিনি যাতায়াতের পথে দেখতেন "মানসী ও মর্মবাণী" দপ্তরে কর্মাধ্যক্ষ সুবোধচন্দ্র দত্তের কাছে নবীন প্রবীণ সবশ্রেণীর সাহিত্যিকদের সমাবেশ ঘটত এবং প্রায়ই তিনি তাঁদের চা-জলপানে পরিতৃষ্ট করতেন। এখানে যাতায়াতের সময় এবং "ফরোয়ার্ড" পত্রিকায় কার্যকালে চপলাবাবুর সঙ্গে বিশেষ হৃদ্যতা হয় হাওড়ার নীলমণি চট্টোপাধ্যায়ের। তিনি ছিলেন রবিবাসরের প্রথম সম্পাদক—যাঁর প্রযত্নে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছিল বলা চলে, তাই তাঁর পরিচয় একটু বিশদভাবে দিতে চাই।

নীলমণিবাবুর জন্ম হয়েছিল ৩১ জুলাই, ১৮৯৭। হাওড়া শহরের বিশিষ্ট ডাক্তার অধরনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর পিতা। তাঁর হাওড়ার বাড়ির ঠিকানা ছিল ১১ ধর্মতলা লেন, খুরুট, হাওড়া-১। ডাক্তার চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে তখনকার সকল জননেতাদের

যাতায়াত ছিল, এমন-কী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশও অসহযোগ আন্দোলনের সময় একদিন ডাক্তার চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে গিয়েছিলেন। নীলমণি সেনট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেছিলেন। তা ছাড়া তিনি সংস্কৃত, হিন্দি, উর্দু এবং জর্মান ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পিতৃদেব নেপাল মহারাজের প্রধান চিকিৎসক থাকাকালীন নীলমণিও নেপালে ছিলেন, নেপালি ভাষাও তিনি ভালোভাবে জানতেন। এই সুশিক্ষিত তরুণটির সঙ্গে আলাপ করে দেশবন্ধু তাঁকে তাঁর "ফরোয়ার্ড" পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করেন, পরে নীলমণি শরৎচন্দ্র বসুর "নেশন" পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি Indian Journalists' Association-এর সদস্য ছিলেন।

সাংবাদিক জীবনে চপলাকান্ত ভট্টাচার্যও "ফরোয়ার্ড" পত্রিকায় প্রথম কাজ শুরু করেন। সেখানে বার্তাসম্পাদক ছিলেন অনিল রায়। চপলাকান্ত ছিলেন তাঁর সহকারী। অনিল রায়ের সঙ্গে সহকর্মী নীলমণি চট্টোপাধ্যায় ও "মানসী ও মর্মবাণী"র সুবোধ দত্তর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। বয়ঃকনিষ্ঠ চপলাকান্তকে এঁরা সকলেই বিশেষ স্নেহ করতেন। বিশেষ করে নীলমণিবাবু তাঁকে পারিবারিক বন্ধু হিসাবে নিয়মিত-ভাবে নিজেদের বাড়ির সকল উৎসব-অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাতেন।

নীলমণিবাবু সুলেখক ছিলেন। সাংবাদিকতার কাজ দীর্ঘদিন না করে তিনি "প্রবাসী", "ভারতবর্ষ", "আনন্দবাজার পত্রিকা", "অমৃতবাজার পত্রিকা" প্রভৃতিতে নিয়মিত লিখতেন ও "পরিকথা" নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। তা ছাড়া তিনি খুব ভালো ইংরাজি লিখতেন বলে অনেক মৌলিক ইংরাজি ছোটোগল্প এবং অনেক বাঙলা গল্পের ইংরাজি অনুবাদ করেছিলেন।

নীলমণিবাবুর সাহিত্য-অনুরাগের আর-একটি দিক ছিল। তাঁদের পারিবারিক প্রকাশন সংস্থা "চট্টো অ্যানড চট্টো" কোমপানির (Chatto & Chatto) অংশীদার হিসাবে কাজ করতে-করতে তিনি ক্লাইভ স্ট্রীটে অফিস করে Literary Guild of India নামক একটি উৎকৃষ্ট বিলাতি পুস্তক আমদানির কারবার প্রতিষ্ঠা করেন। এই কোম্পানি বাছাইকরা দামি-দামি বিলাতি বই এনে গিল্ড্-এর সদস্যদের কাছে মাসিক কিস্তিতে সরবরাহ করতেন। তিনি Literary Guild of India হতে ইংরাজি ভাষায় আগাগোড়া পুরু বিলাতি প্রভন আর্ট পেপার ব্যবহার করে যে মূল্যবান ক্যাটালগ ছাপাতেন তার একখানি নমুনা তাঁর দেওঘরের বাড়ি হতে উদ্ধার করে দেখে মুগ্ধ হয়েছি। সে ক্যাটালগ সদস্যদের বিনামূল্যে দিতেন, তাতে প্রচুর বাছাই ইংরাজি বইয়ের বিবরণ সহ বিদেশী লেখকদের চমৎকার পাতাজোড়া ছবি থাকত। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা যে খণ্ডটি আমি পেয়েছি তাতেই আছে পিথাগোরাস, ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে নোবেলপুরস্কারবিজয়ী সিগরিড আনড্সেট, ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল-বিজয়ী লুইগি পিরানদেল্লোর ছবি।

ব্যবসায় বৃদ্ধির সঙ্গে তিনি ইনডিয়ান মিরর স্ট্রীটে টেম্পল প্রিনটিঙ ওঅর্কস নামে ছাপাখানা এবং ট্রেড সারভিস ব্যুরো নামে আরও দুটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

এই সাহিত্যানুরাগী, কর্মবীর মানুষটি ১৯৫১ সালে মাত্র ৫৪ বৎসর বয়সে কর্মজীবন হতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে হাওড়ার বিরাট বসতবাড়ি ছেড়ে চলে যান দেওঘরে। সেখানে রাজনারায়ণ বসুর স্মৃতিপূত একটি বাড়ি ক্রয় করে পিতার নামে বাড়ির নাম রাখেন "অধরায়তন"। এই ঐতিহাসিক বাড়িতে শ্রীঅরবিন্দ বারীন্দ্রনাথ-সহ কৈশোরে মাতামহ রাজনারায়ণ বসুর কাছে এসেছেন। সে সময় ওই অঞ্চল এখনকার মতো ঘনবসতিপূর্ণ ছিল না। দেওঘরের এই বাড়িতেই ২৭ ডিসেমবর ১৯৮০ তারিখে নীলমণিবাবুর দেহাবসান হয়।

আমার পরম সান্ত্বনা আমি তাঁর জীবৎকালে

তাঁর বিষয়ে "আনন্দবাজার পত্রিকা"য় লিখেছিলাম এবং তিনি যে রবিবাসরের প্রথম সম্পাদক ছিলেন রবিবাসরের সুবর্ণজয়ন্তীতে সদস্যগণ শ্রদ্ধার সঙ্গে সে-কথা স্মরণ করেছেন, এ সংবাদ শুনে তিনি আনন্দে অভিভূত হয়ে অনুজতুল্য চপলাকান্তকে চিঠি পাঠিয়ে-ছিলেন। চপলাবাবু সেই চিঠি আমায় দেন এবং রবিবাসরের পুরাতন কথা বিস্তারিত ভাবে বলেন। মৃত্যুকালে নীলমণিবাবুর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

"মানসী ও মর্মবাণী" অফিসের মজলিসেই এক সময় কথা ওঠে এই আড্ডাটিকে একটি সাহিত্যসভা হিসাবে গঠিত করা হোক। সে-কাজে নীলমণিবাবু বিশেষ উৎসাহিত হন এবং ১৩৩৬ সালের কার্তিক মাসে আশুতোষ মুখুজ্জে রোডে একটি পরামর্শসভা বসে। তাতে উপস্থিত ছিলেন—রায় জলধর সেন বাহাদুর, পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ডাঃ শশীকুমার সেনগুপ্ত, কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ সতীশচন্দ্র মিত্র, সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র মিত্র, কবি শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, হরিপদ গুহ এবং নীলমণি চট্টোপাধ্যায়। [দ্র. "জলধর সেন" (প্রবন্ধ) : ঐতিহাসিক সুধীর-কুমার মিত্র—২য় খণ্ড, পৃ ৭৭]

এই সভায় "মানসী" - সম্পাদক সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি এবং নীলমণি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক-সহ কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে একটি কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়। সভার নাম রাখা হয়—'রবিবাসর', যা কেবল রবিবারেই কোনো সদস্যদের গৃহে অনুষ্ঠিত হবে।

রবিবাসরের প্রথম চিঠির কাগজ ইংরাজিতে ছাপা হয়েছিল। সভাটির পরিচয়ে বলা হয়েছিল—A Rotary Club of the Literateurs, ঠিকানা —২৩-বি বেথুন রো, কলকাতা।

সুবোধচন্দ্র দত্তের আহ্বানে তাঁর বাসভবন ৫ আশুতোষ মুখুজ্জে রোডে রবিবাসরের প্রথম অধিবেশন হয়—৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ (২৪ নভেমবর, ১৯২৯)। সভাপতি সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ওই বৎসর কলকাতা এবং হাওড়ায় কয়েকটি অধিবেশন হয়। বৎসরের শেষ অধিবেশনে ২৬ অকটোবর ১৯৩০ তারিখে পরের বৎসরের জন্য জলধর সেন সভাপতি নির্বাচিত হন। মনে হয়, তখন প্রতি বৎসর সভাপতি নির্বাচন হবার কথা হয়েছিল, পরে সে প্রথা পরিত্যক্ত হয়।

১৫ শ্রাবণ ১৩৩৭ তারিখে প্রকাশিত রবিবাসরের প্রথম বর্ষের সদস্যতালিকার কয়েকখানি অতি-দুষ্প্রাপ্য পুস্তিকা নীলমণিবাবুর দেওঘরের গৃহে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। তা থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করছি। পুস্তিকাখানি প্রবাসী প্রেস ১২০/২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা হতে সজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত। এতে সদস্যগণের তালিকায় ৪০ জনের নাম আছে, অর্থাৎ প্রথম বৎসরে নির্ধারিত ৫০ জন সদস্যসংখ্যা তখনও পূর্ব হয় নি। সেই তালিকাতে ছিলেন :

জলধর সেন, সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্র-কৃষ্ণ লাহা, ফণীন্দ্রনাথ পাল, সতীশচন্দ্র মিত্র, ব্রজেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলমণি চট্টোপাধ্যায়, হরিপদ গুহ, সরোজকুমার মিত্র, শশীকুমার সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র দত্ত, মন্মথনাথ ঘোষ, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিজাকুমার বসু, চারুচন্দ্র মিত্র, নরেন্দ্র দেব, প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ বসু, সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, শচীন্দ্রনাথ মৈত্র, মহারাজকুমার ধীরেন্দ্র-নারায়ণ রায়, নলিনীকান্ত সরকার, হেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, তারকনাথ রায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রফুল্লকুমার সরকার, রাজশেখর বসু, গিরীন্দ্রশেখর বসু, সুহৃৎকুমার মিত্র, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, বগলারঞ্জন ভট্টাচার্য, হরগোবিন্দ সেন, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, প্রমথনাথ বসু এবং গোপাল

হালদার।

এঁদের কয়েক জনকে নিয়ে একটি কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়েছিল।

তালিকায় উল্লেখিত জলধর সেন "ভারতবর্ষ"-সম্পাদক, কবি শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা "প্রবাসী"-র সহকারী সম্পাদক, ফণীন্দ্রনাথ পাল "যমুনা" পত্রিকার সম্পাদক, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐতিহাসিক, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বহুভাষাবিদ পণ্ডিত, মন্মথনাথ ঘোষ জীবনীকার, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিজাকুমার বসু, নরেন্দ্র দেব কবি, লালগোলার মহারাজকুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় শিকারকাহিনীর লেখক, প্রফুল্লকুমার সরকার "আনন্দবাজারপত্রিকা"র সম্পাদক, রাজশেখর বসু রসসাহিত্যিক ("পরশুরাম") এবং গিরীন্দ্রশেখর বসু বৈজ্ঞানিক ও মনস্তত্ত্ববিদ, নলিনীকান্ত সরকার গায়ক, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় দার্শনিক, নীরদচন্দ্র চৌধুরী বর্তমানে অকসফোর্ড-নিবাসী আন্তর্জাতিকখ্যাতিসম্পন্ন ইংরাজি সাহিত্যের লেখক এবং গোপাল হালদার প্রমুখ চিন্তানায়ক মনীষীদের আমি চিনবার সুযোগ পেয়েছি আর নরেন্দ্রনাথ বসুই ছিলেন রবিবাসরের পরবর্তী জীবনে প্রাণপুরুষ, যাঁর সহকারী হিসাবে কাজ করবার সুযোগ পেয়ে বয়স অল্প থাকলেও রবিবাসরের অনেক অধিবেশনে আমার যাওয়া সম্ভব হত।

৩

কার্যকরী সমিতির অনেক কড়া নিয়ম করা হয়েছিল। কিন্তু 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া' বলে একটি প্রবাদ আছে। রবিবাসরের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র চারটি সভা হয় এবং নানা গোলযোগে কার্যসমিতি লোপ পায়। ১৪ ডিসেম্বর ১৯৩০ তারিখে এক সভায় জলধর সেনকেই সর্বাধ্যক্ষ উপাধিতে ভূষিত করে তাঁর উপরেই সকল কাজের ভার দেওয়া হয়। দেখা গেল, সার্বজনীন দাদার প্রভাবে অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়েছে। নীলমণিবাবুর স্থানে দ্বিতীয় বৎসরে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক হলেন, পরের বৎসর অর্থাৎ তৃতীয় বর্ষে তাঁরই সহকর্মী শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা সম্পাদক হলেন।

চতুর্থ বর্ষেও অধিবেশনের সংখ্যা বেশি হয় নি। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে মাত্র তিনটি অধিবেশনের পর রবিবাসর কিছু দিন বন্ধ থাকে। পঞ্চম বর্ষে ১৩৪১ সালের ২রা বৈশাখ জলধর সেনের বিশেষ আবেদনে ঐতিহাসিক মন্মথনাথ ঘোষের শ্যামবাজার ট্রামডিপোর পিছনের বাড়িতে রবিবাসরের একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। সেই সভায় জলধর বলেন, বার্ধক্যহেতু তিনি সভার ভার বহন করতে অক্ষম, সদস্যদের মধ্য হতে কেউ সে দায়িত্ব গ্রহণ করুন। সেই সভায় নতুন সম্পাদক হলেন নরেন্দ্রনাথ বসু। তিনি একটি শর্তে এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হলেন যে জলধর সেন সভার সর্বাধ্যক্ষপদে স্থায়িভাবে থাকবেন। তাঁর উপদেশমত সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ বসু সকল কাজ সমাধা করবেন। রবিবাসরের পঞ্চম বর্ষটি নানা কারণে স্মরণীয়। এই বৎসরেই শরৎচন্দ্র রবিবাসরের সদস্য হন। তার আগে এসেছেন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। "প্রবাসী" "মডার্ন রিভিউ" ও "বিশাল ভারত" তিনটি বিখ্যাত মাসিক পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও সদস্য হন। রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে রবিবাসর আহ্বান করেন (৩০ ফাল্গুন, ১৩৪৩) সে অধিবেশনে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যোগ দিয়েছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ বসুর সময় থেকেই রবিবাসরের ক্রমোন্নতি লক্ষিত হয়, তার কারণ নরেন্দ্রনাথের নিষ্ঠা, কর্মকুশলতা এবং তৎকালীন আর্থিক সামর্থ্যের সঙ্গে যোগ হয়েছিল জলধরের দলমতনির্বিশেষে সকল শ্রেণীর সাহিত্যিকদের মধ্যে অগাধ জনপ্রিয়তা।

নরেনবাবুর কাছে শুনেছি, পার্শিবাগানে রাজশেখর বাবুদের পৈতৃক বাড়িতে তখন উৎকেন্দ্র সমিতি নামে একটি সাহিত্যিক আড্ডা ছিল। সেখানেও জলধরের

যাতায়াত ছিল। রাজশেখর বসু তখন বেঙ্গল কেমিক্যালের বড়োকর্তা, সপরিবারে বেঙ্গল কেমিক্যালের মানিকতলার কারখানার কোয়ার্টারেথাকতেন, তবে প্রতি রবিবারে পার্শিবাগানে এসে অন্যান্য আড্ডাধারীদের সঙ্গে মিলিত হতেন। তেমন একটি সভায় রাজশেখর তাঁর প্রথম রসরচনা "শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড" যখন পাঠ করেন সেখানে জলধর উপস্থিত ছিলেন। পাঠ শেষ হলে তিনি লেখাটি পকেটস্থ করেন। রাজশেখরের আবাল্য বন্ধু চিত্রশিল্পী যতীন সেনগুপ্তর অতুলনীয় রেখাচিত্রসহ সেই গল্প "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিস্মিত পুলকিত হন, এমন-কী রাজশেখরের বিষয়ে তাঁর "বস্" আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে চিঠি দেন। মোট কথা—জলধর সেনের অনুরোধে উৎকেন্দ্র সমিতির প্রায় সকল সদস্য একযোগে রবিবাসরে যোগ দেন, তার মধ্যে রাজশেখর, গিরীন্দ্রশেখর দুই ভাই, দুই নরেন (নরেন্দ্র দেব ও নরেন্দ্র বসু), শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখও ছিলেন। শরৎচন্দ্রকেও জলধরই রবিবাসরে এনেছিলেন। রবিবাসরের সকল সদস্যই জলধরের চরিত্রগুণে মুগ্ধ ছিলেন এবং যতদিন জলধর বেঁচেছিলেন (মৃত্যু—২৬ চৈত্র, ১৩৪৫) রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে সকলেই আন্তরিক ভাবে তাঁকেই রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষরূপে চাইতেন। রবিবাসরে তাঁর ৭৮ বৎসরের জন্মদিনে কবি সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র যে কবিতাটি পাঠ করেছিলেন সেটি এখানে তুলে দিচ্ছি—তাতে কী দৃষ্টিতে সদস্যরা তাঁকে দেখতেন তা বেশ বোঝা যাবে—

বয়োবৃদ্ধের অন্ত নাহিক ভবে,
দাদা তারা নয় সবে।
সরল প্রাণের সুমধুর রসায়নে
না জানি কি জাদু উপজয় দরশনে,
সেই গুণে তুমি সকলের বরণীয়
অজাত-বৈরী সুহৃদোত্তম প্রিয়,
সবাকার সুরে প্রাণটি তোমার বাঁধা,
—সার্বজনীন দাদা।

শত্রুর দলের সুশাসক অধিকারী,
বর্মাসিগারধারী।
আইন-কানুন তোমার মুখের বাণী,
বিধিনিষেধের আর কিছু নাহি জানি।
ইচ্ছা তোমার এষণা যে আমাদের
সহজিয়া রীতি, নাহি কোন হেরফের।
পরান তোমার যেন দুধে ধোয়া, সাদা
তাই এঞ্জমালি দাদা।
আটাত্তরের চৌকাঠে আজি এলে,
ওই দুটি বাহু মেলে
ডাকিলে মোদের তোমার দেহলী 'পরে,
পঞ্চাশী দল ছুটে আসে তব ঘরে।
পয়লা চৈত্রে একি মৈত্রের মেলা,
শ্রদ্ধা-পরাগে অভিনব হোরিখেলা!
চরণে তোমার বাঙলার ধূলিকাদা
শিরে তুলি দাও দাদা।

(চিত্রা, চৈত্র, ১৩৪৩)

এই জলধর সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লেখেন—

ভাবতে অবাক লাগে, কোন একদিন স্বপ্নময় অতীতে আমাদের তিরিশ-গিরিশের বাড়িতে রবিবাসরের আসর বসেছিল। স্বয়ং তীর্থপতি জলধরদা উপস্থিত ছিলেন—শস্য ফলাতে পারে অথচ আপাত-উষর কোন্ মাঠের উপর সেই মেঘ না স্নেহবর্ষণ করেছে—আর তাঁকে ঘিরে আমরা সেকালের অতি আধুনিকরা বসেছিলাম আপনজনের মত—প্রেমেন, প্রবোধ, মনোজ, ভবানী* আর হেম বাগচী।

—রবিবাসরের স্মৃতি, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
রবিবাসর (১ম খণ্ড), পৃ ২১৭

জলধর সেন ৭৯ বৎসর বয়সে ২৬ চৈত্র ১৩৪৫ তারিখে কলকাতায় পরলোক গমন করেন। তাঁর স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ পুরী থেকে যে চমৎকার কবিতাটি লিখে পাঠিয়েছিলেন তাও এই প্রসঙ্গে অবশ্য স্মরণীয়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ যে দীর্ঘ কবিতাটি রচনা করেন এটি তত দীর্ঘ নয়, বরং এটি পড়লে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ

* প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল, মনোজ বসু এবং ভবানী মুখোপাধ্যায়।

যে অতুলনীয় দ্বিপদীটি লিখেছিলেন—

এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।

সেটিই বেশি মনে পড়ে। তবে রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষের স্মৃতিতে রবিবাসরের অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার্ঘ্য মাত্র না হয়ে এটি হয়ে উঠেছে বিশ্বকবির হাত দিয়ে সমগ্র বাঙালি জাতির শ্রদ্ধার্ঘ্য—তাই জলধর-জীবনী প্রসঙ্গেও এটি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে—রবিবাসর প্রসঙ্গে তো বটেই। কবিতাটি এই—

জলধর

বাঙালীর প্রীতি-অর্ঘ্যে তব দীর্ঘ জীবনের তরী
স্নিগ্ধ শ্রদ্ধাসুধারস নিঃশেষে লয়েছে পূর্ণ করি।
আজি সংসারের পারে দিনান্তের অস্তাচল হতে
প্রশান্ত তোমার স্মৃতি উদ্ভাসিত অন্তিম আলোতে॥

পুরী, ২৬।৪।৩৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

রবিবাসরের সদস্যরা তো বটেই, যাঁরা সদস্য না হয়েও রবিবাসরের সংস্পর্শে এসেছেন—তাঁদেরও অনেকে রবিবাসর বিষয়ে স্মৃতিচারণ করেছেন। রবিবাসরের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধনের দিন (৮ই বৈশাখ ১৩৮৬) ঐতিহাসিক সুধীরকুমার মিত্রের আহুত রবিবাসরে আমি তেমন কিছু গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছিলাম যাতে রবিবাসর-প্রসঙ্গ উল্লিখিত আছে। গত দশ বৎসরে সেই তালিকায় আরও কিছু গ্রন্থের নাম সংযুক্ত হওয়া সম্ভব। তবে সেদিন সভাশেষে যিনি ৫০টি প্রদীপ জ্বালিয়ে সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করেছিলেন, সেই ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় আমায় ডেকে ঐ গ্রন্থগুলির নাম উল্লেখ করবার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ড. রায় নিজেও একসময়ে রবিবাসরের সদস্য ছিলেন।

যে যে গ্রন্থে রবিবাসরের বিষয় আলোচনা আছে বলে জানি এখানে তা উল্লেখ করি—

১-২০। রবিবাসর (বার্ষিক সংকলন—এ পর্যন্ত ২০ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে)। ২১। রবিবাসরে রবীন্দ্রনাথ—সন্তোষকুমার দে। ২২। জলধর সেনের আত্মজীবনী—সম্পাদনা: নরেন্দ্রনাথ বসু। ২৩। জলধর-কথা—সম্পাদনা: ব্রজেন্দ্রনাথ দাস। ২৪। শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য—রাধারানী দেবী। ২৫। বনস্পতির বৈঠক—প্রবোধকুমার সান্যাল। ২৬। ভারতের শিল্প ও আমার কথা—অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। ২৭। এ নিঃস্ব জীবনে—ড. হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। ২৮। বিগত দিন—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ২৯। আত্মজীবনী—ভবানী মুখোপাধ্যায়। ৩০। আমার শিল্পীজীবনের কথা—আব্বাসউদ্দিন আহমদ (ঢাকা)। ৩১। জীবনদীর বাঁকে বাঁকে—যোগেশচন্দ্র বাগল। ৩২। তৃণখণ্ড—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩৩। একজন আর কয়েকজন—অনিলকুমার ভট্টাচার্য। ৩৪। রবীন্দ্র-আশীর্বাদ-ঝর্ণাধারায় নিত্য স্নাত—দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা। ৩৫। শরৎ শতবার্ষিকী গ্রন্থ—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। ৩৬। হুগলী জেলার ইতিহাস (১ম খণ্ড)—সুধীরকুমার মিত্র। ৩৭। নতুন তথ্যে শরৎচন্দ্র—গোপালচন্দ্র রায়। ৩৮। মর্জিমহল—বনফুল। ৩৯। অমর স্মৃতি—ড. সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়। ৪০। স্মৃতিবিচিত্রা—অজিতকৃষ্ণ বসু (অকূর)।

—('আলোচনা' মাসিক পত্রে ধারাবাহিক প্রকাশিত)

এ বাদে রবিবাসর বিষয়ে প্রবন্ধ আর কবিতা এবং কতিপয় গান যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন রবীন্দ্রনাথ, জলধর সেন, ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ভবানী মুখোপাধ্যায়, নীরদচন্দ্র চৌধুরী (অকসফোর্ড), প্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক মোহনলাল মিত্র, অমলকৃষ্ণ গুপ্ত, যোগেশচন্দ্র বাগল, কুমারেশ ঘোষ, প্রভাতকুমার হালদার, প্রাণতোষ ঘটক, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অখিল নিয়োগী, সন্তোষকুমার দে, ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ভাস্কর, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, বেলাদেবী, মনোমোহন ঘোষ (চিত্রগুপ্ত), সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়, সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও ব্রজমোহন দাস প্রমুখ।

রবিবাসরের পরিচয় দিতে গিয়ে "বিচিত্রা"-সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন—'আমাদের রবিবাসর শিল্পী ও সাহিত্যিকগণের মিলনসভা। সাহিত্য ঠিক এর লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ। পনেরো দিন অন্তর সদস্যদের মিলিত হওয়াই এর প্রধান উদ্দেশ্য। এর সদস্য-সংখ্যা পঞ্চাশ অতিক্রম করতে পারে না।* এই সংখ্যা সর্বদা পূর্ণ তো থাকেই, অধিকন্তু সদস্যপ্রার্থী-রূপে পাঁচ-সাত ব্যক্তি সততই প্রতীক্ষা-তালিকায় অবস্থান করেন। কোনো সদস্যের মৃত্যু অথবা সদস্যপদত্যাগ ভিন্ন কারও পক্ষে রবিবাসরে প্রবেশ করবার উপায় নেই।

'রবিবাসরের নিজস্ব কোনও আস্তানা নেই। পঞ্চাশ জন সদস্য এবং তদুপরি আহ্বায়ক কর্তৃক নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ নিয়ে এত বৃহৎ এক অনুষ্ঠান, কিন্তু এর অধিষ্ঠানের জন্যে এক পয়সা ভাড়া দিতে হয় না। বিদেহী আত্মার মতো নিরাশ্রয় নিরবলম্ব হয়ে তেরো দিন এই প্রতিষ্ঠান যেন বায়ুভূত হয়েই গোপনে অবস্থান করে, তারপর চতুর্দশ দিনে আহ্বানকারীর গৃহে উড়ে এসে জুড়ে বসে। তখন এর উৎসবময় সুপুষ্ট মূর্তি দেখে কে বলবে যে এর দেহ নেই। এইভাবে রবিবাসর পর্যায়ক্রমে এক সদস্যের গৃহ থেকে অপর সদস্যের গৃহে পরিক্রমণ করে বেড়ায়।'

—বিগত দিন, প্রথম খণ্ড, পৃ ৬১

আর ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—'রবিবাসর নামটির মধ্যেই একটি প্রশস্ত অবসরের স্নিগ্ধ গুঞ্জন, একটি আরাম ও মুক্তির উদার ব্যঞ্জনা নিহিত আছে। স্বতঃই মনে হয় যেন এই মিলনকেন্দ্রটি আমাদের মনকে আধুনিক যুগের উত্তপ্ত পরিবেশ থেকে নিয়ে গিয়ে উহার প্রতি একটি নিভৃত আশ্রয়ের আমন্ত্রণ প্রসারিত করেছে। এই প্রতিষ্ঠানের বৈঠকী মজলিসটি যেন অতীত এবং অধুনা অপ্রাপ্য ফরাস-বিছানা-বালিসের এলায়িত আলিঙ্গনকে আমাদের দেহমনের তৃপ্তির জন্য বিছিয়ে রেখেছে। হয়ত বাসরের মদির নিবিড়তা এর মধ্যে নাই। কিন্তু আসরের নিশ্চিন্ততা বহু পরিমাণেই আছে। দাম্পত্য প্রণয়ের তপ্ত ইক্ষুচর্বণের পরিবর্তে আছে সৌহার্দ্যের অনাবিল প্রীতি, দারুণ গ্রীষ্মে ডাবের জলের সুশীতল আতিথেয়তা। পীরিতি-সাগরের দুঃখবায়ু-বীজিত, অশ্রুস্তি-কণ্টকিত জোয়ার-ভাটার বদলে আছে সমপ্রাণতার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। বাসরকক্ষের চারিদিকে যে একটি আনন্দিত পরিবারপরিবেশের বিস্তীর্ণ বহিরঙ্গ প্রসারিত থাকে, দাম্পত্য মিলনের কেন্দ্রোৎক্ষিপ্ত যে একটি উল্লাসবৃত্ত নিজ পরিধির সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিল্লোলকে একটি বিন্দুতে সংহত করে, আমাদের রবিবাসর সেই মিলনমুখর মহাসঙ্গমের একটি শাখানদী। যেখানে পরম দ্বৈতের অদ্বৈত ভাব সিন্ধুরূপে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে যে বহু হতে একের দ্বিত্বের মাধ্যমে পরিণতি, রবিবাসর সেই লীলাপরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। সে বাসর না হলেও বাসরের পুষ্পসুরভিত হাওয়ায় অভিস্নাত।'

রবিবাসরের বার্ষিক সংকলনগ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম প্রবন্ধ "আমাদের রবিবাসর" লিখেছিলেন ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন তিনিই ছিলেন রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষ। বার্ষিক সংকলনটির সম্পাদক হিসাবে আমার উপর সকল দায়িত্ব ন্যস্ত করে তিনি বলেছিলেন, 'রবিবাসরের ঐতিহ্য যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সম্পাদনা কোরো।' তারপর সেই বার্ষিক সংকলনের কুড়িটি খণ্ড এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। তাতেই বিধৃত আছে রবিবাসরের ধারাবাহিক ইতিহাস।

রবিবাসরের প্রতিষ্ঠাকালে ১৩৩৬ সালে সভাপতি ছিলেন সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয় বর্ষেই সভাপতিপদে নির্বাচিত হন জলধর সেন। তারপর যখন তাঁকে রবিবাসর পরিচালনার সকল দায়িত্ব দেওয়া হয় তখনই সভাপতি-পদের নামকরণ করা হয়—'সর্বাধ্যক্ষ'। রবীন্দ্রনাথ যখন রবিবাসরে যোগ

* কবি কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত সর্বাধ্যক্ষ থাকার সময় এই সংখ্যা বাড়িয়ে ৫২ করা হয়।

দেন তখন তিনি হন "অধিনায়ক"—তবে রবিবাসরের সকল দায়িত্ব সর্বাধ্যক্ষের উপরেই ন্যস্ত থাকে। জলধর সেন আমৃত্যু সেই দায়িত্ব পালন করে গেছেন। ১৩৩৭ থেকে ১৩৪৫ সাল পর্যন্ত জলধর রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সর্বসম্মতিক্রমে প্রফুল্লকুমার সরকারকে সর্বাধ্যক্ষ করা স্থির হয়। সেই শুভ সংবাদ ভারতবর্ষ-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যখন "আনন্দবাজার পত্রিকা"র বর্মণ স্ট্রীটের অফিসে প্রফুল্লবাবুকে জানাতে যান তিনি শুনে আপত্তি জানান, বলেন—যে সভায় তাঁর শিক্ষাগুরু অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র রয়েছেন সেখানে প্রফুল্লবাবু কিছুতেই সর্বাধ্যক্ষের আসনে বসবেন না।

প্রফুল্লবাবুর ঐকান্তিক অনুরোধে সদস্যগণ তখন অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্রকে রবিবাসরের দ্বিতীয় সর্বাধ্যক্ষপদে নির্বাচন করেন। খগেন্দ্রনাথ এই পদে তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৩৪৫ থেকে ১৩৬৮ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২৩ বৎসর তিনি বিশেষ যত্নের সঙ্গে রবিবাসর পরিচালনা করেন। সে সময় নরেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদক ছিলেন।

প্রফুল্লকুমার সরকারের মত আরও কয়েকজন সদস্য অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্রের ছাত্র ছিলেন। রায়-বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র পূর্ববর্তী সর্বাধ্যক্ষ রায় জলধর সেন বাহাদুরের মত কেবল আর-একজন রায়বাহাদুরই ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শনশাস্ত্রের এক স্বনামধন্য সর্বজনশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক। পরে সরকারি চাকুরি হতে অবসর গ্রহণ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হন এবং আশ্চর্য দক্ষতায় দর্শনশাস্ত্র হতে বাঙলা সাহিত্যে অধ্যাপনাতেও নিজ স্বকীয়তায় প্রখ্যাত হন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও খগেন্দ্রনাথের ছাত্র ছিলেন এবং খগেন্দ্রনাথকে তিনি আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করতেন। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের সময় খগেন্দ্রনাথই রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন, ফলে রবীন্দ্রতিরোধানের বর্ষপূর্তিতে রবি-বাসরের রবীন্দ্রস্মরণসভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে এবং খগেন্দ্রনাথের ইচ্ছা পালনের জন্য উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন। রবিবাসরের সেই অধিবেশনটিতে এত জনসমাগম হয়েছিল বহুলোক সভাস্থলে স্থানাভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনতে থাকেন। আমি রবি-বাসরের এত বড়ো এবং এত জনাকীর্ণ সভা আর কখনও দেখি নি। অবশ্য শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত দুটি রবি-বাসরেই হলভর্তি জনসমাবেশ হয়েছিল কিন্তু রবীন্দ্র-তিরোধানের এক বৎসর পরেও ইউনিভারসিটি সিনেট হলের মতো এত লোক অন্য কোনো রবিবাসরে দেখি নি।

খগেন্দ্রনাথ একজন খ্যাতনামা কীর্তনগায়ক ছিলেন। স্বনামধন্য সঙ্গীতবিজ্ঞানী পণ্ডিত ভাতখণ্ডে পর্যন্ত তাঁর কাছে কীর্তনের কলাকৌশল ও গায়ন-পদ্ধতি জানতে কলকাতায় এসেছিলেন। আমরা রবিবাসরেও তাঁকে বহুবার কীর্তন গাইতে শুনেছি—তবে সে নেহাত নমুনাস্বরূপ। বিশিষ্ট কীর্তনসমাজে তিনি ছিলেন একজন বিশেষ সমাদৃত উচ্চাঙ্গের কীর্তন-শিল্পী—যিনি কীর্তনে শুধু নিজে কেঁদে ভাসাতেন না, শ্রোতাদেরও কাঁদিয়ে ছাড়তেন। তাঁর কীর্তনের তালে-তালে সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলী আনন্দে নৃত্য জুড়ে দিয়েছেন—এমন দৃষ্টান্তও আছে।

অধ্যাপক হিসাবে এবং ব্যক্তি হিসাবে তিনি কী গভীর প্রভাব ছাত্রসমাজে বিস্তার করতেন সে বিষয়ে কিছু স্মৃতিচারণ করেছেন প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর ছাত্র চপলাকান্ত ভট্টাচার্য। এখানে তা থেকে সামান্য অংশ তুলে দিচ্ছি—

'(প্রেসিডেন্সি কলেজে) যে অধ্যাপকমণ্ডলীর সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম অধ্যাপক (খগেন্দ্রনাথ) মিত্র তাঁহাদের অন্যতম এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবও ছিল যথেষ্ট। উজ্জ্বল গৌর বর্ণ, সুশ্রী সুগঠিত আকৃতি, প্রদীপ্ত দৃষ্টি, অপূর্ব বাচনভঙ্গী। তাঁহার অধ্যাপনায় অজ্ঞাত বিষয় আপনিই হৃদয়গ্রাহী হইয়া

উঠিত। সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ছিল তাঁহার বাচনভঙ্গী। সুমিষ্ট শান্ত ধীরভাবে কথাগুলি বলিতেন। কিন্তু সেই বলার মধ্যে কোথাও একটা শক্তি থাকিত যাহা বলিয়া দিত, ইহাই তোমাদের মানিয়া লইতে হইবে। ইহার উপর আর কিছু বলিবার নাই। তাঁহার ব্যক্তিত্ব দেখিয়া মনে হইত, সুদক্ষ মণিকারের হাতে মার্জিত হীরকখণ্ডের যেমন সকল মুখ দিয়াই জ্যোতি স্ফুরিত হয়, এ ব্যক্তিত্ব সেই রকমই। বহুমুখী ব্যক্তিত্বের সকল দিক দিয়াই যেন আলো ঠিকরাইয়া পড়িতেছে।'

গান্ধীজির ডাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন, ম্যাট্রিক এবং আই-এ পরীক্ষায় স্কলারশিপ পাওয়া ছাত্র চপলকান্ত বি-এ-ক্লাশে খগেন্দ্রনাথের কাছে দর্শন-শাস্ত্রে অনার্স পড়তে পড়তে কলেজ ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সেই সময়ের একটি ঘটনা—

'আন্দোলন লইয়া যে সময়টা খুব ব্যাপৃত সেই সময়ে অধ্যাপক মিত্রের নিকট হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিলাম। কলেজে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক ছিল, কলেজ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ঘনিষ্ঠতার যোগ আর রহিল না। ইহার অনেক দিন বাদে একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিয়া যায়। কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের পশ্চিম ফুটপাত ধরিয়া যাইতেছিলাম, বিপরীত দিক হইতে তিনি আসিতেছিলেন। যেখানে মনোমোহন লাইব্রেরিটা ছিল সেইখানে তাঁহার সামনাসামনি আসিয়া পড়িলাম। খালি পায়ে, মাত্র একটি খদ্দরের চাদর গায়ে, চুল অবিন্যস্ত—এইভাবে যাইতেছিলাম। তিনি দুই হাতে ধরিয়া আমাকে দাঁড় করাইলেন, ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন—"চপলা, এ তোমার কী চেহারা হইয়াছে? তুমি কি সন্ন্যাসী হইয়া গেলে?" উত্তর দিতে পারিলাম না। মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ সেইভাবে থাকিয়া নমস্কার করিয়া বিদায় লইলাম।'

তবু ছাত্রবৎসল খগেন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় ছাত্র চপলাকান্তকে ভোলেন নি, যে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হওয়াই ভাগ্যের কথা, সেই প্রেসিডেন্সি কলেজেই মেধাবী দরিদ্র সম্পূর্ণ অপরিচিত ফরিদপুর হতে আগত একটি ছেলেকে চপলাবাবুর অনুরোধে খগেন্দ্রনাথ তৎকালীন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ ব্যারো সাহেবকে ধরে ফুল ফ্রীশিপ আদায় করে দিয়েছিলেন।

খগেন্দ্রনাথ কলেজ হতে অবসর নিয়ে সরকারি শিক্ষা বিভাগে যোগ দেন, সেই কাজে থাকতে-থাকতেই কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন—প্রথমে কাউনসিল অব স্টেট, পরে লেজিসলেটিভ এসেমব্লিতে।। স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্রও তখন গভর্নর-জেনারেলের সদস্য ছিলেন। একদিন স্যার ভূপেনের সিমলার বাসভবনে কীর্তন শোনাবার জন্য খগেন্দ্রনাথ-এর আমন্ত্রণ আসে। তিনি গাইতে গেলে সকলে বায়না ধরেন—এমন গান গাইতে হবে যাতে সভাসদ সকলে নাচতে বাধ্য হন। খগেন্দ্রনাথ তাতেই সম্মত হয়ে গান শুরু করেন। কীর্তনের অগ্রগতির সঙ্গে এমন প্রবল ভাবের সঞ্চার হয় যে শ্রোতারা সবাই আত্মহারা হয়ে নাচতে শুরু করেন। নাচের বেগও এত প্রবল হয় যে বাড়িটা যেন কাঁপতে থাকে। এই ঘটনাটি খগেন্দ্রনাথ চপলাকান্তের কাছে নিজে বিবৃত করেছিলেন। (দ্রষ্টব্য : রবিবাসর সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা—৩, পৃষ্ঠা ৭২)

এই প্রখর ব্যক্তিত্বশালী অথচ শান্ত সংযত বৈষ্ণব প্রকৃতির মানুষটি যখন রবিবাসরে এসে বসতেন সভা সত্যিই যেন আলোকিত হয়ে উঠত। চপলাবাবু তাঁর সহপাঠী বন্ধু শ্যামাপ্রসাদকে অনুরোধ করেছিলেন, খগেন্দ্রনাথকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যানসেলর নিযুক্ত করতে। শ্যামাপ্রসাদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'আরে ভাই, সে খগেনবাবু কি আর আছেন'। তিনি তখন অসুস্থ।

সেই অসুস্থ অবস্থাতেই বাড়িতে রবিবাসর ডাকলেন। উপলক্ষ তাঁর প্রিয় ছাত্র চপলাকান্ত সদ্য পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণ করে ফিরেছেন। তাঁকে অভিনন্দন

জানাবেন। সে অধিবেশনে আমি উপস্থিত ছিলাম। গুরুশিষ্যের মিলনের সেই মধুর দৃশ্যটি আজও যেন চোখের উপর ভাসছে। অসুস্থ খগেন্দ্রনাথ চেয়ারে বসে, চপলাকান্ত তাঁর পায়ের কাছে ফরাসে। খগেন্দ্রনাথ গভীর মমতার সঙ্গে চপলাকান্তকে অভিনন্দন জানালেন, আশীর্বাদ করলেন। আর চপলাকান্ত তাঁর ভাষণের প্রাক্কালে গুরুবন্দনায় কী আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন!

রবিবাসরে এইরকম মনীষীদের সমাবেশ বহু বহু বার ঘটেছে। তাই তার বৃত্তান্ত বলতে বসলে আর ফুরোতে চায় না।

[এই প্রসঙ্গে আরো কিছু কথা ভবিষ্যতে প্রকাশের ইচ্ছা আছে।—সম্পাদক]

যাঁরা ছাপার জন্য লেখা তৈরি করেন, তাঁদের অনেকের কলম থেকে অনেক ভুল বানান বেরোয়। এই সংখ্যার পাণ্ডুলিপি ছাপতে পাঠাবার আগে যেসব শব্দের বানান আমাদের শুধরে দিতে হয়েছে, তাদের অসম্পূর্ণ একটি তালিকা—

ঊর্ধ্ব (ঊর্ধ, ঊর্ধ), অ্যালিয়েনেশন (এ্যালিয়েনেশন), কিংবা (কিম্বা), জাদু (যাদু), তত্ত্ব (তত্ব), দাবি (দাবী), দামি (দামী), ধরন (ধরণ), পশ্চাৎপট (পশ্চাতপট), বয়ঃকনিষ্ঠ (বয়োকনিষ্ঠ), পরিষ্কার (পরিস্কার), পুরস্কার (পুরষ্কার), সদ্যোজাত (সদ্যজাত), সংবর্ধনা (সম্বর্ধনা)।

বিষয় : ব্রহ্মদেশ

বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

উচ্চব্রহ্মদেশীয় রাজপ্রাসাদের আমোদ-প্রমোদ

মহারাজ তিব'র সিংহাসনলাভের পর হইতে, রাজ-দরবারে ও রাজপ্রাসাদে যেরূপ নিরবচ্ছিন্ন ষড়যন্ত্র, কারাদণ্ড ও প্রাণদণ্ড হইতেছিল, কন্সাল সাহেবের তর্জন এবং বৈদেশিক ভাগ্যান্বেষিগণের রূঢ় ব্যবহার উচ্চব্রহ্মে যেরূপ অশান্তি উৎপাদন করিতেছিল, নানা-প্রকার ও নানাজাতীয় গুপ্তচর যেভাবে রাজ্যমধ্যে, এমনকী রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া রাজ্যনাশের রন্ধ্র অনুসন্ধান করিতেছিল, এবং রাজ্যের প্রধান মন্ত্রি-গণ দ্বেষ- ও হিংসা-পরবশ হইয়া তিব'কে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য যেরূপ গুপ্তভাবে একাধিক ষড়যন্ত্রের অঙ্গীভূত হইয়াছিলেন, তাহাতে মহারাজ তিব'র পারিবারিক জীবন যে অত্যন্ত অশান্তিময় হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ হয় না।

কিন্তু এরূপ ষড়যন্ত্র, কারাদণ্ড ও অশান্তিই তাঁহার জীবনপুস্তিকার সকল অধ্যায় নহে।

মানুষ আনন্দের সন্তান। অত্যন্ত দুঃখ ও কষ্টের মধ্যেও সে আনন্দের অনাবিল অমৃতরস হইতে বঞ্চিত হয় না। মহারাজ তিব'র দিনরাত্রি ও সন্ধ্যা-প্রভাত, ছোটোবড়ো রাজনৈতিক উদ্বেগে দুর্যোগময় থাকিলেও অন্যদিকে ছিল রাজ-অন্তঃপুরে মহারানী থুপিয়ালার প্রীতি, লেট্‌ঠোন-ড' কক্ষে বন্ধুদিগের নির্দোষ হাস্য-পরিহাস, রাজ-উদ্যানে নানাপ্রকার ক্রীড়া-কৌতুক, রাজমঞ্চে মাঝে প্রভৃতি সুগায়িকার মনোহর সংগীত এবং ধর্মমন্দিরে মহারাজ তিব'র ভক্তিললিত প্রার্থনা, অযাচিত দান ও বিদ্যা-বৃদ্ধ বৌদ্ধাচার্যগণের সহিত ধর্মালোচনা।

একদিকে ছিল মহারাজ তিব'র রাজসভায় নিত্য-নূতন রাজনৈতিক সমস্যা—ব্রহ্মরাজ্য সংরক্ষণের জন্য সন্ধি, বিচ্ছেদ, মিত্রলাভ ও সুহৃদ্ভেদের গভীর গুপ্ত মন্ত্রণা; আর অন্যদিকে ছিল মহারানী থুপিয়ালার

দরবারে নিত্যনূতন রঙ্গময় প্রেমের মোকদ্দমা। একদিকে ছিল রাজ্যমধ্যে চুরি, ডাকাতি ও বিদ্রোহ নিবারণের জন্য ব্রহ্মসৈন্যের কুচকাওয়াজ; আর অন্যদিকে ছিল রাজ-উদ্যানে আনন্দপ্রসূ চৌরাম্বেষণ, বনভ্রমণ, অলীক-বিবাহ ও সখীদের রাল্‌বী খেলা। একদিকে ছিল তিব'র বিলাসকক্ষে মদিরামত্ত বয়স্যগণের উচ্চহাস্য, অন্যদিকে প্রতি বৌদ্ধপর্বে দেবমন্দিরে নির্জলা উপবাস ও উচ্চ স্তোত্রধ্বনি। একদিকে রাজধানীর প্রকাশ্যপথে রজতমুদ্রাধ্বনিমুখর জনপূর্ণ দ্যূতশালা, আর অন্যদিকে ছিল ধর্মমন্দিরে পলিতকেশ বৌদ্ধাচার্যগণের সুগম্ভীর টায়া-হ-জিন (ধর্ম-সম্বন্ধীয় বক্তৃতা)। এইরূপ পরস্পরবিরোধী ঘটনাবলীর মধ্যে মহারাজ তিব' ও মহারানী থু পয়ালার রাজত্বকাল সুখে-দুঃখে, শান্তি-অশান্তিতে বৈচিত্র্যময় ছিল।

প্রাতঃকাল ৮টা হইতে দু-প্রহর ১২টা পর্যন্ত মহারাজ তিব' রাজকার্য করিতেন। অপরাহ্ণ তিনটা পর্যন্ত বিশ্রাম করিয়া অন্তঃপুরে বা রাজপ্রাসাদের বাহিরে নানাপ্রকার ক্রীড়াকৌতুকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অতিবাহিত করিতেন। তৎপরে সন্ধ্যাপ্রার্থনাদির শেষে বিলাসকক্ষে তিনি বয়স্যদিগের সহিত তাসপাশা খেলিয়া রাত্রি নয়টার পর শয়নকক্ষে আসিতেন। আবশ্যকীয় কার্যের জন্য মহামন্ত্রী ও আতুইন-উনগণ যে-কোনো সময়ে মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন।

অন্তঃপুরে ও বিলাসকক্ষে যেরূপ আমোদ-প্রমোদ হইত, তাহার সম্বন্ধে কয়েকটি গল্প পাঠকগণকে বলিব।

(ক)

রাজান্তঃপুরের আমোদ-প্রমোদ

নভেম্বর মাস, বিকাল বেলা, দিনে প্রখর রৌদ্র ছিল, এখনো ঠাণ্ডা পড়ে নাই। দক্ষিণের উদ্যানে আজ চা-পান হইবে। মহারাজ তিব' মহারানীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

মহারাজের ত্রিশজন সহচর এই চা-পানে যোগ দিবার জন্য আদিষ্ট হইয়া মহারাজ তিব'র সহিত দক্ষিণের উদ্যানে আসিয়াছেন। সকলেই সম্ভ্রান্তবংশের পুত্র, শিক্ষিত যুবক, ব্যায়ামবলিষ্ঠ দেহ, সুবর্ণকান্তি উজ্জ্বল মুখশ্রী, সুবিন্যস্ত কেশ, শিরে রক্তরেশমের উষ্ণীষ, অঙ্গে শুভ্র-রেশমের এঙ্গি এবং পরিধানে নৌসৈন্যনীল রেশমি লৌঙ্গি।

৪টার সময়ে মহারানী থু পয়ালা তাঁহার ত্রিশজন সহচরীসহ উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের মুখে শুভ্র তানাখার লঘু-প্রলেপ, শিরে সুকৃষ্ণ কেশের কুণ্ডলীকৃত কবরী, তাহাতে জ্যোতির্ময়ী হীরকের নক্ষত্রোজ্জ্বল কেশবন্ধ, হস্তে মণিময় বলয়, কণ্ঠে মুক্তার মালিকা, কর্ণে হীরকের কুণ্ডল, অঙ্গে বলাকা-শুভ্র এঙ্গি, বক্ষে লেবু-নীল রেশমের কাঁচুলি এবং পরিধানে জবারক্ত রেশমের বিচিত্র থামিন। সকলেই উচ্চবংশের কন্যা, সুশিক্ষিতা ও সুচরিত্রা। পদ্মরাগসন্নিভ অধরোষ্ঠে লঘু হাস্যবিজলী বিজড়িত করিয়া এই যুবতীগণ মহারানীর সহিত উদ্যানে আগমন করিলে, মহারাজ তিব' সানন্দে আসন হইতে উত্থান করিয়া মহারানীকে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং মহারানী থুপিয়ালা আসন গ্রহণ করিলে পর মহারাজ তিব' তাঁহার বামপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। মহারানীর সহচরীগণ তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উপবেশন করেন; মহারাজের সহচরগণ তাঁহার বামপার্শ্বে পারস্যদেশীয় কার্পেটের উপর বসিলেন।

উদ্যানমধ্যে প্রত্যেক দশ হাত অন্তর ত্রিশখানি ছোটো কার্পেট বিস্তৃত হইয়াছিল। তাহার উপর অর্ধ-হস্ত-উচ্চ স্বর্ণপত্রমণ্ডিত চা-পদ (teapoy)। মহারাজার ভৃত্যগণ তাহার উপর স্তরে-স্তরে অপরাহ্ণ ভোগ ও চা-পাত্র সাজাইয়া রাখিয়াছিল।

সকলে উপবেশন করিলে মহারাজ তিব' বলিলেন;

—মহারানী, তোমার সখীগণ সকলেই অনূঢ়া, আমার সহচরগণও সকলেই অবিবাহিত। আমরা

দুইজন মাত্র বিবাহিত জায়াপতি—এই চা-পানে উপস্থিত আছি দেখিয়া আমি অত্যন্তই দুঃখিত হইতেছি। তোমার সুন্দরী সহচরীগণের নিদারুণ স্বামী-শূন্যতা আমাকে অত্যন্ত কষ্ট দিতেছে। অতএব আমি আজ এই শুভ সম্মেলনে আমার সহচরগণের সহিত তোমার সহচরীগণের উদ্বাহ-কার্য সম্পন্ন করিয়া পুণ্যলাভ করিতে ইচ্ছা করি।

মহারাজের এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া মহারানী বিস্মিতনেত্রে তাঁহার লজ্জানম্র সখীগণকে অবলোকন করিতে করিতে কহিলেন:

ভবেশ্বর, তোমার এই বিস্ময়জনক অনুরোধে আমার সুশীলা সখীগণ অত্যন্ত ভীত ও লজ্জিত হইয়াছে। তাহারা অনূঢ় হইলেও মহাসুখে রাজ-অন্তঃপুরে বাস করিতেছে। তোমার প্রগল্‌ভ সহচরদিগকে ইহারা বিবাহ করিয়া সুখী হইবে না। অতএব তুমি এই বিসদৃশ ইচ্ছা পরিত্যাগ করো।

মহারাজ তিব' পুনরায় কহিলেন—

যুবতীদিগের যুবসঙ্গ-বাসনাই স্বাভাবিক। তোমার সঙ্গলাভেও ইহাদের পতিসঙ্গ-বাসনা অপূর্ণ রহিয়াছে। সুতরাং তুমি আমার প্রস্তাবিত এই পুণ্যকার্যে বিঘ্ন উৎপাদন না করিয়া তোমার সখীগণের সম্মতিলাভ করিতে চেষ্টা করো। আমিও আমার সহচরগণের মতামত পরীক্ষা করিতেছি।

এই বলিয়া মহারাজ তিব' আসন হইতে উঠিয়া তাঁহার সহচরগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

মহারানীর সহচরীগণ মহারাজের এই লজ্জাকর প্রস্তাবে অসম্মতি বিজ্ঞাপন করিতে করিতে মহারানীকে বেষ্টন করিয়া নানা প্রকার অনুনয় করিতে লাগিল। মহারানী তাহাদিগকে বলিলেন:

সখীগণ, আমি কোনদিনই মহারাজার আজ্ঞা অমান্য করি নাই। আজ আমি কী উপায়ে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিব? আমার অনুরোধে তোমরা মহারাজের আদেশ অনুযায়ী বিবাহ করিতে সম্মত হও। এত শীঘ্র, এক অপরাহ্ণের মধ্যে কোনো প্রকারেই তোমাদের বিবাহকার্য নিষ্পন্ন হইতে পারে না। সম্ভবত তিনি পরিহাস করিয়াই এরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন। তোমরা মহারাজের প্রস্তাবে সম্মত হও। দেখি, তিনি কী করেন!

মহারানীর এইরূপ অনুরোধে তাঁহার সখীগণ সম্মত হইল এবং লজ্জিতভাবে মৌনাবলম্বন করিয়া স্ব স্ব অদৃষ্ট পরীক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

মহারাজ শীঘ্রই সহচরগণের সম্মতিলাভ করিয়া সহর্ষে প্রত্যাগমন করিলেন। মহারানী বলিলেন:

মহারাজ, আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য "দেবা-মানবা-যক্ষা-নাগা" সকলেই সর্বক্ষণ প্রস্তুত রহিয়াছেন। আমার সুশীলা সখীগণও স্বর্ণব্রহ্মের রাজাধিপতির অনুরোধ রক্ষা করিতে অসম্মত নহে। কিন্তু আমি সাদুনয় নিবেদন করিতেছি যে, আমার সুন্দরী ও সদ্ধংশজা সখীগণ এই আকস্মিক বিবাহে উপযুক্ত ও বাঞ্ছিত পতি লাভ না করিলে চিরজীবন কষ্ট ভোগ করিবে, এবং তাহাতে মহারাজের পুণ্যলাভ না হইয়া পাপসঞ্চয় হইবে। অতএব যে উপায়ে আমার লজ্জাশীলা সখীগণ উপযুক্ত পতিলাভ করিয়া সুখী হইতে পারে, তাহার সদুপায় করুন।

মহারাজ তিব' বলিলেন:

রাজেন্দ্রাণী, তোমার এই সদ্‌যুক্তিপূর্ণ বাক্যে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। সকল বিবাহই বিধির নির্বন্ধানুসারে সম্পাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং আমি এরূপ সুন্দর উপায়ে তোমার সখীগণের স্বামী নির্বাচন করিব যে তাহাতে কেহই অসন্তুষ্ট হইবে না।

এই বলিয়া মহারাজ তিব' তাঁহার ভৃত্যগণকে ইঙ্গিত করিলে, তাহারা ত্রিশ প্রকারের ভিন্ন-ভিন্ন পুষ্প আনিয়া মহারানীর সম্মুখে স্থাপন করিল। মহারাজ তিব' বলিলেন:

মহারানী, তোমার সখীগণ ইহা হইতে ভিন্ন-ভিন্ন

জাতির এক-একটি পুষ্প তাহাদিগের কবরীতে স্থাপন করিয়া নিকটস্থ পর্বত-গুহায় ও কুঞ্জ-বিতানে উপবেশন করুক। আমার যে সহচর অনুরূপ পুষ্প লইয়া তোমার যে সখীর নিকট উপস্থিত হইবে, সে তাহার প্রেমভিক্ষা করিয়া সম্মতিলাভ করিলে, তাহাকে বিবাহ করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইবে।

মহারাজের এইপ্রকার বাক্যে মহারানী ও তাঁহার সহচরীগণের আরুদ্ধ হাস্যে উদ্যান আধুনিত হইয়া উঠিল। মহারানী বলিলেন :

মহারাজের আদেশ আমাদিগের শিরোধার্য; কিন্তু আমার সখীগণ যে সময়ে পুষ্পনির্বাচন করিয়া কবরীতে পরিধান করিবে, তখন তোমার সহচরগণ এখানে অবস্থান করিতে পারিবে না। কারণ তাহারা ইহা দেখিতে পাইলে অদৃষ্টানুরূপ জায়া গ্রহন না করিয়া দৃষ্টানুরূপ পত্নী মনোনয়ন করিবে। তোমার উদ্ভাবিত এই অদৃষ্ট পরীক্ষাও বিফল হইবে।

মহারানীর এই উপদেশে মহারাজ তাঁহার সহচর-গণকে উদ্যান হইতে পনেরো মিনিটের জন্য অপসৃত হইতে আদেশ দিলেন। সহচরগণ সানন্দ উদ্যানের বহির্ভাগে চলিয়া গেলে একজন সহচরী তাহাদিগকে পরিদর্শন করিয়া মহারানীকে জানাইল। সখীগণ অতঃপর কপোতীপুঞ্জের ন্যায় মহারানীর সম্মুখে আগমন করিয়া ইচ্ছানুরূপ এক-একটি ফুল গ্রহণ করিল এবং স্বীয়-স্বীয় কবরীতে তাহা স্থাপন করিয়া উদ্যানস্থ কৃত্রিম পর্বতকের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল প্রত্যেক গুহায় ও লতাবিতানে এক-একটি কার্পেটের আসন বিস্তৃত রহিয়াছে। উচ্চহাস্যে পর্বত, কাননা ও কুঞ্জগৃহ নন্দিত করিয়া, এক-এক যুবতী এক-এক আসনে উপবিষ্ট হইয়া অদৃষ্টলভ্য প্রণয়ীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

সহচরীগণ এইরূপে পর্বতগুহা ও কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিলে, মহারাজ তিব' তাঁহার সহচরগণকে আহ্বান করিলেন। তাহারাও পূর্বোক্ত পুষ্প হইতে এক-একটি পুষ্প গ্রহণ করিয়া বক্ষের বামপার্শ্বে স্থাপন করিয়া স্বীয়-স্বীয় প্রণয়িনীর অনুসন্ধানে গমন করিতে আদিষ্ট হইল।

মহারাজ তিব' ও মহারানী থুপিয়ালা উদ্যানে উপবেশন করিয়া সহাস্যে বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন।

আর অন্যদিকে কুঞ্জ, নিকুঞ্জ, লতাগৃহ, কদলী-কুটির ও পর্বতগুহা হইতে হাস্যের রোল উত্থিত হইতে লাগিল। যুবকগণ তাহাদিগের অদৃষ্টলভ্যাদিগকে চিনিয়া লইবার জন্য কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমণ করিতে লাগিল।

এক-দুই-তিন-চার কুঞ্জে বাঞ্ছিতাকে মিলিল না। পঞ্চম কুঞ্জে এক সুন্দরীকে দেখিয়া এক যুবক তাহার নিকট উপবেশন করিল; সম্বোধন করিল :

—প্রিয়তমে!

সুন্দরী হাসিয়া বলিল—

—আ মোলো; চক্ষুতে ছানি পড়িয়াছে নাকি? দেখিতে পাও না আমার কবরীতে কী ফুল? যুবক সুন্দরীর কবরীর দিকে চাহিয়া বলিল :

—প্রিয়ে, ফুল ভিন্ন হইলেও আমার হৃদয় অভিন্ন নহে; তুমিই আমার হৃদয়েশ্বরী!

সুন্দরী উচ্চহাস্য করিয়া যুবককে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিল :

—তোমার দয়িতাকে তুমি বাঁধিয়া লও, বন্ধু! অযথা আমার সময় নষ্ট করিও না। আমি আমার প্রার্থিতের জন্য অপেক্ষা করিতেছি।

যুবক হতাশ হৃদয়ে কুঞ্জ হইতে বহির্গত হইয়া অন্য কুঞ্জে প্রবেশ করিল। সেখানেও বাঞ্ছিতাকে পাইল না। অন্বেষণ করিতে-করিতে পাইল তাহাকে দশম কুঞ্জে। দেখিল তাহার সুন্দর সলজ্জ হাসি, দেখিল তাহার দেববাঞ্ছিত মুখশ্রী, দেখিল তাহার রতিনিন্দিত সৌন্দর্য। আনন্দে আত্মহারা হইয়া যুবক জানুপাতিয়া যুবতীর নিকট উপবেশন করিল। বলিল :

—এই যে আমার হারানো-মানিক কুঞ্জ উজ্জ্বল

করিয়া বসিয়া রহিয়াছে।

যুবতী আয়তলোচনে যুবকের বক্ষঃস্থিত পুষ্পটিকে পর্যবেক্ষণ করিয়া লজ্জায় মুখ অবনত করিল। যুবক সাগ্রহে বলিল :

—আমি জানিতাম না আমি কত ভাগ্যবান! লোকে তোমাকে কী নামে ডাকে, সুন্দরী!

মধুরকণ্ঠে স্নিগ্ধস্বরে যুবতী উত্তর দিল :

—মা ছেইন টিন্। ছেইন টিন্ আমার শুভাদৃষ্টের শুক্রতারা, কোটি কোটি জন্মের পুণ্যফলে আজ আমি তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি।

যুবকের ব্যায়ামদৃঢ় উন্নত বক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যুবতীর গণ্ডদেশ রক্তিম হইয়া উঠিল। উত্তেজিত যুবক সুন্দরীর চম্পককোমল অঙ্গুলগুলিকে সস্নেহে সম্প্রেষণ করিয়া প্রথম প্রেমের কতকগুলি আবেগময় উচ্ছ্বাসময় অসম্ভব তোষামোদপূর্ণ প্রলাপবাক্যে যুবতীকে অভিনন্দিত করিল। প্রণয়মধুর কোমলস্পর্শে ও অপরাহ্ণের রক্তিম আলোকে, যুবতীর অপূর্ব মুখশ্রী আরো অমৃতময় হইয়া উঠিল। যুবক আরো প্রবল উচ্ছ্বাসে যুবতীর নিকট প্রেমভিক্ষা করিতে লাগিল।

সুন্দরী এমন অকপট প্রেমাকাঙ্ক্ষীকে নিরাশ করিলেন না। মুহূর্তের মধ্যে অর্ধঘণ্টা অতীত হইয়া গেল। প্রণয়িনীকে সঙ্গে করিয়া উদ্যানে ফিরিয়া আসিবার জন্য মহারাজের আহ্বান আসিল।

যুবক-যুবতীগণ তাহাদের নিভৃত মিলন ভঙ্গ করিয়া যুগ্মে-যুগ্মে পর্বতকন্দর হইতে বহির্গত হইল। যুবতীগণ লজ্জায় মস্তক নত করিয়া তাহাদিগের দৈবলব্ধ ভর্তার সহিত উদ্যানে পুনরাগমন করিলে মহারানী বলিলেন :

তোমরা এখন চা-পান করিয়া বিশ্রাম করো। তোমাদিগের বিবাহ সম্বন্ধে মহারাজ যেরূপ আদেশ করিবেন, তাহাই প্রতিপালিত হইবে। প্রত্যেক কার্পেটের উপর প্রত্যেক প্রণয়িযুগল মহাহর্ষে উপবেশন করিল, ভৃত্যগণ চা পরিবেশন করিতে লাগিল। মহারাজ তিব' ও মহারানী থুপিয়ালা চা-পান করিতে-করিতে তাহাদিগের সহচর-সহচরীদিগের বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। সহচরগণ মহা আগ্রহে স্বীয় প্রণয়িনী-গণের সহিত সরস বাক্যালাপ করিতে লাগিল!

চা পান শেষ হইলে, মহারাজ বলিলেন :

যে যুবতী তাহার অদৃষ্টলব্ধ পতিকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক, সে এখন মহারানীর নিকট প্রত্যাবর্তন করুক।

মহারাজের এই আদেশ শুনিয়া এক চম্পকবরনী সুদীর্ঘলোচনা ষোড়শী উঠিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার প্রণয়ী সস্নেহে তাহার হাত ধারণ করিয়া নিম্ন-স্বরে বলিল :

তুমি আমায় পরিত্যাগ করিলে অদ্যই আমি আত্মহত্যা করিব। তুমি আমার অন্ধকার জীবনের ধ্রুবতারা, তুমি আমার স্বর্গের পারিজাত, তুমি আমার নিঃসঙ্গ জীবনের চিরসঙ্গিনী, আমি তোমাকে ছাড়িব না।

যুবকের প্রেমাচ্ছন্ন নয়ন ও মিনতিপূর্ণ মুখশ্রী দেখিয়া ষোড়শীর হৃদয়ে করুণা-সঞ্চার হইল। সে নিঃশব্দে মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া রহিল, আর উঠিতে চেষ্টা করিল না।

কেহই উঠিল না দেখিয়া মহারাজ পুনরায় উচ্চকণ্ঠে বলিলেন :

আমি আরো পাঁচ মিনিট সময় দিলাম। যে স্বামী গ্রহণে অনিচ্ছুক সে উঠিয়া দাঁড়াও।

সলজ্জ হাস্য, মৃদু অনুনয় ও সস্মিতপূর্ণ কটাক্ষে যুবযুবতীদিগের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বৃত্তগুলি আন্দোলিত হইয়া উঠিল, কিন্তু কোনো যুবতীই কার্পেট হইতে উঠিয়া অসম্মতি বিজ্ঞাপন করিল না।

মহারাজ তখন পুনরায় উচ্চস্বরে কহিলেন :

যে যুবক তাহার লব্ধ প্রণয়িনীকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক, সে দণ্ডায়মান হোক।

আবার সহর্ষ কটাক্ষ ও সলজ্জ মুখশ্রেণীতে উদ্যান মনোরম হইয়া উঠিল। কোনো যুবকই প্রণয়িনীকে পরিত্যাগ করিয়া আসন হইতে উঠিল না।

মহারানী তখন হাসিতে-হাসিতে তাহার সহচরীগণকে আহ্বান করিলেন। মহারাজ বলিলেন :

আমি তোমাদিগের রাজা মাত্র; তোমাদিগের পিতামাতার অনুমতি ব্যতীত তোমাদিগকে বিবাহিত করা আমার অসাধ্য। তোমরা এখন এই উদ্যানসম্মিলন ভঙ্গ করিয়া স্ব স্ব কার্যে গমন করো। তোমাদিগের পিতামাতার সম্মতিলাভ করিলে, বিবাহের প্রস্তাব পুনরায় বিবেচিত হইবে।

মহারানী তাঁহার সাথীগণকে লইয়া বিদায়গ্রহণ করিলেন। পথে তিনি সখীগণকে বলিলেন :

নির্লজ্জ মেয়েরা! আজ তোমাদের সতীপনার প্রমাণ পাইলাম। আজ হইতে তোমরা কেহই অন্তঃপুরের বাহিরে যাইতে পারিবে না। মহারাজের সহচরদিগের সহিত কথা বলিতে পারিবে না।

সখীগণ পরস্পরের মুখ অবলোকন করিয়া হাসিয়া লুটোপুটি হইতে লাগিল। মহারানী প্রতিবাদ করিলেন না। [ক্রমশ

রচনা : অনুমান ১৯৩৫ সাল

বড়দা ও আমার তরুণকালের স্মৃতি

সুধীর সেন

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রবীন্দ্র-অধ্যাপক এবং রবীন্দ্র-ভবনের প্রথম অধ্যক্ষ 'রবীন্দ্র-তত্ত্বাচার্য', রবীন্দ্রপ্রবেষক, ঐতিহাসিক ও বাঙলা ছন্দঃশাস্ত্রের রূপকার মনীষী প্রবোধচন্দ্র সেন ৯০ বছর বয়সে পরলোক গমন করলে তাঁর জীবনী আলোচনার জন্য উদ্যোগী হয়ে তাঁর বিপ্লবী জীবনের অজ্ঞাত তথ্য সন্ধানে তাঁর সহোদর, আন্তর্জাতিকখ্যাতিসম্পন্ন প্রবীণ অর্থনীতিবিদ ও রাষ্ট্রপুঞ্জের অবসরপ্রাপ্ত পদস্থ কর্মী ড. সুধীর সেনের কাছে তাঁর নিউ ইয়র্কের বাড়িতে যাই। তিনি তাঁর 'বড়দা'র বিষয়ে যেসব কাহিনী শোনালেন তা যেমন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, তেমনি চমকপ্রদ। প্রবোধচন্দ্রের অনুরাগীদের বিশেষ অনুরোধে তিনি তাঁর ৮২ বছর বয়সেও সে কাহিনী নিজেই গুছিয়ে সুন্দরভাবে লিখেছেন। এখানে ড. সেনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম।

ড. সুধীর সেনের জন্ম হয়েছিল অবিভক্ত বাঙলার কুমিল্লা শহরে, ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি। কুমিল্লার বিখ্যাত ঈশ্বর পাঠশালা আর কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের নাম-করা ছাত্র হিসাবে তিনি বি. এ. পরীক্ষায় অর্থনীতি এবং বাঙলায় প্রথম স্থান অধিকার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক পান। পরে লনডন স্কুল অব ইকনমিকস হতে স্নাতক হয়ে অর্থনীতিশাস্ত্রে জার্মানির 'বন্' বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তখন জারমান ভাষায় দুখানি অর্থনীতির বই ও বহু প্রবন্ধ তিনি প্রকাশ করেন। ইউরোপের আরও কয়েকটি ভাষা, বিশেষত ইতালিয়ান ভাষা রপ্ত করে তিনি রোম ও ইউরোপের নানা চিত্রশালা সম্পর্কে ব্যাপকভাবে পড়াশুনা করেন, ও সেইসব চিত্রশালায় শিল্পকর্ম নিয়ে পর্যালোচনা করেন।

তাঁর বেশির ভাগ লেখাই ইংরাজি ভাষায় হলেও বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতনে কাজ করবার সময় তিনি "দেশ" পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। গত ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬ তারিখের "দেশ"-এ চৈনিক চিত্রশিল্পী সু বেইহং সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘ ইংরাজি প্রবন্ধের আমার করা বাঙলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

ইউরোপে দীর্ঘ দশ বৎসর বাসের শেষ পর্যায়ে যখন তিনি ইতালিতে উচ্চপদে কর্মরত ছিলেন, তখন মি. লেনার্ড এলমহার্স্টের আহ্বানে ভারতে আসেন এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীনিকেতনে পল্লীসংগঠনের কাজে অর্থনৈতিক উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। সে সময়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের নিকট-সান্নিধ্যে আসেন। পরে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁকে ভারতের জাতীয় পরিকল্পনা সমিতির কাজে সহায়তা করতে ডাকেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত রাশিয়ায় ভারতের প্রথম রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হলে ড. সেন তাঁর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা নিযুক্ত হয়ে মস্কো যান।

দামোদরের প্রবল বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যখন আমেরিকার টেনেসি ভ্যালি অথরিটির ধাঁচে একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের পরিকল্পনা হয় তখন ড. সেনকে সেই প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হয় এবং বাঙলা, বিহার ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে যাবতীয় মতভেদ দূর করবার ভার পড়ে তাঁর উপর। তিন পক্ষের পূর্ণ সমর্থন লাভের এক বৎসর পরে দামোদর ভ্যালি করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ড. সেন ইতিমধ্যে আমেরিকায় টেনেসি ভ্যালিতে সরেজমিনে কার্যপদ্ধতি দেখে আসেন এবং তিনিই ডি. ভি. সি-র প্রথম সেক্রেটারি ও চীফ একজিকিউটিভ রূপে নিযুক্ত হন। সংগঠনের কাজ অনেকখানি অগ্রসর হলে ও বিশ্বব্যাঙ্ক হতে দুইটি ঋণের সহায়তা পেয়ে করপোরেশন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠলে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে বম্বে যান এবং গ্রেট ঈস্টার্ন শিপিং কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে ভারতের জাহাজ

পরিবহণ শিল্প সুপ্রসারিত করতে সাহায্য করেন। ছয় বৎসরের অধিককাল (১৯৪৮-৫৪) ডি. ভি. সি-তে তাঁর কর্মকুশলতার পরিচয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

১৯৫৬ সনে তিনি নিউ ইয়র্কের রাষ্ট্রপুঞ্জের সদর দপ্তরে যোগ দেন এবং ১৯৬৬ সন পর্যন্ত পৃথিবীর নানা দেশে 'ইউ-এন-ও'র নানা দায়িত্বপূর্ণ পদে বিশেষ সুনামের সঙ্গে কাজ করেন। এখন অবসর জীবনে তিনি নিউ ইয়র্কের স্থায়ী বাসিন্দা।

তবে দীর্ঘদিন বিদেশে বাস করলেও এবং ইংরাজিতেই প্রায়শ লিখতে অভ্যস্ত হলেও রবীন্দ্রকাব্য এখন তাঁর কণ্ঠস্থ আছে। ছাত্রজীবনে তিনি পাণিনির ব্যাকরণ এবং সংস্কৃত কাব্যাদি ভালো করেই পড়েছিলেন, এমনকী টোলের পরীক্ষাও উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। সে স্মৃতি এখনও ভোলেন নি। তা ছাড়া তাঁর 'বড়দা' ছন্দঃশাস্ত্রী প্রবোধচন্দ্রের বাঙলা ছন্দ বিষয়ে মৌলিক গবেষণায় তিনি ছিলেন নিত্যসঙ্গী। সে সময়ে তিনি ছন্দচর্চাও করেছিলেন এবং বহু সুন্দর কবিতাও লিখেছিলেন—তার পাণ্ডুলিপি আমি দেখেছি। রবিবাসরের সভায় আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেনের স্মরণ-অনুষ্ঠানের জন্য তিনি চমৎকার মন্দাক্রান্তা ছন্দে 'অশ্রুদূত' নামে একটি কবিতা লিখে আমাকে পাঠিয়েছিলেন, তার কিছুটা তুলে দিচ্ছি, যাতে বোঝা যাবে এখনও তিনি সহজেই কেমন সুন্দর কবিতা রচনা করতে পারেন। তিনি লিখেছিলেন—

একদিন দৈবাৎ ভুলেছি গুটিকয় মাত্রা-অক্ষর-স্বরের তাল,
তিন বৃত্তের তান রচিল মনোহর ছন্দ-বিজ্ঞান মায়ার জাল।
চার পাঁচ বৎসর জীবনে হল মোর বাঙলা ছন্দের মহোৎসব,
বন্ধুর পন্থায় পাথেয় হল সেই পুণ্য সম্পদ সুদুর্লভ।

* * *

ঝঞ্ঝার বাতায় আসিল উড়ে আজ ছন্দকৌতুক, প্রাচীন সখ,
মন্দাক্রান্তায় রচিনু বসে তাই 'অশ্রুদূত' মোর নিরর্থক।

তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—(১) United Nations in Economic Devolopment—Need for a New Strategy। (২) A Richer Harvest: New Horizon for Developing Countries। (৩) Reaping the Green Revolution—Food and Job for All। (৪) Turning the Tide (আচার্য প্রবোধচন্দ্রকে উৎসর্গীকৃত)। (৫) Tagore On Rural Reconstruction, বিশ্বভারতী হতে ১৯৪৩ সনে প্রথম প্রকাশিত। অনেক নূতন তথ্য ও গবেষণাসহ বর্ধিতাকারে নতুন সংস্করণ এবার রবীন্দ্রজন্মোৎসবে বিশ্বভারতী হতে প্রকাশিত হবে। (৬) Land and Its Problems। (৭) Conflict of Economic Ideologies—An Attempt at Recon-ciliation। শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়ও বিশ্বভারতী হতে ১৯৪১-৪২ সনে প্রকাশিত হয়েছিল। (৮) Ending World Hunger। (৯) Obligations of Affluence। (১০) Wanderings।

শেষোক্ত গ্রন্থত্রয় প্রকাশের অপেক্ষায়, তার মধ্যে Wanderings বের করছেন ম্যাকমিলান কোম্পানি। তাতে তাঁর দামোদর ভ্যালি করপোরেশনের কার্যকালের ইতিবৃত্ত আছে। তাঁর একখানি বাঙলা কাব্যগ্রন্থও প্রকাশের আয়োজন চলছে। —সন্তোষকুমার দে

১ : শহর থেকে গ্রামে

বড়দা ছিলেন আমার চেয়ে ন বছরের বড়ো। প্রথম বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধ যখন শুরু হল ১৯১৪ সনের অগস্ট মাসে, তখন তাঁর বয়স ছিল সতেরো, আমার ছিল মাত্র আট। যুদ্ধ শুরু হবার অল্প পরেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয় বর্ধমানে। সেখানে গৃহবন্দী হয়ে ছিলেন তিন বছরের উপর। বয়সের এই ব্যবধানের জন্য তাঁর বাল্য, ছাত্র ও বিপ্লব-জীবন সম্বন্ধে আমার নিজস্ব জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নিতান্তই সামান্য এবং তাও অনেকটা ঝাপসা।

গ্রা ম বা স - ব ন বা স

বয়সের পার্থক্য ছাড়াও বড়দার জীবনের এ অধ্যায় সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় একান্ত সংকীর্ণ আরো একটি বিশেষ কারণে। আমার বয়স যখন সাতের কোঠায়, তখন মা-বাবা আমাকে পাঠিয়ে দেন কুমিল্লা থেকে অনেকটা দূরে, গুরুহিত গ্রামে। সেখানে মাসির বাড়িতে থেকে কসবা স্কুলে পড়তাম। মেসো ছিলেন সে স্কুলে অঙ্কের মাস্টার; তাঁরি তত্ত্বাবধানে থেকে আমার পড়াশোনা হত। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণী—সব জড়িয়ে তিন বছর ওখানে ছিলাম।

কুমিল্লা থেকে কসবা কুড়ি মাইল দূরে, কমলা-সাগর রেল-স্টেশনের কাছে। আর ওখানকার স্কুল থেকে গুরুহিত ছিল আধ মাইল দূরে; কাঁচা সড়ক ধরে মাঠের উপর দিয়ে যাতায়াত করতে হত। মাইলের দিক দিয়ে এ দূরত্ব সামান্য, কিন্তু আবহাওয়া আর জীবনযাত্রার দিক দিয়ে কুমিল্লার সঙ্গে তুলনায় মনে হত এ তফাত যেন আকাশ-পাতাল। সে গ্রামবাস আমার কাছে মনে হত বনবাস। কিছু দিন থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। কেমন করে আবার কুমিল্লায় ফিরে যাব—সে-ই ছিল তখন আমার সবথেকে বড়ো কামনা। ফলে শুরু হল আমার জীবনের প্রথম বিদ্রোহ। অনেক লড়াই করে তিন বছর পরে ফিরে আসি কুমিল্লায় এবং ভরতি হই ওখানকার ঈশ্বর পাঠশালার সপ্তম শ্রেণীতে।

ফিরে এসে দেখি বড়দা ওখানে নেই। বাড়ির সবাই এ সম্বন্ধে একেবারে চুপ। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে আমি ছিলাম চতুর্থ। হয়তো ছোটো বলে বা মনে আঘাত পাব বলে আমাকে কেউ কিছু বলতে চায় নি। তবু ছোটো হলেও মনে-মনে অসোয়াস্তি বোধ করতাম। বাড়িতে সব সময়েই ছিল একটা গুমট ভাব, আর সব-কিছুই যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল একটা ম্লান বিষাদের ছায়া।

আসলে কী ঘটেছিল তা জানতে বা শুনতে লাগল বেশ কয়েক বছর, অনেকটা পশ্চাদ্‌দৃষ্টি বা অন্তর্‌দৃষ্টি দিয়ে। তবে ওখানকার কাহিনী এখনো আমাদের কাছে অনেকাংশে অজ্ঞাত রয়েছে। তার কারণও খুব সহজ। এজাতীয় বিপ্লবজীবনের ধর্মই হল সব-কিছুই গোপন রাখা, এমন-কী একান্ত আপন জনের কাছ থেকেও। কাজেই বড়দা যতদিন সক্রিয়ভাবে তাতে নিমগ্ন ছিলেন, ততদিন কাউকে কিছু বলেন নি বা জানতে দেন নি। আর যেদিন বন্দী-জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে আবার ঘরে ফিরে এলেন, সেদিন থেকেই পুরোদমে শুরু করলেন নূতন অধ্যায়। নিজের অতীতের উপরে সবলে টেনে দিলেন এক স্থূল যবনিকা। তাঁর বিপ্লবজীবনের কথা বা বন্দীজীবনের কাহিনী ঘুণাক্ষরেও কাউকে কোনোদিন কিছু বলেন নি। বড়দার সঙ্গে বহুকাল বহু বিষয়ে বহু কথা হয়েছে, কিন্তু তাঁর বিপ্লবজীবনের কথা ভুলেও কোনোদিন তোলেন নি। সে সম্বন্ধে কিছু বলার অনিচ্ছা এতই সুস্পষ্ট ছিল যে, সাহস করে সে সম্বন্ধে তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করার কথা ভাবতেও পারি নি।

তবু নানা ঘটনা থেকে তখনকার দিনে বড়দার মনোভাব, চালচলন আর ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে তাঁর অগোচরেই একটা ছবি অনেক দিন আগেই মনে-মনে এঁকে রেখেছিলাম:

যৌবনে তুমি ছিলে আগ্নেয়গিরি,

মানিতে না কোনো বন্ধন-শৃঙ্খল,
চৌদিকে যেন ফুলিঙ্গ বিচুরি,
ছুটিতে নিয়ত দুরন্ত চঞ্চল।
মনে হত চারিপাশে
কাঁপছে সবাই ত্রাসে।

আগুন আমার ভাই

বিপ্লব, বিদ্রোহ, বিদ্বেষ—সবকিছু ছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে, তাঁর দেশশ্রী তর জ্বলন্ত প্রমাণরূপে। সেই আগুন নিয়ে খেলার যুগে বড়দার বিশেষ পছন্দের গান ছিল—'আগুন আমার ভাই'। তাই আসল ভাইদের অনেক সময় সে আগুনের তাপ বিশেষ করে সইতে হয়েছে। বড়দার হাতে কী পরিমাণ মার খেয়েছি সে সময়ে, এখন তা মনে হলে হাসি পায়। ছিপ নিয়ে সেজদা কি ছোটো ভাই কানুর (আমার চেয়ে মাত্র আঠারো মাসের ছোটো) সঙ্গে কোনো গাছপালায় ঢাকা ছোটো পুকুরে মাছ ধরতে যেতাম। কোথা হতে বড়দা ছুটে এসে আমাদের মেরে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে আবার উধাও হতেন। কোনো কারণে কানু আমার সঙ্গে ঝগড়া করলে বড়দা এসে দুজনকেই মেরে সমান-ভাবে শাসিয়ে চলে যেতেন। কারণ কী, কার দোষ কতখানি তা জানবার বা জিজ্ঞেস করবার তাঁর ফুরসত ছিল না।

কসবা-গুরুহিতে যে তিন বছর ছিলাম তখন বছরে মাত্র বার তিনেক কুমিল্লা আসতে পারতাম, ছুটির দিনে। একবার গরমের ছুটিতে কুমিল্লা এলাম, সম্ভবত ১৯১৩ সনে। দুপুরবেলা খাবার পর বেশ খানিকটা ঘুমিয়ে নিলাম, তারপর বার হবার সঙ্গে-সঙ্গেই দেখি সামনে বড়দা, কোনো কথাবার্তা নেই, ধরে আমাকে ঝেড়ে মারলেন। আমি তো অবাক। কী অপরাধ একেবারে বুঝতে পারি নি। তখন বড়দা একখানি কাগজ বার করে দেখালেন—একটি লিস্ট, তাতে গোটা ছয় ডিটেকটিভ উপন্যাসের নাম। বললেন—'ওখানে স্কুলে গিয়ে বুঝি এই হচ্ছে? আর কোনো কাজ নেই, বাজে বই পড়ছ?'—তখনো দোষ ঠিক ধরতে পারি নি। ডিটেকটিভ উপন্যাস কাকে বলে, পড়লে কী ক্ষতি, কেন—সেসব জানবার বা বুঝবার ক্ষমতা তখনো হয় নি।

আসল ব্যাপারটা হয়েছিল এই: কসবা স্কুলে ছিল একটি ছোটো লাইব্রেরি, আর সেখানে ছিল ছুটো তাকভরা বই, সব-শুদ্ধ শ-খানেক হবে। বই পড়ার আগ্রহবশতই হোক বা নির্বাসনের দুঃখ দূরী-করণের জন্যই হোক, আমি মনে-মনে ঠিক করলাম, একদিক থেকে শুরু করে একে-একে সবগুলো বই পড়ে ফেলব, অবশ্য আমার স্কুলের লেখাপড়ায় অবহেলা না করে। কয়েকটি বই পড়বার পরই হাতে এল—"জাপানের গল্পগুচ্ছ"। তন্ময় হয়ে পড়লাম, এত ভালো লাগল যে মনে হল, আরো কিছু এজাতীয় বই পড়ব, তাই সেই বইয়ের পেছনের পৃষ্ঠায় যে কটি বইয়ের নাম ছিল, সেগুলো যত্ন করে টুকে নিয়ে আমার ছোটো হাতকাটা জামার এক পকেটে রেখেছিলাম এবং সেই জামা গায়েই গাড়ি ধরে কুমিল্লা গিয়ে-ছিলাম। সেই লিস্ট দৈবাৎ বড়দার হাতে পড়ে, আর তারি ফলে দেখতে হল তাঁর সেই অগ্নিমূর্তি।

এদিকে আমার ডিটেকটিভ উপন্যাসের পরই হাত পড়ল বঙ্কিমচন্দ্রে, ফলে সবার আগে আমার কপালে এল "কপালকুণ্ডলা"। প্ল্যান-মতো তাই পড়ে গেলাম। আমার অধ্যয়নের ব্যবস্থা আধুনিক ছিল বললে অতিশয়োক্তি হবে। ঘরে ছিল গোটা চারেক খাট। এক ধারে মেজের উপর চট পেতে কেরোসিনের ডিবি সামনে নিয়ে পড়তাম, মাঝে-মাঝে এক হাতে মশা তাড়াতে হত। রাত্তিরে চারদিক থাকত নিঝুম, মাঝে-মাঝে শেয়ালের ডাকছাড়া। তাই মনোনিবেশে কোনো ব্যাঘাত হত না।

বড়দা আমার বঙ্কিমচন্দ্র অধ্যয়নের কথা শুনলে কী বলতেন জানি নে, হয়তো খুশি হতেন না। তবে অন্তত এটুকু বুঝতেন যে আমার স্বভাব খেলো ছিল না বা পড়াশোনায় নিষ্ঠারও অভাব ছিল না।

ক্লাসে সব সময়েই প্রথম হতাম, সে খবর পেয়ে বড়দা বিন্দুমাত্র আনন্দ প্রকাশ করেন নি। বরঞ্চ মন্তব্য করলেন—'নিরস্ত পাদপদেশে এড়ণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে'। আর তা ছাড়া চলতি কথায়—'খালি বনে খাটাস বাঘ।' এখনো মনে আছে, এই দুই প্রবাদবাক্য শুনে আমার কী পরিমাণ অভিমান হয়েছিল। ভাবলাম, সবাই মিলে আমাকে পাঠিয়ে দিলে গ্রামে, সেখানে লেখাপড়ায় যতটুকু সম্ভব ভালো করে যাচ্ছিলাম, তারপর আমাকে দোষ দিলে গ্রামের স্কুলে পড়ি বলে।

আমার ক্ষুণ্ণ হবার কারণ ছিল যথেষ্ট, তবু পেছনের দিকে তাকিয়ে অনেক বছর পরে বুঝতে পেরেছিলাম, কেন আমাকে এমন অকরুণ কথা শুনিয়েছিলেন। আমার সম্বন্ধে হয়তো মনে-মনে বড়দার একটা বিশেষ দাবি ছিল। যদিও মুখ ফুটে কোনোদিন সে কথা আমাকে বলেন নি। সেই অগ্নিগুণে সবার কাছে দাবি করাই ছিল তাঁর স্বভাব—মানুষকে উৎসাহ দেওয়া ও তার কাছ থেকে দাবি করা, এ দুইয়ের মধ্যে তাঁর কাছে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। তাঁর অধ্যাপক-জীবনে সেই স্বভাব অবশ্য ষোলো আনা বদলে যায়। সবাইকে সব কাজে উৎসাহ দেওয়াই ছিল তখন তাঁর সবথেকে বড়ো আনন্দ।

তা ছাড়া সে সময়ে বড়দা ছিলেন কুমিল্লা জেলা স্কুলের ছাত্র আর সে স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন অভয় দাস। সারা বাঙলাদেশে তখন তাঁর নাম ছিল শিক্ষক, শাসক আর স্কুল-পরিচালক হিসেবে। ছাত্রদের দুরন্ত রাখার ও শিক্ষাব্রতে তাদের একনিষ্ঠ করে তোলার প্রধানতম উপায় তাঁর কাছে ছিল বেত্রাঘাত, নির্মম ভাবে, নিজের হাতে। ফলে অভয় দাস যে-স্কুলেই হেডমাস্টার হিসেবে যেতেন, সেখানেই ছাত্র ও শিক্ষক সবাই থাকত তাঁর ভয়ে সন্ত্রস্ত। আর ছাত্ররা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরীক্ষায় উচ্চস্থান দখল করে লাভ করত একরাশি স্কলারশিপ। বড়দার আমলেও তার কোনো ব্যতিক্রম হয় নি। তাঁর ক্লাসে উপরের দিকে ছিলেন দশ-বারোজন প্রতিভাবান ছাত্র। ম্যাট্রিকুলেশনের ফল যখন বেরুল তখন তাঁরা স্কলারশিপ দখল করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন[১]। তার বছর খানেক পরেই তাঁরা নতুন করে সবাইকে তাক লাগিয়েছিলেন সম্পূর্ণ অন্য কারণে। এই বলিষ্ঠ কর্মিষ্ঠ ও একনিষ্ঠ যুববৃন্দই ছিল সে অঞ্চলে বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রদূত। তাই অচিরে সবাই উধাও হলেন বন্দী হিসেবে রাজ-কারাগারে রাজদ্রোহিতার অভিযোগে।

বড়দার কাছে তাঁর জিলা স্কুলের তুলনায় কসবার স্কুল নগণ্য মনে হবে, সেটা আর বিচিত্র কী?

জুতোর বাক্সে পিস্তল

কিছু দিন পরে আবার ছুটি উপলক্ষে কুমিল্লায় আসি। যে-খাট আমি ব্যবহার করতাম, তার নীচে একদিন দেখি একটি জুতোর বাক্স সুতো দিয়ে বাঁধা। ভাবলাম, কী রকমের সুতো একবার খুলে দেখি। সুতো না-কেটেই বাক্সটা খুললাম—কই কোনো জুতো তো নেই, তার বদলে দেখি কাগজে মোড়া একটা অদ্ভুত জিনিস—লোহার তৈরি, কালো রঙ, বেশ ভারী: এক ফুট লম্বা হবে, তার এক দিক খানিকটা মোটা, আরেক দিক সরু। কিছুই বুঝতে পারলাম না। যাঁরা বাড়িতে ছিলেন তাঁদের ডেকে এনে জিনিসটা দেখলাম, এবং এটাকে কী বলে, এটা দিয়ে কী করা হয় জানতে চাইলাম। কেউ কিছু বললেন না, অথবা হয়তো বলেছিলেন—'এসব তোমার না জানলেও চলত।' ভাবলে অবাক হই, আমি তখন কত হাবা ছিলাম। পিস্তল কাকে বলে, আট-নয় বছর বয়সেও তা জানতাম না। এ যুগে সেটা অকল্পনীয়। হাঁটা-চলা-দৌড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গেই এখন বন্দুক-পিস্তলের সঙ্গে শিশুদের পরিচয় হয়ে যায়।

সেদিন বাড়িতে গুমট ভাব আরও বেড়ে গেল।

১. প্রবোধচন্দ্র যে-বার বৃত্তি পেয়ে ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করেন সেবার তাঁর ক্লাস হতে মোট এগারো জন বৃত্তি পেয়েছিলেন। —স.

সবাই চুপ। তারপর কী ঘটেছিল আমি স্বচক্ষে দেখি নি, শুধু সেজদা-মেজদার কাছে শুনেছি। বাবা সেই লৌহ-যন্ত্রটি নিজে লুকিয়ে নিয়ে যান মাইল খানেক দূরে, কুমিল্লা স্টেশনের কাছে, চুপি-চুপি, সন্ধেবেলা। সেখানে রেললাইনের পশ্চিমে অনেকটা পানায় ঢাকা একটি পুকুরে সেটি বিসর্জন দিয়ে আসেন। তারপর বড়দা যখন বাড়ি ফিরে এলেন—সেদিনই কিনা মনে নেই—তখন জুতোর বাক্স খালি দেখে রুদ্রমূর্তি ধারণ করলেন। সব শুনে তিনি বাবাকে নিয়ে যান রেল-স্টেশনের পাশে সেই পানায় ঢাকা পুকুরের পাড়ে। সেখানে ডুবুরি দিয়ে সে যন্ত্রটি উদ্ধার করে আনা হয়। বড়দা তখন শান্ত হলেন। কিন্তু বাড়ির গুমট ভাব কাটল না। বাড়িতে সবাই যেন কিছুদিন ধরে বৃহত্তর দুঃসংবাদ বা দুর্ঘটনার জন্য মনে-মনে প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

বোধহয় তার কয়েক মাস পরেই আমাদের কুমিল্লার বাড়িতে খানাতালাস হয়। সে উপলক্ষে কলকাতা থেকে আসেন স্বয়ং মিস্টার কোলসন, (Coleson) তখন উনি ছিলেন ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ, কমিশনার চার্লস টেগার্টের দক্ষিণ হস্ত। তাই থেকে বোঝা যায়, সে সময়ে বড়দার উপর গোয়েন্দা-বিভাগের কী পরিমাণ নজর ছিল। শুনেছি, বেশ কিছু কাল ধরেই বড়দা চট্টগ্রাম বিভাগে অনুশীলন সমিতির নেতা ছিলেন। তাঁকে ঠিক কোন্ তারিখে কোথায় গ্রেপ্তার করা হয় আমার সঠিক জানা নেই, তবে তখন তিনি কুমিল্লার বাইরে ছিলেন, সম্ভবত কলকাতায়।[২]

কেন গ্রামবাস

যে যুগে তরুণদের সাধনা ছিল গ্রাম থেকে শহরে যাবার, শিক্ষাদীক্ষার সুযোগসুবিধার জন্য, সেই যুগেই আমাকে যেতে হল উলটো দিকে—কুমিল্লার মতো প্রগতিশীল শহর ছেড়ে দূরে এক নগণ্য গ্রামে। এ ভাগ্যবিপর্যয় কেন? সে প্রশ্ন বহুবার আমার মনে জেগেছে। নানা রকমের কারণ শুনেছি, যথা: ছোটো ভাই আমার সঙ্গে ঝগড়া করে, দুজনে ছাড়াছাড়ি হলে গৃহশান্তির পক্ষে ভালো হবে। মাসির পাঁচ মেয়ে, ছেলে নেই; তাই একটি ধার-করা ছেলেও বাড়িতে থাকলে সবাই খুশি হবে।

গিরিধারী পাঠশালার তৃতীয় শ্রেণী থেকে পাশ করে বার হলাম। বড়দাও ছোটোবেলায় ওই পাঠশালাতেই পড়েছিলেন। কুমিল্লায় কোনো হাই স্কুলে ভরতি হলে আমাকে স্কুলের মাইনে দিতে হবে—মাসে আড়াই টাকার মতো। কসবা স্কুলে ভরতি হলে সে খরচটা বেঁচে যাবে, মেসো ওখানকার স্কুলে মাস্টার বলে।

আপাতদৃষ্টিতে কথাগুলি যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে এগুলো বরাবরই মনে হত কষ্টকল্পিত, অর্থাৎ যুক্তি নয়, অজুহাত বলে। আমাদের কুমিল্লার বাড়িতে অনেক সময়েই গ্রামের আত্মীয়, বিশেষ করে জ্যেঠতুতো ভাইরা, থেকে স্থানীয় স্কুলে পড়াশুনা করেছে, তাদের বেলা স্কুলের মাইনে দিতে বাবা তো কোনো কার্পণ্য করেন নি।

আসল কারণ কী তা সঠিক জানবার কোনো উপায় ছিল না, কোনোদিন চেষ্টাও করি নি। তবে অনেকটা অনুমান করতে পারি, প্রমাণ ছাড়া। বড়দার বিপ্লবজীবনের সূত্রপাত হয় আনুমানিক ১৯১১ কি ১৯১২ সনে। বাড়ির লোকের কাছে এ জাতীয় ব্যাপার খুব বেশিদিন ষোলো আনা গোপন রাখা সম্ভব হয় নি। বড়োরা বোধহয় কিছুদিনের মধ্যে তার আঁচ করেছিলেন, ফলে পরিবারে জেগেছিল একটা আশঙ্কা আর আতঙ্ক। মনে-মনে হয়তো একটা ভয়ও ছিল। বিশেষ করে মা-বাবার মনে, যে একদিন আমিও বড়দার অনুকরণ বা অনুসরণ করতে পারি।

তবু আর তিন ভাইকে ছেড়ে গ্রামবাসের জন্য আমাকে বাছাই করা হল কেন? মেজদা সেজদা আমার থেকে অনেকটা বড়ো ছিলেন, আর ছোটোভাই তো ছোটো এবং সবথেকে আবদারে। তাই আমাকেই যোগ্যতম মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। সঙ্গে হয়তো ছিল আরো একটি কারণ। আমি ছিলাম অনেকটা বড়দার ছাঁচে ঢালা। তাই 'বিপথে' যাবার আশঙ্কাটাও আমার বেলায় হয়তো ছিল অনেক বেশি।

মাতুলক্রম:

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে আমার বড়োমামা উপেন্দ্রচন্দ্র নিয়োগীর কথা। মাঝে-মাঝে মনে হয় এ ব্যাপারে হয়তো তাঁরও হাত ছিল। তিনি ছিলেন অনেক দিকে আমাদের অভিভাবকের মতো। কোনো সমস্যা দেখা দিলে মা-বাবা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতেন, তাঁর পরামর্শমতো চলতেন। সব ভেবে তিনিই হয়তো সে সময়ে মা-বাবাকে বলেছিলেন যে আমাকে কিছুদিন দূরে সরিয়ে রাখলেই ভালো হয়।

লোকে বলে—'নরাণাং মাতুলক্রমঃ'। অনেক সময় মনে হয়, একথার মধ্যে যথেষ্ট সত্যতা আছে। বড়োমামা আর বড়দার মধ্যে একটা বিশেষ সাদৃশ্য ছোটোবেলা থেকেই লক্ষ করে এসেছি। দুজনেরই প্রতিভা ছিল সর্বতোমুখী, দুজনেই ছিলেন বিদ্যার জাহাজ। তাঁরা ভ্রমণপ্রিয় ছিলেন না, তবে ঘরে বসেই তন্নতন্ন করে খবরের কাগজ পড়ে সারা দুনিয়ার খোঁজ-খবর রাখতেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে দুজনেরই ছিল অসাধারণ রাগ। বড়োমামাকে ভয় করত মা-বাবা থেকে আরম্ভ করে সবাই। কেউ তাঁর মতের বিরুদ্ধে কিছু বলার বা করার সাহস করত না। ছোটো হলেও আমি ছিলাম তাঁর বিশেষ স্নেহের পাত্র, আর সেজন্যই তাঁর মতের সঙ্গে সায় না দিলেও তিনি কিছু মনে করতেন না, বরঞ্চ সেজন্য খুশিই হতেন।

বড়োমামার বিশেষ খ্যাতি ছিল অঙ্কবিশারদ হিসেবে। অঙ্কের প্রতি বড়দারও আকর্ষণ ছিল প্রচুর, সঙ্গে-সঙ্গে ছিল একটা জন্মগত প্রতিভা। বিপ্লবজীবন এসে তাঁর ছাত্রজীবনকে অভিভূত না করলে অঙ্কশাস্ত্রই হয়তো তাঁর সাধনার প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়াত। সে সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল বলে মনে করি।

বড়োমামা কৃতিত্বের সঙ্গে সব পরীক্ষা পাশ করে এম-এ-র জন্য ঢুকলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, আর সেই সময়েই হল তাঁর ভাগ্যবিপর্যয়। পরীক্ষা পাশ করবার কোনো ভাবনা তাঁর ছিল না। বিশেষ চেষ্টা না করেই ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট হবেন, সে সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস এত দৃঢ় ছিল যে শুনেছি সেজন্য মাঝে-মাঝে ক্লাস কামাই করে অন্যদিকে মন দিতেন। একবার ক্লাসে নাকি তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর কোনো ছাত্রবন্ধু 'প্রকসি' দিয়েছিলেন, ফলে তাঁকে বিশ্ব-বিদ্যালয় হতে বিতাড়িত করা হয়। শেষ ছাত্রজীবনের এই সামান্য ত্রুটির জন্য তাঁকে অসামান্য শাস্তি ভোগ করতে হল, তিনি কোনোদিন কোনো সরকারি কলেজ বা প্রতিষ্ঠানে কাজ করবার সুযোগ পেলেন না। বহুকাল তিনি ছিলেন কুমিল্লায় একটি ছোটো টেকনি-ক্যাল ইন্‌স্টিটিউটের প্রধান পরিচালক। সেখান থেকে তিনি যান কুমিল্লায় ঈশ্বর পাঠশালায় ডেপুটি হেডমাস্টার হয়ে। স্কুলের নবম আর দশম শ্রেণীতে অঙ্ক পড়ানোই ছিল তাঁর প্রধান কাজ। তবে প্রয়োজনমতো তিনি অন্য বিষয়ও পড়াতেন। বড়ো-মামার মতো বড়দাকেও তাঁর কর্মজীবন কাটাতে হয়েছে সরকারি জগতের বাইরে, যদিও অন্য কারণে।

দাবাখেলায় মামা ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। শুনেছি এবং কিছু-কিছু দেখেওছি যে ছুটির দিনে অনেক দূর থেকে লোক আসত তাঁর সঙ্গে দাবাখেলার জন্য। কোনো-কোনো সময় খেলা চলত অষ্ট প্রহর। বড়দার এজাতীয় কোনো নেশা ছিল না এবং তা পছন্দও করতেন না। তবে ছাত্রজীবনে গুলিখেলা খুব ভালোবাসতেন আর সে খেলায় তাঁর দক্ষতাও ছিল অসাধারণ। মনে পড়ে, মেজদা-সেজদার সঙ্গে ছোটো বেলায় তাস খেলেছি ভয়ে-ভয়ে, একান্ত গোপনে, বড়দার চোখের আড়ালে।

এ ক্ষেত্রে প্রসঙ্গত বলা উচিত, বড়োমামা ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস-চ্যানসেলার স্বর্গত সত্যেন সেনের শ্বশুরমশাই।

২। প্রবোধচন্দ্র গ্রেপ্তার হন ১২ সেপটেমবর, ১৯১৬ তারিখে। —স.

বিস্মৃত স্মৃতি

উপরে বড়দার যে-ছবি ফুটে উঠেছে সেটা একতরফা। শিশুবেলায় তাঁর কাছ থেকে অনেক স্নেহ-ভালোবাসা পেয়েছি, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। অন্যের কাছে তা শুনেছি, বিশেষ করে মার কাছে। মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন, অতি শিশুবেলা, অর্থাৎ বছর পাঁচেক আগেকার স্মৃতি নাকি মন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সেই শূন্যতার মাঝখানে জেগে থাকে শুধু দু-একটা বিশেষ ঘটনা—সারা জীবনের স্মৃতিস্তম্ভরূপে। মনে হয় কথাটার মধ্যে সত্যতা আছে। অন্তত আমার বেলা যে তাই হয়েছে, তা নিজের মনে খানাতল্লাসি করেই সহজেই বুঝতে পারি।

শিশুবেলার একটি ঘটনা আজো ভুলতে পারি নি। তখন সবেমাত্র স্কুলে যাওয়া শুরু করেছি, হাতে খড়ির অল্প পরেই। স্কুল মানে প্রাথমিক পাঠশালা, প্রাইভেট, একজনমাত্র মাস্টার, জনা আটেক ছাত্র—তাদের সবার বয়স আমারি মতো। গরমের দিনে সকাল সাড়ে ছয়টায় ক্লাস শুরু হত। একদিন ঘুম থেকে উঠে আমার অদম্য কান্না এসে গেল। বড়দা ছুটে এলেন, কান্নার কারণ জানতে চাইলেন। 'অনেক বেলা হয়ে গেছে, আমার ক্লাস কামাই হয়ে গেল।' শুনে বড়দা হেসে বললেন, 'কিছু হবে না, আমি তোমাকে নিজে স্কুলে নিয়ে যাব।' তক্ষুনি বই শ্লেট নিয়ে বড়দার হাত ধরে তালপুকুরের পশ্চিম-দক্ষিণ পাড় দিয়ে কিছু দূর এগিয়ে স্কুলে গিয়ে হাজির হলাম। সব শুদ্ধ মিনিট ছয়েকের পথ। গিয়ে দেখি খালি বেঞ্চি, খালি চেয়ার, কেউ নেই। অবাক হয়ে গেলাম। তখন বড়দা আমাকে বোঝালেন—'এই ছাখ ওখানে একটা আলো জ্বলছে। এখন সকাল নয়, সন্ধ্যা হয়ে আসছে। তুমি তো দিনের ঘুম থেকে উঠেছ, রাতের ঘুম থেকে নয়। তোমার স্কুল কামাই হয় নি।' তখন নিশ্চিন্ত হলাম আর বড়দার হাত ধরে নেচে-নেচে বাড়ি ফিরে এলাম।

তরুণ শৈশবে বড়দার কাছে অনেক স্নেহ-ভালোবাসা পেয়েছিলাম। স্মৃতির ভাণ্ডারে তার নিদর্শন সামান্য। কিন্তু অন্তরের অনুভূতিতে তা রয়েছে অপরিমেয়। তারপর তাঁর জীবনে হঠাৎ এল সেই অগ্নিযুগ, দেশোদ্ধারের দুর্জয় আহ্বান নিয়ে। তার সঙ্গে এল নির্মম আত্মবলিদানের পালা। তখন আর সবকিছুই তাঁর কাছে হল অবান্তর—স্নেহমমতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন সবই। সেই বিদ্রোহারি নিবেদিত হল সুদীর্ঘ কারাবাসে। তারপর আবার ধীরে-ধীরে ফিরে পেলাম আসল বড়দাকে।

মৌন আলাপ

অনেক লড়াই করে আমি ফিরে এলাম কুমিল্লায় এবং ভরতি হলাম ওখানকার ঈশ্বর পাঠশালার সপ্তম শ্রেণীতে। প্রায় একই সময়ে বড়দাও ফিরে আসেন কুমিল্লায়, তবে বাড়িতে নয়, জেলখানায়। তখনকার দিনগুলির ছবি এখনও আমার মনে ভাসে, মনে হয় যেন মাত্র সেদিনের কথা। বড়দার সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি ছিল মাসে একবারের মতো। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে চতুর্থ হলেও সব ব্যবস্থা করবার ভার পড়ত আমার উপর। অনুমতির জন্যে আমাকে যেতে হত পুলিশের আড্ডায় অর্থাৎ সি-আই-ডি বিভাগে। সেখানে দেখা হত বিশেষ করে দুজন অফিসারের সঙ্গে। কোট-প্যান্ট পরা, কোমরে পিস্তল ঝোলানো। ততদিনে পিস্তলের চেহারা আর তাৎপর্য সম্বন্ধে এমন-কী আমারো একটা ধারণা হয়েছিল। তবু তাঁদের আমি ভয় করি নি, বরঞ্চ সহজভাবে হাসিমুখে ওঁদের সঙ্গে কথা বলেছি। বোধহয় সেজন্যই ওঁরা আমার সঙ্গে খুব ভালো, এমন-কী সস্নেহ ব্যবহার করতেন। তাই তাঁদের কাছ থেকে বড়দাকে দেখতে যাবার অনুমতি পেতে আমার কোনোদিন বিন্দুমাত্র অনুরোধে হয় নি।

তারপর মা-বাবাকে নিয়ে যাত্রা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে তালপুকুরের পুব পাড় দিয়ে বালিকা বিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে সেই প্রকাণ্ড ধর্মসাগরের পশ্চিম পাড় দিয়ে আরো কিছুদূর উত্তর দিকে এগিয়ে

গিয়ে হাজির হতাম এক উঁচু দুর্ভেদ্য দেয়াল-ঘেরা জেলখানার লৌহফটকে। ছোটো একটা জানালা দিয়ে পুলিশের অনুমতিপত্র দেখাবার পর দরজা খুলে দেওয়া হত, আমরা গিয়ে বসতাম ফটকের পাশেই একটি ছোটো ঘরে। সে ঘরের আসবাবপত্র ছিল গোটা চারেক কাঠের টুল আর চেয়ার। 'কয়েদী'-দর্শনের পক্ষে সেটাই যথেষ্ট বলে মনে করা হত।

কিছুক্ষণ পরে অনেক ভিতর থেকে আসতেন বড়দা। আমার যতদূর মনে পড়ে, বড়দার জন্য বাড়ি থেকে কিছু নেওয়া নিষিদ্ধ ছিল, তাই আমরা যেতাম খালি হাতে। বলা বাহুল্য, মার পক্ষে সেটা ছিল বিশেষ কষ্টদায়ক। বড়দার পোশাক ছিল সাধারণ আর স্বাভাবিক—পরনে ধুতি, গায়ে শার্ট, পায়ে চটি। বড়দা মা-বাবাকে প্রণাম করতেন, আমিও যথারীতি প্রণাম করতাম। তারপরে হত কুশলপ্রশ্ন। মা অবশ্য খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে কিছু-কিছু প্রশ্ন করতেন। বড়দার কাছে বোধহয় সেগুলি অবান্তর মনে হত, তাই যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত জবাব দিতেন। আমার পড়াশুনা সম্বন্ধেও বড়দা দু-একটা প্রশ্ন করতেন, তবে আধ ঘণ্টা সময়ের অধিকাংশ সময় কাটত নির্বাক ভাবে—উচ্ছ্বাস দমন আর অশ্রু-সংবরণের চেষ্টায়। তাই সেই ভিজিটগুলি ছিল যেমন মৌন, তেমনি মর্মন্তুদ।

বড়দা চলে যেতেন জেলখানার ভিতরে, অনেকটা দূরে। তারপর বিকট শব্দ করে খুলে দেওয়া হত বৃহৎ লৌহফটক, আমরা বেরিয়ে আসতাম গম্ভীর মুখে, নিস্তব্ধ ভাবে। আবার সেই লাল সড়ক ধরে ধর্মসাগরের কোণে এসে তার পশ্চিম পাড় দিয়ে, বালিকা বিদ্যালয়ের পাশ কাটিয়ে তালপুকুরের পুব পাড় দিয়ে ফিরে আসতাম নিজেদের বাড়িতে, একান্ত ধীরে-ধীরে, প্রায় নিঃশব্দে। মা গ্রহণ করতেন শয্যা, বাবা মন দিতেন বাগানের কাজে আর পুজা-অর্চনায়। আর আমি কী ভাবতাম বা কী করতাম ঠিক মনে নেই।

শুধু জানি তখন আমার মনের মধ্যে তোলপাড় করত নানা জিনিস। ঝড়ের দুর্যোগে ক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো। সেই মর্মান্তিক জিনিসগুলো মনের উপর যে গভীর দাগ কেটে গিয়েছিল, তার স্পষ্টতা ছ-সাত দশকেও বিশেষ কমে নি।

২ : সমর্পণ

একদিন মা আমাকে নিয়ে গেলেন এক গেরুয়াধারী, মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসীর কাছে। ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করে বললেন, 'আমার এ ছেলেকে আপনি সাধু করে নিয়ে যান, তাহলে আমি খুব খুশি হব।' সন্ন্যাসী একটু চমকে উঠলেন, হাসলেন, কিন্তু 'তথাস্তু' বললেন না। বরঞ্চ মন্তব্য করলেন—'এ বড়ো কঠিন পথ, সবার উপযোগী নয়।' তবে সন্তান সম্বন্ধে ধর্ম-পরায়ণ মাতার অমন উচ্চাদর্শ দেখে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করলেন।

এই উৎসর্গের মূলে কি নিছক ভক্তি ছিল, না একটা মর্মান্তিক ভীতি, যে আমিও হয়তো একদিন বিপ্লবের পথ ধরে গিয়ে বন্দী হব রাজকারাগারে? মার সঙ্গে এ নিয়ে আমার কোনো কথা হয়নি। তার দরকারও ছিল না। কারণ বছর দুয়েকের মধ্যেই নিঃসন্দেহে প্রমাণ পাওয়া গেল যে এই সম্প্রদানের পিছনে ছিল ধর্মভক্তি নয়, রাজদ্রোহিতার ভীতি।

সেই সন্ন্যাসীর নাম ছিল শ্যামসুন্দরানন্দ, আমাদের কাকা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেনের গুরুভাই। দুজনেরই গুরু ছিলেন স্বামী নিত্যানন্দ। কলকাতার মহানির্বাণ মঠের প্রতিষ্ঠাতা। সে মঠ হল রাসবিহারী অ্যাভিনিউর উপরে, লেক মার্কেটের কাছে। এখনো তা সন্ন্যাসীদের একটি বিশেষ আস্তানা হিসেবে পরিচিত। ট্রামে করে যেতে অনেক সময়ই দেখা যায় গেরুয়া-পরা সাধুরা ওখানে ঘোরাফেরা করছেন। ফুটপাত থেকে মাঝে-মাঝে কীর্তন বা ভজনের ধ্বনিও শোনা যায়। তখনকার দিনে অবশ্য সে অঞ্চল ছিল

গাছপালা আর জঙ্গলে ঢাকা। মহানগরীর এত কাছে থেকেও তাই এই আশ্রমটি ছিল অনেক দূরে। এ আরণ্যক আচ্ছাদন তার আধ্যাত্মিক আকর্ষণকেও হয়তো গভীর করে রেখেছিল।

কাকা ছিলেন আমাদের গ্রাম চুস্টার দূরসম্পর্কের জ্ঞাতি আত্মীয়। তবে বাবা-কাকা দুজনেই ১৯০০ সনের কাছাকাছি কুমিল্লায় তালপুকুরের উত্তর পাড়ে বাড়ি তৈরি করেন। দুই বাড়ি ছিল পাশাপাশি। মাঝে কোনো বেড়া ছিল না। দুই পরিবারে ছিল অবাধ আনাগোনা। কাকার বাড়ির পুকুরই ব্যবহার করা হত আমাদের সংসারের দৈনন্দিন সব কাজের জন্য। তাই সম্পর্কে দূরের হলেও তাঁকে আমরা একান্ত আপন বলে মনে করতাম, আর 'কাকা' বললে তাঁকেই বুঝতাম।

তিনি ছিলেন কুমিল্লার একজন নামকরা উকিল। সঙ্গে-সঙ্গে বিদ্বান আর বিজ্ঞ বলে শহরে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। আইনের সঙ্গে-সঙ্গে চলত তাঁর গীতা ও শাস্ত্র-পাঠ। তা ছাড়া কাকা ছিলেন একান্ত ধর্ম-পরায়ণ, আর তাঁর ধর্মজীবনের এক বৃহদংশ ছিল সাধু-ভক্তি আর সাধুসেবা। সব জড়িয়ে কাকার প্রভাব আমাদের বাড়ির উপর ছিল প্রচুর। আমরা সবাই তাঁকে যেমনি শ্রদ্ধা তেমনি মান্য করতাম। কাকার কোনো কথা কোনোদিন অবহেলা করবার সাহস করি নি।

মা-বাবা ছিলেন আরেক গুরুর শিষ্য। তাঁর নাম গম্ভীরানন্দ, তাঁর আশ্রম ছিল মধ্যপ্রদেশে। এ গুরুর সবথেকে বড়ো বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তিনি সন্ন্যাসধর্ম প্রচার করতেন না। সংসারে থেকেই দৈনন্দিন কর্তব্য পালন করে ও ধর্মজীবন যাপন করে সবাই শান্তি, আনন্দ ও মুক্তি লাভ করতে পারে—এই তাঁর দীক্ষার মূলমন্ত্র। বাড়িতে মা-বাবার গুরুভাই-বোনদের সমাগম হত। তাঁরা সবাই ছিলেন "সংসারী"।

বড়দা নিজেকে বলতেন নাস্তিক, জীবনের শেষ পর্যন্ত ছিলেনও তাই। তিনি চলে গেলেন বিপ্লবের পথে, তারপর উধাও হলেন বাড়ি থেকে। ফলে বাড়িতে বেড়ে গেল পুজা-অর্চনা, ধর্মকর্ম, সাধুসেবা,—যদিও মা-বাবা কখনো কিছু বলেন নি, তবু অনায়াসে ধরে নেওয়া যায় যে তাঁদের সে সময় সবথেকে বড়ো কাম্য ছিল নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি নয়, বড়দার জেলখানা থেকে মুক্তি। বিপ্লবের তরঙ্গ আর ধর্মের তরঙ্গ মিলে আমার জীবনে তখন এক বিশেষ আলো-ড়নের সৃষ্টি করেছিল, তার ঘাতপ্রতিঘাত আর দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ থেকে অব্যাহতি পেতে লেগেছিল বেশ কয়েক বছর।

এদিকে পাশের বাড়িতে লেগে ছিল বারো মাসে তেরো পার্বণ, আর তার সঙ্গে হত সাধুসমাগম। সন্ন্যাসীরা প্রায় এসে হাজির হতেন, অনেক সময় বেশ কয়েকজন একসঙ্গে। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল সংসারী শিষ্যদের জন্য আধ্যাত্মিক খোরাক জোগানো, আর সঙ্গে-সঙ্গে নূতন শিষ্য জোগাড় করা। তাঁদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল তরুণদের উপর। কী করে কয়েক-জনকে বাছাই করে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করে আশ্রম-বাসী করে তোলা যায়, সেটাই ছিল তাঁদের চরম লক্ষ্য আর পরম কাম্য।

কাকার বড়ো ছেলেমেয়েরা সবাই তাঁর নির্দেশমত গুরুদের কাছে যথারীতি দীক্ষা গ্রহণ করে। যতদূর মনে পড়ে, সবাই ছিল শ্যামসুন্দরানন্দের শিষ্য। কাকার তিন ছেলে আর দুই মেয়ের মধ্যে গুরুর সব-থেকে নজর ছিল বড়ো ছেলের উপর। তাঁর ডাকনাম ছিল শিব, ভালো নাম ছিল শৈলেশ, আমার থেকে দু বছরের বড়ো। আমারও একটা ডাকনাম ছিল—শম্ভু। বাড়ির সবাই চিরদিন সেই নামই ব্যবহার করতেন। বড়দাও শেষ পর্যন্ত আমাকে সেই নামেই ডাকতেন, যদিও তিনি নিজের ডাকনাম 'গণেশ' অপছন্দ করতেন আর বহুকাল আগেই তা বর্জন করে-ছিলেন। অবশ্য বড়দা সবথেকে বড়ো বলে তাঁর বেলা ডাকনাম ব্যবহারের কথা বিশেষ ওঠে না।

'শিবশম্ভু'—এই দ্বন্দ্ব সমাস তখন বিশেষভাবে

চালু ছিল। নানা জায়গায় তা শোনা যেত। তার কারণও ছিল সহজ। শিবদা ছিলেন আমার সোদর-প্রতিম। আমরা থাকতাম একই সঙ্গে, একই ঘরে। দুজন যেতাম দুই স্কুলে, তা ছাড়া দিনেরাতে অধিকাংশ সময় আমরা কাটাতাম একসঙ্গে। আমরা ছিলাম একই গুরুর শিষ্য। কিন্তু তারও চেয়ে মস্ত বড়ো ছিল আমাদের চিন্তাধারার সামঞ্জস্য, সব কাজে নিষ্ঠা আর একাগ্রতা, অধ্যয়নে অধ্যবসায় আর ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা এবং রঙিন জল্পনা-কল্পনা। ফলে আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের এক নিগূঢ় ও অবিচ্ছেদ্য বন্ধন। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, অদৃষ্টের চক্রান্তে কয়েক বৎসরের মধ্যেই সে বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

৩ : চতুর্ধুরন্ধরের তর্কবিতর্ক

শিবদা ছিলেন কুমিল্লা জিলা স্কুলের ছাত্র। বড়দাও বছর সাতেক আগে সেই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। শিবদা ক্লাসে বরাবর প্রথম হতেন, প্রতিভাবান ছাত্র বলে শহরে তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর সহপাঠী বন্ধু ছিলেন রেবতী বর্মণ আর গিরীন্দ্র চৌধুরী। লেখাপড়ায় আর বিদ্যায় বুদ্ধিতে দুজনেরই প্রচুর সুনাম ছিল। ক্লাসে সব সময়েই তাঁরা শিবদার নীচেই—দ্বিতীয় কি তৃতীয় স্থান দখল করতেন। আমি পড়তাম অন্য স্কুলে, ঈশ্বর পাঠশালায়, তাঁদের থেকে দুই ক্লাস নীচে। বয়সেও তাঁদের চেয়ে দু বছরের ছোটো ছিলাম, তবু তাঁরা আমাকে তাঁদের সমবয়সী বলেই মনে করতেন।

কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের চারজনকে নিয়ে গড়ে ওঠে ছোটো একটি দল বা সমিতি—a gang of four। যৌবনের প্রেরণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল ভবিষ্যতের স্বপ্ন আর বহুমুখী কল্পনা। কুমিল্লায় তখন বিপ্লবের হাওয়া বইছিল পুরোদমে, আর দেশসেবার আহ্বান শোনা যেত পথে-ঘাটে, নানা কণ্ঠে, বিচিত্র ভঙ্গিতে। সেই উন্মাদনার দিনে আমাদের কী কর্তব্য সে প্রশ্ন নিয়ে আমাদের মধ্যে মাসের পর মাস চলেছিল বহু গবেষণা আর তর্কবিতর্ক। তখনকার স্মৃতি এখনো মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। মনে হয় সব যেন মাত্র সেদিনের কথা।

আমাদের মিটিং হত ঘন-ঘন, লোকচক্ষুর অন্ত-রালে, আর সেজন্য আমরা চলে যেতাম শহর থেকে পাঁচ-ছ মাইল দূরে, অধিকাংশ সময়েই ময়নামতী পাহাড়ে। চার জনেই সাইকেলে করে যেতাম, কিন্তু একসঙ্গে নয়; পাছে কর্তৃপক্ষের মনে কোনো সংশয়ের উদ্রেক হয়, সেই আশঙ্কায় আমরা একা-একা, একটু ঘুরে-ফির, পাহাড়ের গায়ে একান্ত নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে যথাসময়ে হাজির হতাম।

শীগগিরই আমাদের আলোচনায় সবথেকে বড়ো প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল একটি—বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় দেশোদ্ধারের জন্য আমাদের কী করা উচিত আর কী করে তার জন্য যত শীঘ্র সম্ভব প্রস্তুত হতে পারি। স্বাস্থ্যচর্চা ও যথারীতি লেখাপড়া করা সম্বন্ধে কোনো মতভেদ ছিল না, কিন্তু গিরীন আর রেবতীর কাছে তা যথেষ্ট মনে হয় নি। এই মামুলি একঘেয়ে কর্তব্যের বাইরে আমাদের তক্ষুনি হাতে-কলমে কিছু করা একান্ত দরকার, তাদের কাছে বার-বার সে-কথা শুনেছি।

গিরীন ছিল মূর্তিমন্ত অগ্নিদূত, আত্মোৎসর্গের জন্য উদ্যত, আত্মসংযমের কথা তার কাছে ছিল নিতান্তই অবান্তর। গিরীশ প্রস্তাব তুলল, আমাদের বেছে-বেছে কর্মী জোগাড় করতে হবে আর তাদের নিয়ে অনুশীলন বা যুগান্তর দলের মত জাতীয় দল গড়ে তুলতে হবে। শুধু তাই নয়, আমাদের আগরতলা গিয়ে দেখতে হবে সেখানকার অরণ্যে কোথায় আমরা গোপনে একটা জায়গা নেবার ব্যবস্থা করতে পারি। উদ্দেশ্য, সেখানে অবিলম্বে কুচকাওয়াজ শুরু করে দেওয়া, যেন পিস্তল-চালনায় সহজে হাত পাকাতে পারি। এই প্রথম পর্ব সমাপ্ত হলে শুরু হবে আমাদের কর্মযজ্ঞ, দেশের নানা জায়গায়, নানা ভাবে।

আমাদের চারজনে মিলে তখন সে পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।

রেবতীর উত্তেজনা ছিল একটু নীচু স্তরের, মাত্র কয়েক ডিগ্রী নীচে। তাই গিরীনের সঙ্গে মোটের উপর সে ছিল একমত। দরকার হলে দুজনেই স্কুল ছেড়ে দিয়ে এই সংগঠনের কাজে নিজেদের সব শক্তি আর সময় নিয়োগ করার জন্য প্রস্তুত ছিল। শিবদা মোটের উপর চুপ করে সব শুনতেন আর মাঝে-মাঝে আমার দিকে তাকাতেন। বয়সে ছোটো হলেও আমার মতামতের উপর তাঁর আস্থা ছিল গভীর। অনেক ব্যাপারেই পরামর্শ দেবার ভার এসে পড়ত আমার উপর।

গিরীন আর রেবতীর প্রস্তাবে আমি বিন্দুমাত্র সায় দিতে পারি নি। বলতাম, আত্মত্যাগ করাই তো সবথেকে বড়ো কথা নয়, সে ত্যাগের ফলে দেশের কী লাভ হল, সেটাই তো হল আসল কথা। আমরা তো নিজের চোখে দেখেছি কত প্রতিভাদীপ্ত তরুণ জীবন দেশসেবার অকাল উন্মাদনায় পড়ে বিব্রত বিধ্বস্ত হয়েছে। আরো বলতাম, দেশসেবা সহজ কাজ নয়, তার জন্য প্রয়োজন সুদীর্ঘ সাধনার। সেই বৃহৎ কর্মযজ্ঞের জন্য আমাদের তৈরি হতে হবে সেটাই হল আমাদের সর্বপ্রধান কর্তব্য। এই সুদীর্ঘ সাধনায় আমরা কী করে পরস্পরকে সাহায্য করতে পারি, সবার আগে আমাদের তাই ভেবে দেখতে হবে।

অনেক জোর দিয়ে বহুবার এ কথা বলেছি যে, দেশসেবার জন্য মানুষের তৈরি হতে লাগে বহু বৎসর। পরিপক্ক জীবনে সত্যিকারের দান ও সেবার জন্য বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় না। দৃষ্টান্ত হিসেবে তখন কয়েকবারই চিত্তরঞ্জন দাশের কথা বলেছি। পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি দেশের কাজের জন্য নানাভাবে তৈরি হয়েছিলেন, তারপর যখন গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন শুরু হল তখন তিনি সব ছেড়ে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এই অল্প দিনের মধ্যে চিত্তরঞ্জন সারা দেশকে কিভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন তা তো আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। আমাদেরও সেই দূরদৃষ্টি নিয়েই চলতে হবে। দেশসেবার আদর্শ চোখের সামনে রেখে তার জন্য নিজেকে তৈরি করাই হল বর্তমানে আমাদের সবথেকে বড়ো দেশসেবা।

আমার মন্তব্যের শেষে মনে করিয়ে দিতাম গুরু গোবিন্দের কথা—'বন্ধু, তোমরা যাও ফিরি ঘরে।'—কারণ এখনো সাধনা সমাপ্ত হয় নি; এখনো কর্ম-সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় আসে নি। আমাদেরও গুরু গোবিন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে হবে।

শিবদা আমার যুক্তি ষোলো-আনা সমর্থন করতেন, গিরীন-রেবতীও আমার কথা মন দিয়ে শুনত, কখনো তা ঠিক অগ্রাহ্য করত না। কিন্তু তাদের আসল পরিচালক ছিল যুক্তিবিবেচনা নয়, অন্তরের অদম্য আবেগ। ফলে তাদের মনে ছিল প্রচণ্ড দ্বিধা।

আমাদের এ আলোচনা চলেছিল ১৯২০-২১ সনে, অর্থাৎ ৬৭-৬৮ বৎসর আগে। তখন যা বলেছিলাম, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে তার সত্যতা আরো বিশেষ করে মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করেছি। যৌবনের প্রারম্ভে আমার এই আত্মসংযম ও দূরদৃষ্টি বা অকালপক্বতা কোথা থেকে এসেছিল, তা অবশ্য বোঝা কঠিন নয়। সেই একটানা তিন বছর গ্রামবাস, স্কুল থেকে ধার করে সহজ কঠিন নানা বই নির্বিচারে অধ্যয়ন, কল্পনারাজ্যে অবাধ বিচরণ, আর শহরের সব উন্মাদনার বাইরে আপনমনে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা—সব কিছুই আমার অকালপক্বতায় সাহায্য করেছিল সন্দেহ নেই।

তারপর এল রবীন্দ্রযুগ। রবীন্দ্রনাথের লেখা তখন থেকেই দিনের পর দিন মনের খোরাক জুগিয়েছে। তাঁরই কাছে শিখেছিলাম সত্যিকারের দেশসেবা আত্ম-বলিদানে নয়। আত্মসংযম করে সৃষ্টির কাজে ও দেশ-সংগঠনে আত্মনিয়োগ করাই ছিল আসল দেশসেবা। তাঁর সেই বাণী স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে গ্রহণ করেছিলাম।

রবীন্দ্রনাথের এ আদর্শ বা আদেশ ব্রতরূপে গ্রহণ করা আমার পক্ষে তখন একান্তই সহজ ছিল আরো

একটি মস্ত বড়ো কারণে। চোখের সামনে ছিল বড়দার জলন্ত দৃষ্টান্ত—তাঁর বিপ্লব-জীবন, নিষ্ঠুর আত্মত্যাগ ও সুদীর্ঘ কারাবাস। দেশের জন্য কঠিন প্রয়াস আর প্রতিদানে কঠোর শাস্তি। নির্ভীক অস্ত্রধারী বিপ্লবীদের বীরত্ব মর্মস্পর্শী হোক না কেন, তার ফলে ইংরেজের সিংহাসন টলবে না, শুধু নিজেদেরই নির্যাতিত হতে হবে, সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না।

আর ঠিক এই সময়েই এল গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন, সারা দেশে এক বিরাট তুফানের মতো। অবিলম্বে ব্রিটিশ সিংহাসনও টলমল করে উঠল।

'আত্মার বলে কে পশুবলের মগজে ডাকায় ঝিঁ ঝিঁ,
কে রে ও খর্ব, সর্বপুজ্য গান্ধীজি, গান্ধীজি?'

এই অহিংস অসহযোগই যে স্বাধীনতালাভের একমাত্র উপায়, তা বুঝতে আমার বেশিদিন লাগে নি। তবে গোড়া থেকেই গান্ধীজির প্রোগ্রাম সম্বন্ধে আমার মনে প্রচুর সন্দেহ ছিল। চরকাকে কেন্দ্র করে তাকে তিনি একান্ত সঙ্কীর্ণ করে রেখেছিলেন। তাই গান্ধীজির শ্রেষ্ঠ দান হল—জনজাগরণ, জাতীয় সংগঠন নয়। ফলে নিজের মনে এক অভিনব স্বপ্নের সূচনা শুরু হয়: কী করে গান্ধীজির আধ্যাত্মিক বলের সঙ্গে রবীন্দ্র-আদর্শের সমন্বয় করা যায় যেন সর্বতোমুখী সৃজনক্রিয়ার সাহায্যে দেশ আবার বলিষ্ঠ সমৃদ্ধ ও সুন্দর রূপ ধারণ করতে পারে। এই স্বপ্নই হল আমার জীবনে বিপ্লবের শামিল। তার জন্যে বহুল পরিমাণে দায়ী হল বড়দার বিপ্লবজীবন।

বহু তর্ক-বিতর্ক সত্ত্বেও আমাদের চার বন্ধুর মতামতের কোনো পরিবর্তন হয় নি। কারণ আসল দ্বন্দ্ব ছিল গিরীন আর রেবতীর নিজের মনের মধ্যে, অর্থাৎ তাদের বুদ্ধিবৃত্তি আর অন্তরের তাড়নার বৈষম্য। তা সত্ত্বেও আমাদের বন্ধুত্ব কখনো খর্ব হয় নি, বিশেষ করে তা ছিল দেশপ্রীতির সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। তা ছাড়া, আমাদের আরও অনেক আলোচ্য বিষয় ছিল—নিজের লেখাপড়া, সংবাদ-বিনিময়, নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা। আমাদের মিটিং-ও তাই অব্যাহত ভাবে চলেছিল। তারপর হঠাৎ এল একদিন বজ্রপাত। ফলে ছত্রভঙ্গ হয়ে আমরা ছড়িয়ে পড়লাম নানা দিকে।

বজ্রপাত

শিবদা আর আমার দীক্ষা হয়েছিল একই গুরুর কাছে, কিন্তু আমাদের মন্ত্রজপ ছিল নামমাত্র, আমাদের সত্যিকারের "আহ্নিক" ছিল অধ্যয়ন আর বৈপ্লবিক গবেষণা। গুরু শ্যামসুন্দরানন্দ তাঁর দর্শন দিতে এসে তা মনে-মনে আঁচ করেছিলেন ও প্রকাশ্যতই সেজন্য বিচলিত ছিলেন।

এ দিকে সাধুদের সমাগমে, কাকার সংসার ধীরে-ধীরে একটা আশ্রমে পরিণত হতে চলেছিল। সে সংসারের খুঁটি ছিলেন খুড়িমা। একমাত্র তিনিই পতি-ভক্তি ও গুরুভক্তির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রেখে-ছিলেন। একদিন হঠাৎ অল্প কয়েকদিনের রোগে খুড়িমা চিরবিদায় নিলেন। কাকা একেবারে ভেঙে পড়লেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর সংসারও পড়ল ভেঙে। সে সময় শ্যামসুন্দরানন্দ এসে হাজির হলেন—ধূম-কেতুর মতো, উপলক্ষ কাকার মনের আধ্যাত্মিক খোরাক জোগানো, এই নিদারুণ আঘাতের সময় তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া। তিনি এই মহান কর্তব্য কী ভীষণভাবে পালন করেছিলেন তা কোনোদিন ভুলতে পারি নি।

গুরুর সেই তীব্র কণ্ঠ ও নির্মম বাণী আজও আমার কানে বাজে—'সংসারে মানুষের মুক্তি নেই। ভগবান চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন,—আপনাকে কোন্ পথে যেতে হবে। মায়া ত্যাগ করুন। শিবকে আর কতদিন আঁকড়ে রাখবেন? তাঁকে সংসারের বন্ধন থেকে মুক্তি দিন, ধর্মের পথে যেতে দিন।'

প্রায় মাসখানেক গুরুজী ওখানে বসে দিনের পর দিন কাকার কানে এই মন্ত্র দিলেন। শেষে তাঁরই

জয় হল। খুড়িমার শ্রাদ্ধক্রিয়া যথারীতি সম্পন্ন হল। তার অল্প পরেই তিনি শিবদাকে নিয়ে চলে গেলেন তাঁকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করবেন বলে।

কাকার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু বলার মতো লোক আশেপাশে ছিল না। দুই বাড়িতে আমরা সবাই কাকাকে যেমন শ্রদ্ধা করতাম, তেমনি ভয়ও করতাম। তাঁর মতের বিরুদ্ধে কোনো কিছু করার সাহস আমাদের ছিল না। আর শিবদার তো কথাই নেই। তিনি ছিলেন কাকার হাতে-গড়া মানুষ। এখনো মনে পড়ে, রোজ সকালে কাকা মন্ত্র জপ করার সঙ্গে-সঙ্গে এসে দেখে যেতেন শিবদার পড়াশোনা কেমন চলছে। কিছু বোঝাবার থাকলে তাকে বুঝিয়ে দিতেন। ফলে শিবদা ছিলেন যেমনি মেধাবী ছাত্র তেমনি বাধ্য পুত্র। কাকার প্রতি তাঁর ছিল অসামান্য শ্রদ্ধা আর ভয়। তাঁর কোনো কথার প্রতিবাদ করার কথা ভাবতেও পারতেন না। তাঁকে সংসার ছেড়ে যেতে হবে চিরদিনের জন্য ও আশ্রমে সন্ন্যাসীর জীবন-যাপন করতে হবে, কাকার এত বড়ো সিদ্ধান্তও তিনি নির্বিকারে নির্বিচারে মেনে নিলেন। কাকার আদেশ আর আশীর্বাদ মাথা পেতে নিয়ে শোকাচ্ছন্ন অবস্থায় সবাইকে ছেড়ে শিবদা চলে গেলেন।

[ক্রমশ

সঙ্গে

১ ক। অনেক প্রত্যাশার সঙ্গে ওরা আপনার কাছে এসেছিল।
খ। অনেক প্রত্যাশা নিয়ে ওরা আপনার কাছে এসেছিল।

২ ক। আমরা এখন আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ করছি—ম্যাগির মতো আধা তৈরিকরা খাবারের চল খুব বাড়ছে।
খ। আমরা এখন আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করছি ··

৩ ক। শিকারী সাহসের সঙ্গে সেই ঘন বনের মধ্যে একলাই ঢুকে গেলেন নেকড়ের সন্ধানে।
খ। শিকারী সাহস করে···

ক-চিহ্নিত বাক্যগুলি বঙ্গভাষায় দৈনিক সংবাদপত্রের মহান অবদান। সমাজের ভিত্তিমূলে যাদের অবস্থান, সেই শ্রমজীবী-সমাজ আর নারীসমাজ কিন্তু খ-চিহ্নিত বাক্যগুলিই বলেন।

ঊনবিংশ শতকে বাঙালির ইউরোপ-অন্বেষা

রণেন্দ্রনাথ দেব

ঊনবিংশ শতকের বাঙলাদেশ, বাঙালি জাতি এবং সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্য প্রবল। এ পর্যন্ত বহু প্রখ্যাত লেখক এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন, অনেক মূল্যবান আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। ভবিষ্যতে আরো কিছু গ্রন্থ বার হবে। এই বইটি এ বিষয়ে সাম্প্রতিকতম গবেষণা। ড. তপন রায়চৌধুরী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন কৃতী ছাত্র। আকবর এবং জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বঙ্গদেশের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁর সুখ্যাত বইটির নাম সুপরিচিত। নতুন বইটিতে তিনি গবেষণাকর্মের আলোকপাতে উনিশ-শতকী বাঙলার একটি নতুন প্রদেশকে অধিগম্য করেছেন। ইয়োরোপের সঙ্গে সংস্পর্শ আর সংঘাতে বাঙালি চিত্তের জাগরণ ঘটেছিল। সেই ইয়োরোপকে নানা মনীষী নানাভাবে গ্রহণ করেছেন। ড. রায়চৌধুরী বিশেষ-ভাবে তিনজন মনীষীর উক্তির আলোকে আমাদের ইয়োরোপ-অন্বেষার বৈশিষ্ট্য বুঝতে চেয়েছেন। এ তিনজন মনীষী—ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র এবং স্বামী বিবেকানন্দ।

প্রথম অধ্যায়ে পশ্চাৎপটবর্ণন। লেখক বলেছেন, তাঁর আলোচনার একটি উদ্দেশ্য পাশ্চাত্ত্য বিষয়ে ভারতীয় দৃষ্টির বিভিন্ন সম্ভাবনা এবং বৈচিত্র্যের পরীক্ষা ও ব্যাখ্যা। সে যুগের ভারতীয় ইয়োরোপ-আবিষ্কারের কয়েকটি কৌতূহল-জনক দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছেন। ভারতীয়ের কাছে আদর্শ নায়ক ছিলেন ম্যাটসিনি আর গ্যারিবলডি, বিসমার্ক নন। আমাদের বুদ্ধিজীবীরা ("জ্ঞানান্বেষণ" ও "এনকোয়ারার" পত্রিকা দুটির পৃষ্ঠপোষক মুষ্টিমেয় কটি তরুণকে বাদ দিলে) প্রায় সবাই হিন্দুধর্মের গৌরব ও পুনরুত্থানের কথা বলেছেন। ভূদেব, বঙ্কিম এবং অন্যান্য চিন্তাশীল ব্যক্তিরা (যাঁদের মধ্যে রয়েছেন পজিটিভিস্ট যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষও) ধর্মকে জাতীয় জীবনের প্রধান ভিত্তি করে তুলতে চেয়েছেন। এই নব্য সম্প্রদায় ইয়োরোপকে আমন্ত্রণ করেছেন, কিন্তু ইয়োরোপের সঙ্গে সংঘাতের সম্ভাবনাও তাঁরা দেখেছেন। "রাজার জাতের" উদ্ধত ব্যবহারে তাঁরা অনেকেই অপমানিত বোধ করেছেন; রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র ও আরো অনেকের এই তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ হয়। কিন্তু পাশ্চাত্ত্যের সংস্পর্শে এসে ইয়োরোপের চিন্তাজগতের বিরাট ভাণ্ডার তাঁদের প্রলুব্ধ করেছিল। মিল আর বেন্থামের চিন্তাধারা আমাদের মনীষী-দের উদ্দীপ্ত করে। তাঁদের নানাবিধ উক্তি আমাদের চমৎকৃত করে। চন্দ্রনাথ বসু অবাধ বাণিজ্যনীতির বিরোধিতা করে বলেছিলেন, ভারতের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করা উচিত, যাতে বিশ্ব-জাতিসভায় ভারত মর্যাদার আসন গ্রহণ করতে পারে এবং ইংল্যানডের সঙ্গে তার সম্পর্ক হয় পারস্পরিক সমমর্যোতক। ইয়োরোপীয় চিন্তাধারার প্রভাবের ফলে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ছিল অনিবার্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের চিন্তাধারা। ভূদেব দেশীয় ঐতিহ্য এবং সাধনায় প্রগাঢ় নিষ্ঠাবান ছিলেন, একথা সবাই জানেন। কিন্তু তিনি ছিলেন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। ইংরাজের সঙ্গে সম্পর্কে তাঁকে নিত্য আসতে হত। তিনি ইংরাজের সঙ্গে করমর্দন করতেন এবং বাড়িতে এসে স্নান করে জামাকাপড় ছেড়ে ফেলতেন। তিনি কখনো কোনো সাহেবের গৃহে আহার করেন নি। অথচ ইংরাজ রাজপুরুষদের অনেকের সঙ্গেই তাঁর অত্যন্ত হৃদ্যতা জন্মেছিল। ইনসপেক্টর অব স্কুলস মেড্‌লিকট, হজসন, প্র্যাট প্রভৃতি ছিলেন তাঁর বিশেষ বন্ধু। একমাত্র লেফটেন্যানট-গভর্নর ক্যামবেলের সঙ্গে তাঁর কিছু মনকষাকষি হয়। প্রয়োজনে চাকরির ব্যাপারে তিনি তাঁর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহায়তা নিয়েছেন, এমন-কী একবার মিসেস উড্রোর সাহায্যও যাচ্ঞা করেছিলেন। ভূদেব স্বদেশ ও স্বজাতির গৌরবে আস্থাবান ছিলেন, কিন্তু ইংরাজি

Europe Reconsidered—Perceptions of the West in Nineteenth Century Bengal—By Tapan Raychaudhuri, Delhi Oxford University Press. 1988. pp. 369. Rs. 170.

শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। ভুললে চলবে না, তিনি স্বেচ্ছায় সংস্কৃত কলেজের পড়াশোনায় ইতি দিয়ে হিন্দু কলেজের ছাত্র হয়েছিলেন।

ভূদেবের চিন্তাধারার আর-একটি বৈশিষ্ট্য মুসলমান সম্প্রদায় সম্বন্ধে তাঁর সহমর্মিতা, সম্ভ্রমবোধ। তিনি মার্শম্যানের ইতিহাসগ্রন্থে পূর্বতন মুসলিম শাসকদের সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তাকে মিথ্যা বলেছেন। ভূদেব প্রথম যৌবনে কিছুদিন কলকাতা মাদ্রাসায় অধ্যাপনা করেছিলেন। সেখানে মুসলমান ছাত্র ও সহকর্মীদের সান্নিধ্যে এসেই তাঁর মনে মুসলমান সম্প্রদায় সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবোধ জাগে।

ভূদেবের চিন্তাধারায় কয়েকটি দিক কৌতূহলজনক। তিনি বিদ্যাসাগরমশায়ের পাঠ্যপুস্তকগুলির একটি ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন—বিদ্যাসাগরমশায় আদর্শ চরিত্র হিসাবে শুধু ইয়োরোপীয় চরিত্রগুলিকেই বড়ো করে দেখান, আদর্শ ভারতীয় চরিত্রের দৃষ্টান্ত দেন নি। অথচ ভূদেব নিজে বিশেষ ভাবে পড়তেন স্ব-উদ্যোগে যাঁরা বড়ো হয়েছেন তাঁদের কথা, যেমন Smile's *Industrial Biography*, Davenport's *Lives of Individuals who Raised themselves*, Brewster's *Martyrs of Science*, biographies of Stephenson, Watt and Joshua Wedgwood।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও ভূদেব এ শিক্ষাকে বলছেন খাঁটি সোনা নয়, গিল্‌টির গয়না। পাশ্চাত্ত্য জাতির দেশজয়ের বৃত্তান্তও তাঁর বিবেচনায় ক্রূরতার উপাখ্যান। ইংরাজের আচরণ অবশ্য স্প্যানিশ, পোর্তুগীজ ও ফরাসিদের তুলনায় কম নিষ্ঠুর। কিন্তু ইংরাজ কখনো আমাদের তাদের সমান মর্যাদা দেবে, এটা আশা করা অসঙ্গত। তবু ইংরাজের প্রতি ভূদেবের কিছুটা শ্রদ্ধা গোপন নেই। তিনি বলেছেন ইংরাজ স্বার্থপর, সহানুভূতিশূন্য, কিন্তু তার স্বভাব বীরত্বপূর্ণ; সে গুণের কদর জানে। তা সত্ত্বেও ভূদেব দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করেছেন, ইংরাজের শাসনেই আদিবাসী জনজাতিসমূহ নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে।

ভূদেবের আর-একটি চিন্তাবৈশিষ্ট্যের প্রতি লেখক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের মধ্যে ভূদেব বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন অগুস্ত কোঁতের প্রতি। কোঁৎ পুরোহিতশ্রেণীকে উচ্চ আসন দিতেন। ভারতের ব্রাহ্মণরাও সেই উচ্চাসনের দাবিদার, এজন্যই কি ভূদেব কোঁতের অনুরাগী হয়েছিলেন?

"নিরেট রেউড় বাঁশ" ভূদেবের চরিত্রবিশ্লেষণটি মনোজ্ঞ।

ভূদেবের তুলনায় বঙ্কিমের স্বভাবে দ্বন্দ্বের ভাব প্রবল। তৃতীয় অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনা পাই। লেখক বঙ্কিমের পারিবারিক জীবনের চিত্র দিয়েছেন প্রথম। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বাবার এবং অন্য তিন ভাইয়ের খুব প্রীতি আর শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। কিন্তু মাঝে-মাঝে এই যৌথ পরিবারের কারো-কারো আচরণে, বিশেষত তাঁর বাবার আর সঞ্জীবচন্দ্রের অমিতব্যয়িতায়, তিনি অসহিষ্ণু হয়ে উঠতেন। পিতার মৃত্যুর পর রাগ করে কিছুদিন বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দেন। এই পরিবেশে তাঁর নিজ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিকশিত হয়। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিও নবযুগের ব্যক্তিত্বে ভাস্বর।

ড. রায়চৌধুরী বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রাবলীর মধ্যে প্রচলিত বিধিলঙ্ঘন-প্রবণতার উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়টি স্ফুটতর করে বললে ভালো হত।

বঙ্কিমের জীবনে একটি ক্ষোভ ছিল—তাঁকে ইংরাজের অধীনে আজীবন দাসত্ব করতে হয়েছে। পিতার ঋণ শোধের গুরুদায়িত্ব তাঁর কাঁধে থাকায় চাকরি ছাড়তে পারেন নি, কিন্তু কর্তৃপক্ষের উদ্ধত আচরণ তাঁকে প্রতিপদে বিক্ষত করত। জেলাম্যাজিস্ট্রেট বাকল্যানড, মেকলে, ওয়েস্টমেকট, বেকার —প্রত্যেকের সঙ্গেই তাঁর বিরোধ বেধেছে। এই পরিবেশে তাঁর মনে জাতিবৈরের ভাব জাগা আশ্চর্য নয়। ইংরাজ সরকার তাঁকে রায়বাহাদুর ও সি. আই. ই. উপাধি দিলে তা-ও বঙ্কিমের অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

রেভারেনড হেস্টির সঙ্গে পত্রযুদ্ধে বঙ্কিমের হিন্দুধর্মঅনুরাগ জলন্তরূপে প্রকাশ পায়। বঙ্কিম প্রথম জীবনে নাস্তিকভাবাপন্ন ছিলেন, কিন্তু পরে তিনি গভীর ধর্মানুরাগী হন। বঙ্কিমের মনোজীবনের এই বিবর্তন অকারণ নয়।

বঙ্কিম ইংরাজ শাসনে অতৃপ্ত ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে তাঁর আগ্রহ কখনো স্তিমিত হয় নি। ইয়োরোপীয় সাহিত্যের তুলনায় আমাদের সাহিত্যে আদিরসের ছড়াছড়ি তাঁর কদর্য মনে হত। তিনি বিশেষ ভক্ত ছিলেন ইংরাজি ভাষায় বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনার। বঙ্কিম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দুই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশগুলির স্বীকরণ করেছেন, আবার দুই সাহিত্যের নিকৃষ্ট উপাদানগুলি বর্জনও করেছেন।

বঙ্কিমের ধর্মবোধের বিশ্লেষণ করে লেখক দেখিয়েছেন তাঁর ভিক্টোরীয় নৈতিক শুচিতাবোধ তাঁর ধর্মশাসনে নিয়ন্ত্রিত করেছে। হিন্দুধর্মে যেখানে উৎকট অশালীনতা রয়েছে, তাকে

তিনি ঘৃণা করেছেন। ধর্মকে তিনি সামান্য আচার-অনুষ্ঠান বলে বিবেচনা করতেন না। ধর্ম বৃহৎ অর্থে সংস্কৃতির সমার্থক, একথা তিনি বলেছেন "হিন্দুধর্ম বিষয়ক পত্রাবলী"-তে।

ইংরাজ শাসনের প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করলেও পাশ্চাত্ত্য সমাজের মহান দিকগুলির উল্লেখ তিনি করেছেন সশ্রদ্ধ চিত্তে। বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে অবাধসুযোগ, মানুষের সাম্যভাব, স্ত্রীপুরুষের সমমর্যাদা প্রভৃতি গুণগুলির প্রশংসা করেছেন বঙ্কিম। অবশ্য পাশ্চাত্ত্যের বহু রীতির সমালোচনাও করেছেন তিনি। বঙ্কিম ব্রিটিশ পার্লামেনটের ভক্ত ছিলেন না কেননা সেখানে মিলের ক্ষুরধার বুদ্ধির চেয়ে গ্ল্যাডস্টোনের বক্তৃতাশক্তির আদর বেশি। পাশ্চাত্ত্য জাতীয়তাবাদ, যা অন্যজাতির পরাধীনতার পথ প্রশস্ত করে, তারও দোষ তিনি দেখিয়েছেন। খ্রীষ্টধর্মের প্রতি একদা তিনি আকৃষ্ট বোধ করেছিলেন। পরে এ আকর্ষণ স্তিমিত হলেও খ্রীষ্টধর্মের ভালো দিকগুলিকে তিনি স্বীকার করতেন।

ইয়োরোপের যে জিনিসটি বঙ্কিমকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছিল তা তার সাহিত্য। সাহিত্যের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ এবং এই সাহিত্যের মহিমাখ্যাপনে বঙ্কিম চিরকাল মুক্তকণ্ঠ ছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয়। ভূদেব এবং বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য জীবনযাত্রার সঙ্গে ভারতীয় জীবনযাত্রাপ্রণালীর বিরোধ বিষয়ে অবহিত হন এবং এটা তাঁদের মনে এক প্রবল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। বিবেকানন্দ ইংরাজি শিক্ষায় সুশিক্ষিত হলেও তাঁর মনে প্রথম দিকে ইয়োরোপের প্রতি গভীর আকর্ষণ বা তীব্র বিরোধিতা—কোনো ভাবই ছিল না। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতা বিষয়ে তিনি বিশদ আলোচনা করতে থাকেন আমেরিকা ভ্রমণের পর থেকে। ভূদেববঙ্কিমের সঙ্গে এখানে বিবেকানন্দের বিরাট পার্থক্য। এই তিন মনীষীর মধ্যে একা বিবেকানন্দই পাশ্চাত্ত্য দেশে ভ্রমণ করেন ও প্রত্যক্ষভাবে সে সমাজের সঙ্গে পরিচিত হন।

বিবেকানন্দ তরুণ বয়সে সংগীত ও মুসলমানি রান্নার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। আইনের চর্চার প্রতিও তাঁর টান ছিল। পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর জীবনের পথ বদলে যায় এবং রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ তাঁকে নবজন্ম দেয়। আমেরিকার অপূর্ব সাফল্যের পর তিনি রামকৃষ্ণ মিশন গঠনে উদ্যোগী হন। ইয়োরোপ-আমেরিকায় বিবেকানন্দ বেদান্তের আধ্যাত্মিকতা প্রচার করেন, কিন্তু ভারতে রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যক্রমে সেবাধর্ম প্রাধান্যলাভ করে, বেদান্তচর্চা অনেকটা গৌণ। "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" ও অন্যান্য গ্রন্থে ইয়োরোপের জীবন ও আদর্শকে বিশ্লেষণ করেছেন বিবেকানন্দ। আমেরিকায় বিবেকানন্দের বেদান্তপ্রচার সবক্ষেত্রে সুগম হয়নি। পণ্ডিতারমাবাই-এর দল ও প্রতাপ মজুমদার প্রভৃতি স্পষ্টতই তাঁর প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিলেন। দেশে "অমৃতবাজার পত্রিকা"ও তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেন। এত সব বাধার মুখে বিবেকানন্দের বিশ্বজয় এক অপূর্ব কীর্তি।

পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহের মধ্যে ফ্রান্সের প্রতি বিবেকানন্দ বিশেষ আকর্ষণ বোধ করতেন। দরিদ্র মানবের দুঃখমোচন ছিল যাঁর জীবনের ব্রত, তিনি ফরাসি বিপ্লবের মধ্যে প্রেরণা খুঁজে পাবেন—এ অস্বাভাবিক নয়। নেপোলিয়নের পতন ও ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়ের উল্লেখ তিনি করেছেন গভীর দুঃখের সঙ্গে।

পঞ্চম অধ্যায়টি বিশেষভাবে পঠনীয়; লেখকের সুচিন্তিত সিদ্ধান্তগুলি এখানে সংক্ষেপে নিবদ্ধ হয়েছে।

উনিশ শতকের শেষার্ধে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পাশ্চাত্ত্যবিষয়কভাবনা মাত্রাতিরিক্ত অনুশীলনে দাঁড়ায়। যে তিনজন মনীষীর কথা বলা হল, তাঁরা সবাই ছিলেন হিন্দু হওয়ার জন্য গর্বিত। কিন্তু তাঁদের হিন্দুত্ব একরকম নয়। ভূদেবের হিন্দুধর্ম ছিল স্মৃতিশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি আবার অনুষ্ঠানাদিকে অবজ্ঞা করেন নি এবং দ্বিজজাতির শ্রেষ্ঠত্বে ছিলেন নিঃসন্দেহ। বঙ্কিম কিন্তু আচারাদির প্রতি ছিলেন বিরূপ এবং বর্ণভেদপ্রথাকে মনে করতেন ভারতের অধোগতির হেতু। তিনি যে জীবনদর্শনের কথা বলেছেন তা যতটা গীতা-মহাভারতের উপর প্রায় ততটাই কোঁৎ-স্পেন্সারমিলের উপর স্থাপিত। আবার হিন্দু ঐতিহ্যের অর্থও বঙ্কিমবিবেকানন্দের কাছে একরকম নয়। বিবেকানন্দ মনে করতেন ভারতীয় ধর্মের প্রাণ বেদান্ত এবং অদ্বৈতবাদের মধ্যে নিহিত। তিনি বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন, রজোগুণের চর্চাকে এবং এ গুণের চর্চার দ্বারাই ভারতের স্বাধীনতা আসবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

উনিশ-শতকী বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাকে বুঝতে গেলে তিনটি বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি কী-রকম ছিল তা জানা দরকার। বিষয় তিনটি হল—সমাজসংস্কার, হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক এবং জনগণের ভাগ্যোন্নয়ন।

ভূদেব সামাজিক আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন না। মুসলিম শাসকদের তিনি অত্যাচারীরূপে চিত্রিতও করেন

নি। জনসাধারণের উন্নতির জন্য, শিক্ষাবিস্তারে, তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও আদিবাসী সমাজের উন্নয়ন-প্রচেষ্টাকে।

বঙ্কিমচন্দ্র বিধবাবিবাহের মতো সামাজিকসংস্কারকার্যে উৎসাহিত বোধ করেন নি এবং মুসলমান শাসনকালকে অত্যাচারের কালরূপে চিহ্নিত করেছেন। এদিক থেকে দেখলে তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সহযোদ্ধা মনে হতে পারে, কিন্তু দরিদ্র রায়তদের পক্ষ তিনি যেভাবে সমর্থন করেছেন তাতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির অপূর্ব উদারতা প্রকাশ পায়।

বিবেকানন্দও, বঙ্কিমের মতো, সামাজিক সংস্কারের জন্য স্মরণীয় নন। মুসলিম সমাজ সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রশংসা বাঞ্জক। সভ্যতার প্রসারে খ্রীষ্টধর্মের তুলনায় ইসলামের অবদান বেশি, একথা তিনি বলেছেন। মানবসমাজের উন্নতির জন্য তিনি চাইতেন আত্মজ্ঞানের উপলব্ধির পথে বাধা দূরীভূত হোক এবং একাজে ভারতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে পাশ্চাত্যবাসীর উদ্যম মিলিত হোক।

দীর্ঘ আলোচনাটিতে লেখকের পরিশ্রমশীলতার ছাপ সুস্পষ্ট, যদিও এ বইটিকে তাঁর পূর্ববর্তী রচনার চেয়ে উৎকৃষ্টতর মনে হল না। উনবিংশ শতকের বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্যে বিষয়ে যাঁদের কৌতূহল রয়েছে ড. রায়চৌধুরীর এ লেখাটি তাঁদের অবশ্যই পড়তে হবে।

সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতি নিয়ে সমকালীন ভাবনার একটি কাঠামো

সমীর মুখোপাধ্যায়

নানান সময়ে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধের সংকলনই হল বর্তমান গ্রন্থ। সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধগুলির সাহায্যে লেখক সমকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক গতিপ্রকৃতির রূপকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে প্রবন্ধগুলি রচিত হওয়ার ফলে গ্রন্থটির মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট পরিকল্পনা একেবারেই অনুপস্থিত। প্রত্যেকটি প্রবন্ধ একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র। তবে সবগুলিকে মিলিতভাবে পড়লে এক ধরনের ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়।

লক্ষণীয় যে বর্তমান গ্রন্থটিতে প্রথমেই আলোচনায় এসেছেন মানবেন্দ্রনাথ রায়, যিনি বর্তমান প্রজন্মের কাছে বিস্মৃতপ্রায় হলেও ভারতের বামপন্থী মতাদর্শের অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে অনেকের কাছেই শ্রদ্ধেয়। তাঁর সম্পর্কে লেখকের সশ্রদ্ধ অথচ যুক্তিনির্ভর আলোচনাটি অত্যন্ত বাস্তবধর্মী হয়েছে। রোমানটিক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কিভাবে যুক্তিবাদী মানবেন্দ্রনাথ রায় হয়ে শেষ পর্যন্ত মৌল মানবতাবাদীতে পরিণত হন—লেখকের কলমে তার সুন্দর প্রতিফলন ধরা পড়ে। রোমানটিক নরেন্দ্রনাথ রামদাস বাবাজীর সান্নিধ্য থেকে জঙ্গি জাতীয়তাবাদী অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেন এবং শেষ পর্যন্ত ঘটনাচক্রে নরেন্দ্রনাথ ১৯১৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দেন মানবেন্দ্রনাথ রায় নামে এবং নতুন নামের সঙ্গে গ্রহণ করেন নতুন মতাদর্শ—মার্কসবাদকে। কিন্তু রোমানটিকতার আধিক্য স্বতই মানুষকে বাস্তববিমুখ করে মানবেন্দ্রনাথ রায়ও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। ফলে আসে হতাশা। জাতীয় বুর্জোয়াদের উপনিবেশবাদের সঙ্গে আপোসমুখী মনোভাবের বিরুদ্ধে একদা যিনি লড়াই করেছিলেন তিনিই ১৯৩৬ সালে ফিরে এলেন ভারতে তাদেরই সংগঠন জাতীয় কংগ্রেসে। অল্প সময়ের মধ্যেই পুনরায় হতাশার শিকার হয়ে তিনি নিক্ষিপ্ত হন 'রাজনৈতিক রক্ততার কঠিন ভূমিতে'। এবার আশ্রয়ের সন্ধান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে—'নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল ব্যক্তির গাণিতিক সমষ্টিই হল সমাজ এবং এ ছাড়া সমাজের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই।' (পৃ ১৫)

লেখকের রচনা পড়ে মনে হয়েছে যে, মানবেন্দ্রনাথ ক্রমশই রাজনৈতিক নিঃসঙ্গতা ও রিক্ততার পথে চলেছেন এবং তার থেকে বেরিয়ে আসার এক মরিয়া প্রচেষ্টার ফলেই জন্ম দিয়েছেন তাঁর মৌল মানবতাবাদের। অথচ লেখক এই মৌল মানবতাবাদকে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের 'যথার্থ মানসপ্রতিমা' বলে কেন যে উপসংহার টানলেন বোঝা গেল না, কারণ লেখক নিজেই এক জায়গায় বলেছেন, 'রাজনৈতিক ব্যর্থতা এবং একাকিত্বে নিমজ্জিত মানবেন্দ্রনাথ স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন সম্পূর্ণ এক নতুন সম্ভাবনার। এই স্বপ্নই অনতিকালের মধ্যে রূপ নেয় এক নতুন দর্শনচিন্তায়, যাকে তিনি অভিহিত করেন মৌল মানবতাবাদ নামে।' (পৃ ১০)

দ্বিতীয় প্রবন্ধ "জন্মশতবর্ষে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস"-এ লেখক প্রাক-স্বাধীনতা যুগের একটি আদর্শবাদী রাজনৈতিক সংগঠন জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীনতালাভের পর কিভাবে তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, সেই বিষয়টির ওপর মূলত আলোকপাত করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, 'স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে...এ যাবৎ ইতিহাস কংগ্রেসের আদর্শচ্যুতি ও অবক্ষয়ের ইতিহাস।' জনসেবার আদর্শ থেকে বিচ্যুত কংগ্রেস দল শুধু সরকার-সর্বস্ব হয়ে পড়েছে তাই নয় তা নেহরুর ব্যক্তিগত সাম্রাজ্যেও পরিণত হয়েছে। ক্ষমতার লোভ, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, স্বজনপোষণ, দুর্নীতি এমন পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে যে দলগতভাবে কংগ্রেসের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে। লেখকের এইসব বক্তব্যের সঙ্গে অন্যেরা তো বটেই, এমনকী কংগ্রেস দলের অনেকেও সহমত হবেন। কিন্তু এই প্রবন্ধটিতে যা বিশেষভাবে অনুপস্থিত তা হল কংগ্রেস দলের শ্রেণীগত চরিত্র সম্পর্কে লেখকের কোনো বক্তব্য। কোন্ আর্থ-সামাজিক বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসদলের উদ্ভব, বিকাশ এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তার নেতৃত্ব গ্রহণের ঘটনাগুলি ঘটে, তা না জানলে আজকের কংগ্রেস দলের অবক্ষয়ের বিষয়টি আর্থ-সামাজিক-কারণরহিত একটি আকস্মিক ঘটনা বা দুর্ঘটনা বলে পাঠকের মনে হওয়া স্বাভাবিক। আর-একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কোনো ধরনের গঠনমূলক কর্মসূচী ছাড়াই শুধুমাত্র নেহরু ও শ্রীমতী গান্ধী তাঁদের গণ-মোহন নেতৃত্বের দ্বারাই এই বিশাল ভারতবর্ষে কংগ্রেস-কে বাঁচিয়ে রেখেছেন—দেশীয় রাজনীতির ব্যাখ্যায় এটি একটি অতিসরলীকরণ বলেই মনে হয়।

"কংগ্রেস রাজনীতিতে গান্ধীর আবাহন ও বিসর্জন" প্রবন্ধে লেখক 'কংগ্রেস রাজনীতির ইতিহাসে গান্ধীপর্ব সবচেয়ে উজ্জ্বল অধ্যায়' বলে মন্তব্য করেন। সনাতন মূল্যবোধের প্রতি সাধারণ মানুষের আকর্ষণকে পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীজি তাঁর নেতৃত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং এক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য গণমোহিনী শক্তি বিশেষভাবে সহায়তা করে। অহিংসার আদর্শে বিশ্বাসী গান্ধীজি রাজনীতিতে উগ্রপন্থাকে কোনোদিন মেনে নিতে পারেন নি এবং সেই কারণেই চৌরিচৌরার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি অসহযোগ আন্দোলন থেকে সরে এসেছিলেন। তবে লেখকের এই বক্তব্যের সঙ্গে একাধিক গান্ধী-বিশেষজ্ঞ ভিন্নমত পোষণ করেন। পূর্ববর্তী প্রবন্ধে লেখক যদিও পরোক্ষভাবে কংগ্রেস সংগঠনে ব্যক্তিকেন্দ্রিক নেতৃত্বের জন্য নেহরুকে কটাক্ষ করেন, আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি সেই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার প্রবর্তক হিসেবে গান্ধীজির নাম উল্লেখ করেন। 'গান্ধীজি', লেখকের মতে, 'কংগ্রেস দলের সিদ্ধান্তকরণপ্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত কেন্দ্রীকরণ ঘটিয়েই ক্ষান্ত হন নি, নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বারা এই প্রক্রিয়াকে নিরন্তর নিয়ন্ত্রণ করে তিনি কংগ্রেস সংগঠনে কার্যত এক ধরনের ব্যক্তিগত স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।' (পৃ ২৫) সুতরাং আজকের ভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেস দলের যে স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা দেখা যায় তা মূলতই যে গান্ধীজির অবদান, সেই বিষয়ে লেখক মৌন থেকেছেন। অবশ্য গান্ধীজি যে ভারতীয় রাজনীতিকে নৈতিকতার দ্বারা বাঁধতে চেয়েছিলেন লেখকের সেই বক্তব্যের সঙ্গে অনেকেই একমত হবেন। প্রবন্ধটিতে গান্ধীজি সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য ততটা যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণাত্মক নয়, যতটা আবেগ-নির্ভর। তাই ভারতীয় রাজনীতির মঞ্চ থেকে গান্ধীজির ক্রমান্বয়ে সরে যাওয়ায় লেখক যে ব্যথিত হয়েছেন, তা নিতান্তই ব্যক্তি গান্ধীর জন্য—রাজনৈতিক গান্ধীর জন্য নয়। আমাদের দেশের প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য নেতা হয়েও গান্ধীজি দেশের জন্য, এমনকী কংগ্রেস দলের জন্যও কোনো অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কর্মসূচী কিন্তু দিয়ে যান নি। অহিংসা, অসহযোগ, অনশন —এসবই ছিল ইংরেজ-বিরোধী লড়াইয়ের কৌশল মাত্র, দেশগঠনের কর্মসূচী নয়। পক্ষান্তরে, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক কর্মসূচী প্রভৃতি বিষয়ে নেহরুর বক্তব্য অনেক স্পষ্ট ছিল। মার্কসবাদী তবে মূলত অবিশ্বাসী নেহরু কিন্তু বহু স্বাধীনতা-প্রাপ্ত দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, ভারীশিল্পের বিকাশের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জন, সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জোটনিরপেক্ষতা প্রভৃতির ন্যায় সুস্পষ্ট কর্মসূচীর আশ্রয় নিয়ে দেশকে পরিচালিত করতে চান নির্দিষ্ট লক্ষ্যে। এই কর্মসূচী পরবর্তী কালে ভারতের জাতীয় কর্মসূচীতে পরিণত হয়। গান্ধীজির ব্যর্থতা এখানেই; তা ছাড়া নেহরু তাঁর কর্মসূচী স্বাধীনতার-প্রাপ্তির আগেই ঠিক করেন। ফলে স্বভাবতই স্বাধীনতা-লগ্ন যখন সমাসন্ন, তখন গান্ধীজি 'কংগ্রেসের এক নিঃসঙ্গ এবং পরিত্যক্ত প্রহরী'। পুঁজিবাদী ভারতের রাষ্ট্রাদর্শের সঙ্গে গান্ধীজির "রামরাজ্যে"র সাযুজ্য কোথায়? ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিতেই আজ ভারতে গান্ধীজির প্রাসঙ্গিকতা ক্রমশই বিলীন

দেশ কাল সমাজ—অমলকুমার মুখোপাধ্যায়। কে. পি. বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা-১২। ১৯৮৮, পৃ ১৪১। পঁচিশ টাকা।

হয়ে যাচ্ছে। তাই আজকের ভারতবর্ষে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ গান্ধীজির আদর্শকে ত্যাগ করার ফলেই দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে বলে লেখকের যে ধারণা, তার সঙ্গে একমত হওয়া যায় না। ক্ষতি যা হয়েছে, তা পুঁজিবাদী শ্রেণীর দুর্বলতা, দোদুল্যমানতা এবং সুবিধাবাদী মনোভাবের জন্য।

চতুর্থ প্রবন্ধ "ভারতীয় প্রেক্ষাপটে সংসদীয় গণতন্ত্র ও কমিউনিসট পার্টি"তে লেখক মূলত সংসদীয় ব্যবস্থায় বামপন্থীদের ক্ষমতাসীন থাকার রাজনৈতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, সংসদীয় ব্যবস্থাকে বিপ্লবের স্বার্থে ব্যবহার করার পরিবর্তে কমিউনিসটরা আপোসপন্থার নীতি অনুসরণ করে মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। সংসদীয় পথে যে প্রকৃত মানবমুক্তি আসে না, সেই কথাটা বোঝানোর পরিবর্তে কমিউনিসটরা মানুষের মধ্যে নির্বাচনী ব্যবস্থা সম্পর্কে মোহ তৈরি করছে। অনেক ক্ষেত্রে কমিউনিসটরা সংসদীয় ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত বুর্জোয়া ত্রুটিগুলির শিকার হয়ে পড়ছে। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করার ফলে সাধারণের মনে এইরকম ধারণা জন্ম নিচ্ছে যে এর পুনর্বিন্যাস ঘটলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা যাবে। দ্বান্দ্বিক সূত্রে সংসদীয় ব্যবস্থা এবং কমিউনিসটরা একে অপরের ওপর ক্রিয়াশীল থাকার কারণে কমিউনিসটরা যেমন সংসদকে ব্যবহার করতে চায় বৈপ্লবিক স্বার্থে তেমনি সংসদীয় ব্যবস্থাও কমিউনিসটদের মধ্যে প্রচলিত ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুকূল মনোভাব গড়ে তুলতে চেষ্টা করে বলে লেখক যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তা খুবই যুক্তিগ্রাহ্য। তবে তার কারণ হল—মানুষের মধ্যে সাধারণভাবে এবং নিজেদের মধ্যে বিশেষভাবে রাজনৈতিক মনোভাব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দলীয় পর্যায়ে ব্যর্থতা একদিকে, এবং অন্যদিকে অর্থনীতিবাদের প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক। অবশ্য এই প্রসঙ্গে লেখক বর্তমান প্রবন্ধে কিছু বলেন নি।

বর্তমান প্রবন্ধের মধ্যে লেখক এক জায়গায় বলেছেন যে, যে সংসদবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনার ভিত্তিতে সি. পি. আই ভেঙে সি. পি. এম-এর জন্ম হয়, পরে সি. পি. এম সেই সংসদবাদে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। আমাদের দেশে সি. পি. আই (এম) এর আবির্ভাবের এটাই কি ঐতিহাসিক কারণ? সি. পি. আই কোথাও সংসদীয় ভিত্তিতে ক্ষমতা-দখলকে তার লক্ষ্য বলে যেমন ঘোষণা করেনি, তেমনি সি. পি. এম ও তাদের দলীয় কর্মসূচীতে সংসদকে অচ্ছুত বলে বর্ণনা করে নি। সুতরাং লেখক সি. পি. এম-এর সংসদীয় অবস্থানকে যেদিক থেকে 'ইতিহাসের পরিহাস' বলেছেন তা খুব ইতিহাসসম্মত নয় বলে মনে হয়। আর-একটি কথা উল্লেখ করা দরকার: বর্তমান প্রবন্ধে লেখক "সমাজতন্ত্র" প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যের কথা বলেছেন। কিন্তু উভয় কমিউনিসট দলই বর্তমানে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যকে সামনে রেখেছে যা অসমাপ্ত থাকা অবস্থায় সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে যাত্রা করার প্রশ্নই ওঠে না। তবে অবশ্য এই লক্ষ্যে কতদূর কে অগ্রসর হয়েছে, তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। এখনও যদি কংগ্রেস দল পশ্চিমবাঙলার প্রায় ৪০% মানুষের সমর্থন পায়, তবে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে মানুষের অগ্রগতির হার খুব উৎসাহব্যঞ্জক বলে মনে হয় না। আর সর্বভারতীয় প্রসঙ্গে লেখক যে প্রশ্নটি রেখেছেন, তা খুবই প্রাসঙ্গিক। এইজাতীয় প্রবন্ধ সবসময়ই বিতর্কমূলক হয়, এটিও হবে। লেখক খুব বাস্তবানুগ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু যে বিষয়টির ধারেকাছেও লেখক যান নি তা হল বামফ্রনট মন্ত্রিসভার গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েত বিষয়ক কার্যাবলী যা পশ্চিমবাঙলার বামপন্থী রাজনীতির মূল শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করছে।

আজকের ভারতবর্ষে একটি বৃহৎ সমস্যা সন্ত্রাসবাদ হলেও তা আমাদের দেশে কোনো নতুন ঘটনা নয়—এই প্রসঙ্গই লেখক আলোচনা করেছেন তাঁর পঞ্চম প্রবন্ধে। প্রাক-স্বাধীনতা যুগেও সন্ত্রাসবাদ ছিল, তবে তার লক্ষ্য ছিল বিদেশী শাসক, আর আজকের সন্ত্রাসবাদের শিকার অগণিত সাধারণ নিরীহ মানুষ। এই প্রবন্ধে লেখক মনে করেন যে ইংরেজ শাসনের দমনপীড়নের মধ্যে সন্ত্রাসবাদের যে যৌক্তিকতা ছিল, আজকের ভারতে তা নেই, কারণ এখন মানুষের ক্ষোভ প্রকাশের জন্য গণতান্ত্রিক বিভিন্ন মাধ্যমগুলি সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। বিভিন্ন তত্ত্বের সাহায্যে লেখক বোঝার এবং বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, সন্ত্রাসবাদ নিজে কোনো রোগ নয়, সমাজব্যবস্থায় নিহিত কোনো রোগের লক্ষণ। লেখকের ধারণা এই যে, ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির ভোটসর্বস্বতা আধুনিক ভারতে সন্ত্রাসবাদের অন্যতম উৎস। সংকীর্ণ ও তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক মুনাফার জন্য অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলি এমন সব সামাজিক শক্তির সঙ্গে আপোস করে যা পরবর্তী কালে সন্ত্রাসবাদী শক্তিকে বেপরোয়া হতে সাহায্য করে। বাস্তবে এমন ঘটনাই ঘটেছিল পানজাবে—প্রকাশ সিং বাদল মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য যখন ভিনদ্রেলওয়ালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলা হয়। পশ্চিমবাঙলার বামপন্থী সরকারকে অপদস্থ

এবং কিছুটা বিপদগ্রস্ত করার জন্যই কি ঘিসিং সাহেবের প্রতি কিছুটা সহানুভূতির মনোভাব দেখানো হল না কেন্দ্রের তরফে? ষাটের দশকের শেষের দিক থেকে সত্তরের দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত নকশাল-রাজনীতির ভ্রান্তিকে মূলধন করে কি দলীয় ও প্রশাসনিক সন্ত্রাসবাদকে ছড়িয়ে দেওয়া হয় নি পশ্চিমবাঙলার পথেপ্রান্তরে? টি. এন. ভি. নামক একটি আজব অস্তিত্বকে সামনে রেখেই কি ত্রিপুরায় অতি সম্প্রতি রাজনৈতিক মুনাফা অর্জন করা হল না? লেখকের বর্তমান প্রবন্ধটিতে আর-একটু সবিস্তারে বলা দরকার ছিল—রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে কারা এই সন্ত্রাসবাদের প্রশ্রয় দিচ্ছে। অন্যথায় এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পাঠকমনে বিভ্রান্তি থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

"শিক্ষা, রাজনীতি, ও পশ্চিমবঙ্গ" প্রবন্ধে লেখক বিগত এক দশকের শিক্ষার অগ্রগতিকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে এই রাজ্যে শিক্ষার আনুষ্ঠানিক ও আয়তনগত উন্নতি হয়েছে কিন্তু শিক্ষার গুণগত মান ক্রমহ্রাসমান। এর উদাহরণ হিসাবে লেখক উল্লেখ করেছেন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নোংরা পরিবেশের কথা। উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির দেওয়ালে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির বার্তাবাহী পোসটারের বহুলতায় সেগুলিকে রাজনীতিচর্চার আখড়া বলে মনে হতে পারে। বর্তমান সরকারের পরোক্ষ প্রশ্রয়ে শিক্ষায় রাজনীতির ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটছে। আর রাজনীতিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ফটকের বাইরে রাখতে পারলে শিক্ষা কত সুন্দর ও সার্থক হয় তার প্রমাণ হিসেবে লেখক নরেন্দ্রপুর ও সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের নাম উল্লেখ করেছেন।

অত্যন্ত স্পর্শকাতর অথচ গুরুত্বপূর্ণ এই প্রবন্ধটির বিচারের ভার পাঠকদের ওপর ছেড়ে দিলেও দু-একটি বিষয় নিতান্ত উল্লেখ না করে পারা যাচ্ছে না। রাজনীতির অসংখ্য পোসটার কি সত্যিই শিক্ষার পরিবেশকে কলুষিত করে? যে সমাজ আর্থ-সামাজিক দ্বন্দ্বের দ্বারা দীর্ণ, সেখানে ছাত্রসমাজ তার সম্পর্কে যদি উদাসীন থাকে, তবে কি তা সুস্থ সমাজমনস্কতার পরিচয় হয়? শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পোসটার কি বামফ্রনটের দান? স্বাধীনতা আন্দোলন ও তৎপরবর্তী যুগেও কি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পোসটার পড়ে নি? এখন যদি তা বেড়ে থাকে তবে তা ক্রমবর্ধমান সামাজিক অসন্তোষের প্রতিফলন নয় কি? নরেন্দ্রপুর, সেণ্ট জেভিয়ার্সের মতন কলেজগুলিতে সমাজের যে অংশের ছেলেমেয়েরা পড়তে আসে, তারাই কি আমাদের রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সামাজিক অবস্থানের প্রতিনিধিত্ব করে? আমাদের ভারতবর্ষে বা পশ্চিমবঙ্গে কি শুধু ছাত্ররা রাজনীতি করে? এসব সত্ত্বেও লেখকের স্পষ্টবাদিতা অভিনন্দনযোগ্য এবং বেশকিছু সমালোচনা যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়েছে।

"পশ্চিমবঙ্গের দশম বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক একদিকে রাজনৈতিক মেরুভবনকে বামফ্রনটের সাফল্যের কারণ বলে উল্লেখ করেছেন, অন্যদিকে শ্রেণী-চেতনার ও রাজনৈতিক চেতনার অভাবের কথা বলেছেন। মনে হয় রাজনৈতিক মেরুভবনের পরিবর্তে দলীয় মেরুভবন (party polarization) শব্দটি ব্যবহার করলে ভালো হত।

"মূল্যবোধের সংকট" প্রবন্ধে লেখক রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে যে অবক্ষয় তাকে সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। অর্থনৈতিক উপাদানটিকে আলোচনার বাইরে রেখেছেন। মনে হয় না এই দুটি মূল বিষয়কে বাদ দিয়ে মূল্যবোধের বর্তমান সংকটকে শুধুমাত্র শিক্ষার দিক থেকে পর্যালোচনা করা বাস্তবসম্মত হবে।

এ ছাড়াও আলোচ্য গ্রন্থটিতে "রাজীব নেতৃত্বের প্রথম আড়াই বছর", "ভাষাশিক্ষার সংকটের স্বরূপ", "প্রশাসনের গড্ডালিকা", "ধর্ম ও আধুনিক সমাজ", "পণ্ডিত বিদায়", "প্রজন্মের দূরত্ব" প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি যথেষ্ট সুপাঠ্য হলেও লেখকের বক্তব্য বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। তবে সমস্ত কিছু সত্ত্বেও রাজনীতিসচেতন পশ্চিমবাঙলার মানুষের কাছে গ্রন্থটির যে বিশেষ আকর্ষণ থাকবে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

রসকল্পনার প্রসন্নতায় বাংলাদেশের দুই লেখিকা

কান্তি গুপ্ত

জাহানারা ইমামের "জীবনমৃত্যু" গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত আসাদের মা গল্পটি গড়ে উঠেছে শহীদজননী শেফু আপার অস্তিত্বরক্ষার কথাকে অবলম্বন করে। মুক্তিযোদ্ধা আসাদ যুদ্ধক্ষেত্রে বীরশয্যায় শায়িত। মাকে রেখে গেছে দেশের মানুষের কাছে, দেশের মাটিতে। শহীদ জননী, স্বামী-পরিত্যক্তা শেফু আপার সন্দর্শনে রাহেলা ছুটে গেল শহরের প্রান্তে। সেখানে, 'মাঠের বিরাট চত্বরে নোংরা পানিতে ডোবা বাঁশের মাচার ওপর দশ-বারোটা টিনের ঘরের' কোনো একটাতে, নোংরা পানি ঠেলে উঠে শেফু আপার জন্য অপেক্ষা করার কালে রাহেলা দেখল :

> 'আসাদের মা দুইহাতে কয়েকটা ছোট পুঁটুলি উঁচু করে ধরে ওই ঘরটা থেকে নেমে এ ঘরের দিকে (যেখানে রাহেলা অপেক্ষমান) আসছেন। ছোট্টখাট্ট মানুষ, পানি তার বুকসমান। ঘোলাটে পানিতে ভাসছে কত কি জঞ্জাল, খড়কুটো, মানুষের মল। সেই সমস্ত নোংরা দুর্গন্ধ জঞ্জালের ভেতর দিয়ে একবুক পানি উজিয়ে আসাদের মা আসতে লাগলেন।'

জাহানারা গল্পের সমাপ্তি টেনেছেন রাহেলার চোখে দেখা এই বর্ণনাংশে, নির্লিপ্ত চিত্তে—সহজ সরল ভাষার আশ্রয়ে। বিক্ষোভের ঝড় নেই, করুণ রস উদ্রেকের প্রয়াসও অনুপস্থিত। কিন্তু শহীদ-জননীর অস্তিত্বের এই কাহিনী ইতিহাসের বহতা ধারায় এক কঠিন সত্যের খোঁজে পাঠকহৃদয়কে অন্বেষী করে তোলে। রুদ্ধ কণ্ঠে ধ্বনি ওঠে,

'বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা'
… … … …

জীবনমৃত্যু—জাহানারা ইমাম। অনিন্দ্য প্রকাশন, ঢাকা-১। পঁয়ত্রিশ টাকা।

জাবন থেকে—হোসনে আরা শাহেদ। নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা-১। চল্লিশ টাকা।

পঞ্চমন্ত্র—হোসনে আরা শাহেদ। পালক পাবলিশার্স, ঢাকা-২। পঁচিশ টাকা।

জাহানারা ইমাম জয়ী। বাস্তব পৃথিবীর হাজারো আসাদের মার জন্য ব্যাকুলতায় পাঠকচিত্তকে তিনি পূর্ণ করতে পেরেছেন।

জাহানারার "জীবনমৃত্যু"র অন্তর্ভুক্ত আটটি গল্পের ছয়টি গল্প মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত। অপর দুটি, নেই মামা আর স্বপ্নের দালান গল্প গঠনে লেখক-প্রতিভা ভিন্ন উপকরণ সংগ্রহে ব্যয়িত। নেই মামায় নারী-মুক্তি তথা নারীর অধিকার রক্ষার প্রতি সম্ভ্রম এবং সশ্রদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয়েছে। ঝুমি, তুলি ও মিতু তিন বন্ধু। এদের স্বতন্ত্র দুর্গে পুরুষশাসিত সমাজের আক্রমণ। জাহানারা ভ্রূকুটি হেনেছেন পরাভবকে। বিজয়মাল্য অর্পিত হয়েছে নারীমুক্তির আয়োজনে। গল্পের বলিষ্ঠতা কিঞ্চিৎ ম্রিয়মাণ প্রত্যাশিত সংযমের অভাবে। সমাপ্তি অংশে ঝুমার স্বীকারোক্তি অনাবশ্যক, মূল অভিপ্রায় প্রকাশেও ব্যর্থতাকে ডেকে আনে। স্বপ্নের দালান গল্পের অন্তর্ভুক্তি এই গল্পসংকলনে সার্থক বলে মেনে নিতে অস্বস্তি হয়। হয়তো উঠতি ধনীদের শহর-কেন্দ্রিক মনোভাবের প্রতি তির্যক দৃষ্টি, বা 'যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে' সে মাটির প্রতি গভীর মমত্ববোধে জাহানারা অগ্রসর হয়েছেন। কিন্তু গল্পগঠনের দুর্বলতা কোনো অভিপ্রায়কে ব্যক্ত করতে পারে নি। সে কারণে সমাপ্তি অংশে রহিমা বিবির সংলাপ আকস্মিক, আরোপিত বলে অনুভূত হয়।

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত গল্পচতুষ্টয়ের অন্যতম আবার আসিব ফিরে গল্পটিতে দেশের জন্য জীবন তুচ্ছ করার সংকল্পটি ভাস্বর। পাক আর্মির দানবীয় উৎপীড়ন বাংলাদেশের জ্যোতিষ্মান হৃদয়কে নিষ্প্রভ করতে পারে নি, এই ভাববীজ গল্পের মুখ্য আশ্রয়। জীবনমৃত্যু গল্পটি বাংলা ছোটোগল্পের ভাণ্ডারে অনন্যতন্ত্রতার দাবি রাখে। বাঙালি যুবক গেরিলা যুদ্ধে বাংলার মাটিকে দুর্জয় ঘাঁটিতে পরিণত করেছিল, এর স্বাক্ষর রয়েছে জীবনমৃত্যু গল্পে। সমুচ্চ রোমানটিক উদ্দীপনায় জীবনকে তুচ্ছ করার যৌবন-উল্লাস সক্রিয় করে তোলা প্রতিভা-সাপেক্ষ। এই গল্পের প্রতিটি ছত্রে জাহানারা স্পন্দিত করেছেন—'এই যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে?'

বাস্তব প্রত্যক্ষ জীবনে জাহানারা ইমাম বীরজায়া, বীর-জননী। তাঁর এই বীরাঙ্গনা-মূর্তি রূপ নিয়েছে "জীবনমৃত্যু"র গল্পগুলিতে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে জাহানারার গৃহপ্রাঙ্গণ থেকে। এই যুদ্ধকে তিনি সঞ্চার করেছেন সাহিত্যের বৃহত্তর প্রাঙ্গণে। অকৃত্রিম শিল্পচেতনায় বাস্তব সত্যকে অধিকতর সত্যরূপে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

রায়বাঘিনী গল্পে স্থান পেয়েছে বিপ্লবী-জননীসত্তা। শত্রু-অধ্যুষিত অঞ্চলে মার কাছে আকস্মিক উপস্থিত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধা আসেম আর রকিব। মাতৃপ্রাণ সমস্ত সংস্কারকে দূরে ঠেলে বুকে তুলে নিলেন বিপ্লবী পুত্র আসেম আর তার বন্ধু রকিবকে। সামান্য উপকরণ, অথচ মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে মানবসম্পর্কের পরিসরে জাহানারা উপহার দিলেন অসামান্যা জননীকে, যে জননীর স্নেহজাহ্নবী হৃদয়ের অভ্যন্তরে বহ্নিমান আগ্নেয়গিরি। জননীর অসামান্য প্রদীপ্তি পাগড়ী গল্পে। মা-মনিরা মুক্তিযুদ্ধে হারিয়েছেন একমাত্র পুত্র রবিনকে। বীরশয্যায় শায়িত পুত্র রবিনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে একফোঁটা অশ্রু তিনি বর্ষণ করেন নি। অপরকেও ভর্ৎসনা করেছেন কান্না-প্রকাশে। একদিন পুত্রহারা জননীর কাছে আগমন ঘটল সহযোদ্ধাদের। মনিরা তাদের দেখাতে গেলেন রবিনের প্রথম জন্মদিনের ছবি। অকস্মাৎ নেমে এল জননী-হৃদয়ের বহুসঞ্চিত বর্ষণ। 'মনিরা অচেতন হয়ে পড়ে ডুবে গেল সে পানির অতল তলে।' গল্পের অবলম্বন বাৎসল্যরস। এই রসধারায় প্রবহমান চিরঞ্জীব বাণী : শোক হোক শক্তি!

রায়বাঘিনী ও পাগড়ী গল্পদুটি পাঠান্তে 'চৈতালী' পর্বে বীর সন্তানের জন্য জননীর কাছে রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা আবৃত্তি করার ইচ্ছা দুর্মদ হয়ে ওঠে,

দীর্ঘ গর্ভবাস হতে জন্ম দিলে যার
স্নেহগর্ভে গ্রাসিয়া কি রাখিবে আবার?
চলিবে সে এ সংসারে তব পিছু পিছু?
সে কি শুধু অংশ তব, আর নহে কিছু?
নিজের সে, বিশ্বের সে, বিশ্বদেবতার
সন্তান নহে গো মাতঃ সম্পত্তি তোমার।
… … … …

বিশ্বের সকল সংগ্রামী অভিযাত্রীদের কাছে জাহানারা ইমামের সৃষ্ট মাতৃমূর্তি অক্ষয় হয়ে রইল।

হোসনে আরা শাহেদের "জাবন থেকে" গ্রন্থটির প্রকাশনা সংস্থার একটি ঘোষণা দেখা গেল। 'নাসাস প্রকাশিত একটি নিবন্ধগ্রন্থ'—এরকম ঘোষণা অনুল্লেখ থাকলে 'জীবন থেকে" গ্রন্থটির পরিচয় সম্পর্কে সংশয় থেকে যেত। হোসনে আরা শাহেদ অভিজ্ঞতার প্রস্তুতিভূমিতে যে লেখনী চালনা করেছেন, তা গল্পের আবেদনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তথ্য ও তত্ত্ব, বিচার ও বিশ্লেষণকে আড়াল করে সমধিক আগ্রহ প্রতিফলিত হয়েছে প্রাথিত রসে বিষয়কে বিলীন করার সাধনায়।

প্রবন্ধ নিবন্ধের স্থান বিদ্বান সভায় নয়, সাহিত্যের আসরে, হৃদ্‌বৃত্তির সংযোগে। স্বাচ্ছন্দ্যদানে সকলকেই নিরন্তর শিল্প-চেতনা প্রখর রাখতে হয় নানাবিধ উপকরণ ও উপায়কে খুঁজে নিতে। হয়তো "জাবন থেকে" গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত আটটি নিবন্ধকে বিশেষ কৌলীন্য দানের আয়োজনে শাহেদের এ এক ভিন্নতর রুচি ও মর্জি।

আগে পরে, কাগজের বাইরে, স্বপ্নের লাশ, প্রত্যাবর্তন ও তীর্থস্থান—এই পাঁচটি নিবন্ধে শাহেদের অভিজ্ঞতার পরিক্রমা মানবজীবনের পহেলা প্রহরের পথে। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এই পথ দোসরা প্রহরে সংক্রামিত। সকল ক্ষেত্রেই শাহেদের পর্যবেক্ষণশক্তি ক্রিয়াবান। তবে, রূঢ় কঠিন বিচারবিশ্লেষণভূমিতে কেবল স্নিগ্ধ মধুর রসের বহতা ধারা। মানবশিশুর সুখস্বর্গচ্যুতিতে শাহেদ-হৃদয় বেদনাহত। কার্যকারণের উদ্দেশ্যে আঘাত অপেক্ষা দীর্ঘশ্বাসের সঞ্চার।

আগে পরে-তে স্থান নিয়েছে দরিদ্র স্কুলশিক্ষক পুত্র বট্ট ও শিল্পপতির কনিষ্ঠ সন্তান পেপসর শৈশবের সখ্য। বয়ঃক্রমে সখ্য অক্ষুণ্ণ থাকে নি। Conditioned reflex। পরিবেশ পেপসিকে শিখিয়েছে দরিদ্র বন্ধু বট্টর জন্য ধনীর স্বার্থোদ্ধত স্বভাব বিসর্জন দেওয়া যায় না। রূঢ় বাস্তব। তথাপি লেখনাগুণে কেন যেন Wordsworth-এর পঙ্‌ক্তি মনে পড়ে,

At length the Man perceives it die away,
And fade into the light of common day.

প্রত্যাবর্তনে ভিন্ন সুরে একই কথা বলা হয়েছে। দরিদ্র পিতার অশ্রু-ঘর্ম-রক্তের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত সন্তান বয়ঃক্রমে পিতার প্রতি কর্তব্যপালনে উদাসীন। ছদ্মগাম্ভীর্যে মূল্যবোধের বিবর্তনের কথা পিতার মুখে উল্লেখিত হয়েছে বটে, আসলে শাহেদ প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, আধুনিক শিক্ষা ডাক্তার, মাস্টার, উকিল তৈরি করে—মানুষ করে না; মনুষ্যত্ব অর্জনের শিক্ষা দেয় না।

কাগজের বাইরের কিশোর রবি খবরের কাগজের প্রতি ভক্তিবশতই খবরের কাগজ বিক্রয়ের কাজে নিযুক্ত হয়েছিল। তার বিশ্বাস ছিল খবরের কাগজ সত্য সংবাদই পরিবেশন করে এবং সত্য সংবাদ প্রকাশে নির্ভীক। স্বভাবতই রবির বিশ্বাস ভাঙতে দেরি হয় নি। এবং সে কারণেই সত্য-প্রতিষ্ঠাকল্পে তাকে আত্মাহুতি দিতে হল। কাগজের

বাইরেতে শাহেদের যৌবন-সংকল্প খুঁজে নেবার অভিপ্রায়। স্বপ্নের লাশ ও তীর্থস্থানে যথাক্রমে শিশুশিক্ষা ও নারীশিক্ষার ওপর আঘাতের কথা। স্বপ্নের লাশে শিশু বুলবুলিকে পড়া ছেড়ে বিদ্যালয়ের পরিচারিকার কাজ নিতে হয় আর তীর্থস্থানে গৃহবধূ জানায়, শ্বশুর-শাসিত জীবনের সংবাদ। গৃহবধূটি শৈশবে প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রী হিসেবে স্বপ্ন দেখেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের দেউড়ি পার হবার; হয় নি। আশংসিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে শাহেদ সার্থক। কোনো মতবাদের বঙ্কিম দৃষ্টি ব্যতিরেকেই তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিদ্যমান ধনের অসাম্য ও সামন্ততান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার প্রতি পাঠকের ভ্রূকুটি নিক্ষিপ্ত হয়।

নতুন হাওয়ায় এক ফেরিওয়ালাকে কেন্দ্র করে শাহেদের শ্লেষ। 'উন্নতির জন্য, উন্নয়নের জন্যে জীর্ণতা বড় বাধা···। এজন্যই সদ্য উন্নত এবং আরো উন্নয়নশীল পুরনো ঢাকায় পুরনো জীর্ণরা থাকলে চলবে না।' এই শ্লেষ সঞ্চারিত ত্রিশঙ্কুর জাতিতে। বধির ও পাষাণ সমাজের কাছে তিনি পৌঁছে দিয়েছেন, বিত্তবানের বিত্তের গৌরবের কাছে লেখকের লেখার সৌরভ নিষ্প্রভ হওয়ার কাহিনী। ত্রিশঙ্কুর জাতিতে শাহেদের ভর্ৎসনা তীব্র আর নির্মম। ভিন্ন সুর উঠেছে 'নাছোড় ছায়ায়'। দরিদ্র হীনশ্রী জীবন থেকে শাহেদ সংগ্রহ করেছেন পাতিব্রত্যে উজ্জ্বল কমলাকে। গভীর বেদনায় স্পর্শ করতে চেয়েছেন। কিন্তু নিরর্থক দীর্ঘশ্বাসে প্রতিভা নিঃশেষিত হয় নি। কর্তব্যবুদ্ধি-ধর্মবুদ্ধি বিরহিত পতিদেবতার ওপর বর্ষিত হয়েছে শাহেদের শাণিত আক্রমণ। 'নাছোড় ছায়ায়' ব্যক্তিজীবনকে স্পর্শ করার আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষাকৃত অধিক।

সহজাত সরলতা ও সরসতা শাহেদের সূক্ষ্মতর শিল্পকর্মের অধীন। "জীবন থেকে" গ্রন্থটিতে সর্বত্রই সহৃদয় রসকল্পনার প্রসন্নতা।

হোসনে আরা শাহেদ "পঞ্চমমন্ত্র" গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন আঠারোটি প্রবন্ধ। জীবনপরিক্রমায় নানা মানুষ, নানা ঘটনা, নানাবিধ সংবাদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য। এই সান্নিধ্যই প্রবন্ধগুলির উৎস। সংকলিত গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে বিচার-বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যান অপেক্ষাকৃত স্বল্প, অধিক স্থান অধিকার করেছে বিষয়ীর উল্লাস। বেশির-ভাগ প্রবন্ধেই মধ্যবিত্ত মানসিকতার প্রতি তির্যক দৃষ্টি, উন্মার্গতার প্রতি ভ্রূকুটি। মেকি ভণ্ডামি অসাধুতার ওপর রসিকতার উত্তপ্ত প্রলেপ।

এ ধরনের প্রবন্ধশ্রেণীকে মননপ্রধানরূপে বিবেচনা করেছেন অনেকে। কেউ কেউ অভিহিত করেছেন রম্যরচনা নামে। আবার নকশা রূপে চিহ্নিত করার ঝোঁকও দেখা যায় মাঝে-মাঝে। কালীপ্রসন্ন-বঙ্কিমচন্দ্র-ইন্দ্রনাথ পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ থেকে বুদ্ধদেব বসু-সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রসন্নতায় এসব প্রবন্ধে উচ্চশোভিত শ্রী। হাল আমলে, ক্ষীণ হাসির যুগে এরকম প্রবন্ধ রচনার আয়োজন দৈনিক সংবাদপত্র সাপ্তাহিকের দৌলতে নজরে আসে বটে, কিন্তু সেখানে নিছক চটক মজা স্ফূর্তি। কবি-কল্পনাশূন্য লঘুচপল ঠাট্টা। হোসনে আরা শাহেদের "পঞ্চমমন্ত্রে"র প্রবন্ধগুলি ব্যতিক্রম। সর্বত্রই সাহিত্যপ্রাণতা।

রসিকতার অনুরোধে শাহেদের লেখনী পরিচালিত হয় নি। সকল প্রবন্ধেই গভীর জীবনবোধের প্রসার। তাঁর রচনা ঠাট্টা-বিদ্রূপ নয়, লোকজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। তবে, শাহেদ বৈদগ্ধ্যে, চাতুর্যে, বাকসংযমে অনির্বচনীয় উচিত্যরক্ষায় সফলতা অর্জন করেছেন, এরকম অনুভূতিতে পরিতৃপ্তি লাভ করা গেল না। অনেক ক্ষেত্রেই শব্দসংযোজনায়, বাক্যগঠনে প্রতিভার সুসংহতি অপেক্ষা কৈশোরিক উল্লাস পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ধরনের প্রবন্ধে অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগই প্রত্যাশিত। শব্দসংযোজনায়, বাক্যগঠনে কৃত্রিম প্রয়াস ব্যর্থতাকেই আহ্বান করে। দৃশ্যমান কোনো স্বাদ বা উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্যপ্রকাশে সমর্থ হয় না। তথাপি হোসনে আরা শাহেদকে সংবর্ধনা জানাতেই হয়। মূল্যবোধশূন্য হীনশ্রী যুগে হালকা রঙ্গপটু মনের ভাবনায় পাঠকহৃদয়ে তিনি মূল্য সঞ্চয় করার সুযোগ দিয়েছেন।

বাংলা ভাষার প্রথম পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ

মৃণাল নাথ

১

আজ থেকে একশো বছর আগে রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে বলেছিলেন : 'প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের একটু ইতস্ততঃ করিয়া তাহাকে বাংলা ব্যাকরণ নাম দেওয়া হয় (ঠাকুর ১৮৮৫ : ২৭৪)। রবীন্দ্রনাথের এ মন্তব্যের এক যুগ পরে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখেন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ "উপসর্গের অর্থবিচার" (১৮৯৭, ১৮৯৮)। কেউ কেউ মনে করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই 'অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন প্রবন্ধটিতেই সুস্পষ্টভাবে বিকশিত হয় নব ব্যাকরণদৃষ্টি' (আজাদ ১৯৮৪ : চল্লিশ)। বস্তুত, বিশ শতকের গোড়াতেই সাহিত্য পরিষদের নেতৃত্বে শুরু হয় একটি "আন্দোলন"—যাকে ব্যাকরণআন্দোলন বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। আমরা কিছুদিনের ব্যবধানে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় দেখতে পাই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৯০১), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০১) এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রবন্ধ, রবীন্দ্রনাথের অন্য একটি প্রবন্ধ পরবর্তী বৎসরে প্রকাশিত হয় "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় (ঠাকুর ১৯০২)। বাংলা ব্যাকরণ কেমনটি হবে, তার কাঠামো নিয়ে তীব্র বিতর্ক, বাদানুবাদ চলে; পণ্ডিতেরা দুটি শিবিরে ভাগ হয়ে যান, একদল প্রকৃত বাংলার ব্যাকরণ চান, তাঁরা বাংলাকে একটি স্বতন্ত্র, স্বাধীন ভাষা হিসেবে দেখতে চান, অন্যদল চান বাংলা ব্যাকরণ হবে সংস্কৃত ব্যাকরণের আদলে।

বাংলা ব্যাকরণ কেমনটি ছিল তখনকার দিনে তা আমরা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর (১৯০১) নিবন্ধ থেকে জানতে পারি। তিনি বাংলা ব্যাকরণের তিন রকমের প্যাটেন্টের কথা উল্লেখ করেছেন, একটি হল, 'মুগ্ধবোধ প্যাটেণ্ট গ্রন্থকার সংস্কৃত পণ্ডিতগণ, আর একটি হাইলি প্যাটেণ্ট গ্রন্থকার মাষ্টারগণ। এক প্যাটেণ্টে সংস্কৃত সূত্রগুলির তর্জমা, আর এক প্যাটেণ্টে ইংরেজী রুলগুলির তর্জমা।' 'বাঙ্গালা ভাষা যে একটা স্বতন্ত্র ভাষা উহা যে পালি, অর্ধমাগধী, সংস্কৃত, পার্সি, ইংরেজী প্রভৃতি নানা ভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে, গ্রন্থকারগণ সে কথা একবারও ভাবেন না। অনেকে আবার দুই প্যাটেণ্ট মিশাইয়া এক প্রকার খিচুড়ী প্রস্তুত করেন।···তাহাতে যুক্তির লেশমাত্রও নাই, বহুদর্শিতার নামও নাই।' তাঁর মতে বাংলা ভাষার কোনো ব্যাকরণই নেই, বাংলা ব্যাকরণের নামে শিশুদের যা পড়ানো/শেখানো হয় তা বাংলা ব্যাকরণের ছদ্মবেশে সংস্কৃত ব্যাকরণ মাত্র। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও (১৯০১) ঐ একই সময়ে জোরের সঙ্গেই বলেন : 'খাঁটি বাঙ্গালা ব্যাকরণ এখনও অস্তিত্বহীন। বাঙ্গালার যে অংশ সংস্কৃত হইতে ধার করা নহে, সে অংশ খাঁটি বাঙ্গালা, সে অংশের ব্যাকরণ নাই। সে অংশের ব্যাকরণ এখন গড়িতে হইবে; খাঁটি বাঙ্গালা আলোচনা করিয়া তাহাকে খাড়া করিতে হইবে।'

রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর প্রমুখের আহ্বানকে স্মরণ করেই প্রথম খাঁটি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করার প্রয়াস করেন যোগেশচন্দ্র রায়বিদ্যানিধি (১৯১২)। এই ব্যাকরণ যদিও উত্তম, তবুও একে বাংলা ভাষার পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ বলা সঙ্গত হবে না। এর পর যিনি এ কাজে ব্রতী হলেন তিনি পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপ-মহাদেশের ভাষাবিদদের অন্যতম মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌। তাঁর ব্যাকরণের প্রথম সংস্করণ বেরোয় ১৯৩৬ সালে। তিনি তাঁর নিজের ব্যাকরণ সম্পর্কে বলেন : 'ইহাতে খাঁটি বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ আছে তেমনই সাধু বাঙ্গলা ভাষার সংস্কৃত উপাদান-এর ব্যাকরণ আছে' (শহীদুল্লাহ ১৯৬৯ : ।০)। শহীদুল্লাহ্‌ সাহেব খাঁটি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ-লিখেছেন ঘোষণা করলেও, সংস্কৃতের মায়াজাল তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। শহীদুল্লাহ্‌-সাহেবের ব্যাকরণের তিন বছর পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের যুগান্তকারী ব্যাকরণ-পুস্তক "ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ"। গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানতে পারি, এই ব্যাকরণ তিনি লিখতে আরম্ভ করেন ১৯৩২ সালে, ১৯৩৬ সালে লেখা সম্পূর্ণ হয়। তাঁর ব্যাকরণের পাণ্ডুলিপি ছাপাখানায় দেওয়া হয় ১৯৩৮ সালে এবং প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালে (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪২, এবং তৃতীয় সংস্করণ ১৯৪৫ সালে)। তাঁর গ্রন্থ সম্পর্কে তিনি ভূমিকায় আমাদের জানান : 'বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ বলিলে যাহা বুঝি, বইখানিতে তাহারই আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বাঙ্গালা ভাষার "সাধু" ও "চলিত" উভয়বিধ রূপই আলোচিত হইয়াছে। সাধারণত বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণে ভাষাগত সংস্কৃতমূলক শব্দ লইয়াই বেশি কথা থাকে। আমি যথারীতি বাঙ্গালার সংস্কৃত শব্দাবলীর বিচার করিয়াছি এবং সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনি ও উচ্চারণ এবং ব্যাকরণঘটিত বাঙ্গালার বিশিষ্ট বা স্বকীয় নিয়ম বা পদ্ধতি নির্ণয় করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছি। উচ্চারণ ও বর্ণবিন্যাস এবং ব্যাকরণ বিষয়ে খাঁটি বাঙ্গালার স্বকীয় রীতির নির্দেশ না থাকিলে, বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণকে সম্পূর্ণাঙ্গ বলা চলে না। প্রস্তুত পুস্তকে বাঙ্গালা ভাষার ঐতিহাসিক আলোচনা নাই, কিন্তু ঐতিহাসিক বিচারের আধারেই আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ ইহাতে করিবার যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছি।' (চট্টোপাধ্যায় ১৯৪৫ : ১/০—১৵০)

ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রথম রূপা সংস্করণ ১৯৮৭। দাম : ৫০ টাকা।

২

বাংলা ব্যাকরণ কেমনটি হওয়া উচিত—এ প্রশ্ন তুলেছিলেন আচার্য সুকুমার সেন। তিনি তাঁর নিবন্ধে (সেন ১৯৭৮) একটি খসড়া রূপরেখাও দিয়েছিলেন—তা এক কথায় অসাধারণ। পরবর্তী কালে তিনি (সেন ১৯৮৭) চলিত বাংলার ব্যাকরণগত কাঠামোও আমাদের উপহার দিয়েছেন। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ কেমন হবে, ইস্কুল-পাঠ্য ব্যাকরণই বা কেমন হবে, তা আমরা জানতে পারি পবিত্র সরকারের প্রবন্ধ থেকে (সরকার ১৯৮৩ক, ১৯৮৮)। ভাষাতত্ত্বের এই চূড়ান্ত বিজয়ের যুগে বসে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কেমন ব্যাকরণ রচিত হবে, তার তাত্ত্বিক দলিল হাজির করা, অথবা একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ উপস্থাপিত করা তেমন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু আজ থেকে ৫০ বৎসর পূর্বে বাংলা ভাষার একটি সার্বিক এবং পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনা করা কেমন কাজ ছিল তা আমাদের ভেবে নিতে তেমন বেগ পেতে হয় না।

যে কথা বলছিলুম। বিতর্ক শুরু হয়েছিল বিশ শতকের শুরুতে—বাংল ভাষার প্রকৃত ব্যাকরণ তৈরি করতে হবে অথবা খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ তৈরি করতে হবে। এখন প্রশ্ন হল, বাংলা ভাষার যে ব্যাকরণ হবে তাতে কী কেবলই "প্রাকৃত" উপাদান থাকবে? বাংলা কী সংস্কৃত বা অন্য ভাষাকে আত্মসাৎ করে নি? সেই সব উপাদান কী উপেক্ষিত হবে? বাংলা ভাষা মানে কী শুধুমাত্র চলিত ভাষা? ভাষাবিজ্ঞানীরা এককালে বলতেন, বাংলার সংস্কৃত অংশের জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্বারস্থ হলেই চলবে, বাংলা ব্যাকরণ থেকে তাকে বিসর্জন দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে যে rational চিন্তাধারা তাও পাই রবীন্দ্রনাথে। তিনি স্পষ্ট করেই জানান যে প্রাকৃত বাংলার ব্যাকরণে সংস্কৃতের নিয়মাবলী যেমন জোর করে চাপিয়ে দেওয়া চলবে না, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে যে সংস্কৃত থেকে ধার করা অংশকেও অবহেলা করা চলবে না। সত্যিকারের বাংলা ব্যাকরণে তাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। [এ বিষয়ে বর্তমান লেখকের আলোচনা দ্রষ্টব্য : নাথ ১৯৮৮]।

এই কথার সূত্র ধরেই আরেকটি বিষয়ের দিকে এগোতে পারি। বাংলা ভাষার দুটি রূপ বা রীতি আছে। তাকে বলা হয় সাধু ও চলিত। এই দুই রীতিতেই সাহিত্য রচিত হয়েছে, হচ্ছে। সাধু ভাষা পুরোপুরিই সাহিত্যের বাহন, কদাপি কথ্য ভাষা হিসেবে ছিল না। চলিত ভাষা কথ্য ভাষারই মান্য রূপ। সাধু ও চলিতের মধ্যে তফাত খুবই সামান্য, সর্বনামের কিছু রূপে, ক্রিয়াপদে এবং অন্যান্য কিছু পরসর্গে। সাধু ও চলিতের মধ্যে যে পার্থক্য তা কয়েকটি সূত্রের দ্বারাই ধরা যেতে পারে। এরকম কয়েকটি সূত্রের কথা জানিয়েছেন শিশিরকুমার দাশ (১৯৮৫-০৬)। এ কথাটা এখানে বলা হল এ কারণে যে যেহেতু বাংলা ভাষার এই দুই রীতি রয়েছে, বাংলা ভাষার যে ব্যাকরণ হবে তাতে এই দুই রীতিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে—না হলে সে ব্যাকরণ হবে এক খণ্ডিত ব্যাকরণ, বাংলা ভাষার পূর্ণ বা সার্বিক রূপ তাতে থাকবে না।

৩

সুনীতিকুমারের "ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ" প্রকাশিত হয় আজ থেকে পাঁচ দশক পূর্বে। বস্তুত, বাংলা ব্যাকরণে তখন এক বিরাট নৈরাজ্য বিরাজ করছিল। সুনীতিকুমারই প্রথম ব্যক্তি যিনি একটি সার্থক এবং পূর্ণাঙ্গ বাংলা ব্যাকরণ আমাদের উপহার দিলেন। শুধু তাই বলব না, বলব তিনি একটি encyclopaedic ব্যাকরণ আমাদের কাছে উপস্থাপিত করলেন। ব্যাকরণের বিষয়বস্তু কী? আমরা সকলেই জানি ব্যাকরণের বিষয়বস্তু তিনটি : ১. ধ্বনিতত্ত্ব, ২. রূপতত্ত্ব, এবং ৩. অন্বয় বা বাক্যরীতি। তাঁর এই ব্যাকরণে এই তিনটি বিষয় যথাযোগ্য মর্যাদায় এবং বিশ্লেষণের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছে। শুধু তাই নয়, তিনি আলাদা আলাদা ভাবে নির্দেশ করেন কোন্ নিয়মগুলি খাঁটি বাংলার, আর কোন্‌টিই বা তৎসম বা সংস্কৃত সম্বন্ধে প্রযোজ্য। সংস্কৃতের পোশাক তিনি কখনো বাংলা ভাষার গায়ে পরান না। তিনি সংস্কৃতকে তাঁর ব্যাকরণে রেখেছেন বটে, তবে, তিনি বলে দেন যে তা সংস্কৃত ব্যাকরণের, এবং খাঁটি বাংলা মৌখিক সন্ধির উদাহরণও দেন। তেমনি রূপতত্ত্বের বেলায় বাংলা প্রত্যয় যেমন দেখান, তেমনি উদাহরণ দেন সংস্কৃত বা বিদেশী প্রত্যয়েরও।

বর্তমানে বিতর্ক উঠেছে বাংলার কারক-বিভক্তি নিয়ে। চার্লস ফিলমোরের মডেলে এ বিষয়ে কিছু প্রবন্ধও বেরিয়েছে (সরকার ১৯৮৩খ; মোরশেদ ১৯৮৮)। যেহেতু পুস্তকটি পুনর্মুদ্রণ, কিছুতেই প্রত্যাশিত নয় যে আজকের কারক-তত্ত্ব অনুসারে তিনি বাংলার কারক-বিভক্তি দেখাবেন। সমাসের বেলায়ও সেই একই কথা প্রযোজ্য। আমরা একথা কখনোই ভাবতে পারি না যে ১৯৩৯ সালে বসে সুনীতিকুমার আজকের ভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্দৃষ্টি পাবেন। তিনি তাঁর ব্যাকরণে সংস্কৃত ব্যাকরণের সাতটি কারককেই উপস্থিত করেন। সমাসের বেলায়ও তিনি সংস্কৃতের যাবতীয় শ্রেণীবিভাগ মেনে নিয়েছেন যান্ত্রিকভাবে। সমাস সম্পর্কে বিদেশে নোতুন চিন্তাভাবনা হচ্ছে। যে নোতুন, পূর্ণাঙ্গ, সার্বিক ব্যাকরণ পরে তৈরি হবে, তাতে তা দেখতে পেলেই আমরা খুশি হব। সুনীতিকুমার তার জন্যে রেহাই পেতে পারেন।

আজকের দৃষ্টিতে সুনীতিকুমারের "ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ"-এর অনেক ত্রুটিই হয়তো ভাষাবিজ্ঞানীদের চোখে পড়বে, আর যেহেতু তিনি নিজে ভাষাবিদ ছিলেন, তাঁর ত্রুটি অনেক বড়ো করে দেখানো হবে। তবুও একথা অনায়াসেই বলা যায় যে তাঁর "ভাষাপ্রকাশ"-এর মতো বাংলা ভাষার এমন গভীর অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ কেউ করতে পেরেছেন বলে জানি না। গত কয়েক দশক ধরে অনেক ভাষাবিজ্ঞানীই ভাষা-ক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন, 'সার্থক' বাংলা ব্যাকরণ হল না বলে হা-হুতাশ করেছেন। আজ পর্যন্ত কী একটিও খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ (স্কুলপাঠ্য নয়) আমরা পেয়েছি সেইসব বিদগ্ধজনের কাছ থেকে? সুনীতিকুমারের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই একজন বিশ্রুত ভাষাবিদ বলেন : 'এমন কি যে ব্যাপারে তাঁর প্রতি আমাদের আশা ছিল সবচেয়ে বেশী যে তিনি একটি সম্পূর্ণ যুক্তিনির্ভর সার্বিক বাংলা ব্যাকরণ লিখবেন, সেখানেও তিনি আমাদের আশা পূর্ণ করেন নি।' (দাশ ১৯৭৭ : ৩৫)। আমি জানি না তিনি "ভাষাপ্রকাশ" আদৌ পড়েছেন কিনা, পড়লে এমন মন্তব্য তিনি করতেন না। কারণ সুনীতিকুমারের ব্যাকরণই বাংলা ভাষার প্রথম সার্বিক, পূর্ণাঙ্গ এবং এ যাবৎ প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ বাংলা ব্যাকরণ। একজন প্রবীণ ভাষাবিদের কাছ থেকে, সুনীতিকুমারের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, এমন রূঢ় মন্তব্য শোনার জন্য অনেকেই প্রস্তুত ছিলেন না। (মন্তব্য রূঢ় এবং সত্য হলে কোনো কথা ছিল না, তা ছিল সমস্ত শালীনতাবিরোধী।) যোগেশচন্দ্র রায়বিদ্যানিধির ব্যাকরণ পূর্ণাঙ্গ নয়—একথা সকলেই স্বীকার করবেন, নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ব্যাকরণও পূর্ণাঙ্গ নয়, যদিও রবীন্দ্রনাথ মত প্রকাশ করেন যে তিনি তাঁর ব্যাকরণে বাংলা ও সংস্কৃত দুই অংশকেই খতিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছেন (ঠাকুর ১৯০৪)। অর্থাৎ উভয় ব্যাকরণই একদেশদর্শী। যে ব্যাকরণে বাংলা ভাষার সামগ্রিক বিশ্লেষণ, তার সমস্ত উপাদানের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা থাকবে, ভাষার নিয়ম আবিষ্কারের চেষ্টা থাকবে (দ্রষ্টব্য ত্রিবেদী ১৯০১) তাকেই আমরা সার্বিক, সার্থক এবং খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ বলব। সুনীতিকুমারের ব্যাকরণ সেদিকে এক অসামান্য পদক্ষেপ, তাঁর এক অনন্যসাধারণ কীর্তি—একথা আমাদের ভুললে চলবে না। এতৎসত্ত্বেও, তিনি তাঁর নিজের ব্যাকরণের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন, মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্বে তিনি বাংলাদেশের শিক্ষক ও পণ্ডিতদের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলেন যে তাঁরা যেন গতানুগতিক ও চিরপোষিত নানা ধারণা যেগুলি যুক্তিসহ ইতিহাসসম্মত নয় সেগুলো পরিহার করে, বাংলা ব্যাকরণের চর্চায় নূতন দৃষ্টিভঙ্গির বিচারশৈলীর প্রবর্তনে ও প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন (চট্টোপাধ্যায় ১৯৭৪)।

৪

সুনীতিকুমারের "ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ" পুনঃপ্রকাশ করার জন্যে প্রকাশককে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এমন একটি জরুরি কাজ করেছেন বলে। এই ব্যাকরণের যেমন উপযোগিতা রয়েছে তেমন রয়েছে একটি পুরামূল্য সেই হিসেবে পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন ছিল। তবুও বলব, সুনীতি-কুমারের আহ্বানকে (চট্টোপাধ্যায় ১৯৭৪) স্মরণ করেই এই গ্রন্থের একটি সম্পাদিত সংস্করণ (মূলকে অক্ষুণ্ণ রেখে) পেলেই ভালো হত। যেমন আমরা পেয়েছিলুম রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাঙ্গালার ইতিহাস" (১৯৭১ এবং ১৯৭৪ সালে)। ইতিহাসের ব্যাপারে নোতুন তথ্য পাওয়া যায়, ইতিহাসকে নোতুনভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। ব্যাকরণের সূত্রগুলি যদিও একই থাকে, ব্যাকরণের ক্ষেত্রে অনেক নোতুন তত্ত্ব আসে, সেই তত্ত্বের আলোকে ব্যাকরণকে নব নব রূপে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করা হয়। তবুও আমাদের লাভ এটুকু যে পরিশিষ্টে প্রকাশক 'লেখকের অভিপ্রেত পরিমার্জনা' সংযোজন করেছেন। প্রকাশকের নিবেদনে জানতে পারি যে ভাষাচার্য 'তাঁর প্রয়াণের পূর্বে মূল গ্রন্থটির আমূল সংস্কার করেছিলেন।' বস্তুত, সুনীতিকুমার যা করেছিলেন, তা পরিমার্জনা মাত্র, আমূল সংস্কার নয়। আমূল সংস্কার হলে আমরা অন্য একটি গ্রন্থ হাতে পেতুম। এই পরিমার্জনার কিছু ফটোকপি থাকলে গ্রন্থটির মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পেত বলেই মনে হয়। আশা করি ভবিষ্যতে কোনো সংস্করণে তাঁরা

তা করবেন এবং সংশোধিত একটি সম্পাদিত সংস্করণের দিকে মনোযোগী হবেন ॥

উল্লেখপঞ্জি

আজাদ, হুমায়ূন (সম্পা.) ১৯৮৪ বাঙলা ভাষা। ১ম খণ্ড। ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার ১৯৩৯ ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। কলকাতা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

—১৯৭৪ 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একাশিতম প্রতিষ্ঠা দিবসে সভাপতির অভিভাষণ'। কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ১৮৯৭ 'উপসর্গের অর্থবিচার'। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৪ : ৪. ২৪১-২৪৬।

—১৮৯৮ 'উপসর্গের অর্থবিচার'। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৫ : ২. ১১২-১৩৭।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৫ 'বাংলা উচ্চারণ'। বালক ১ : ৬. ২৬২-২৭৪।

—১৯০১ 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়'। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৮ : ৩. ১৩৭-১৫০।

—১৯০৪ 'ভাষার ইঙ্গিত'। ভারতী ২৮ : ৩. ২৬০-২৭১ ; ২৮ : ৪. ৩৪৮-৩৫৬।

—১৯৫৮ 'ব্যাকরণের ভূমিকা'। অন্যান্য নির্দেশ। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৫ : ১. ৪৩।

ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর ১৯০১ 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ'। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৮ : ৪. ২০১-২২৯।

দাশ, শিশিরকুমার ১৯৭৭ 'ভাষাচার্য সুনীতিকুমার'। অমৃত ১৬ : ৪২. ৩৪-৩৮।

—১৯৮৫-৮৬ 'মুখের বাংলা, লেখার বাংলা'। ভাষা ৪-৫. ২৭-৩৩।

নাথ, মৃণাল ১৯৮৬ 'ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়'। স্মরণাক্ষর ৩ : ৪. ৯-৩৭।

—১৯৮৮ 'রবীন্দ্রনাথ ও ভাষা-পরিকল্পনা'। চারুরঙ্গ ৪৯ : ৯. ২০-৩০।

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস ১৯৭৪ বাঙ্গালার ইতিহাস। ১ম, ২য় খণ্ড। সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা : নবভারত।

মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর ১৯৮৮ কারক সমীক্ষা : প্রাচীন ও নতুন প্রেক্ষাপট। সাহিত্য পত্রিকা ৩১ : ৩. ৫৭-১০০।

রায়বিদ্যানিধি, যোগেশচন্দ্র ১৯১২ বাঙ্গালা ভাষা : প্রথম ভাগ (ব্যাকরণ)। কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ ১৯৬৯ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ; প্রথম সংস্করণ ১৯৩৬। ঢাকা : প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরি।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ ১৯০১ 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ'। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৮ : ১. ১-৭।

সংকার, পবিত্র ১৯৮৩ক 'ইস্কুলের ব্যাকরণ কেমন হবে'। যুগান্তর ২০ মার্চ, ২১ মার্চ, ৩ এপ্রিল, ১০ এপ্রিল ১৯৮৩।

—১৯৮৩খ 'বাংলা কারক-বিভক্তি'। বিভাব ৬ : ৪. ১১৪-১২৩।

—১৯৮৮ 'স্থলপাঠ্য বাংলা ব্যাকরণ : ব্যাধি ও প্রতিকার'। অকাদেমি পত্রিকা ১. ৩৫-৬১।

সেন, সুকুমার ১৯৮৮ 'বাংলা ব্যাকরণ কেমনটি হওয়া উচিত'। রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা ১৬ : ৪. ২৮৫-২৯০।

—১৯৮৭ ভাষার ইতিবৃত্ত। পঞ্চদশ সংস্করণ। কলকাতা : ইস্টার্ন পাবলিশার্স।

নাটক

বিবিধের মাঝে মিলন

পঞ্চম জাতীয় নাট্যমেলা

অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়

নান্দী

নান্দীকারের পঞ্চম নাট্যমেলা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গত ৩রা থেকে ১০ই ডিসেম্বর। গত চার বছর ধরে নান্দীকার নিজেদের সার্থকনামা বলে প্রমাণ করেছেন। সংস্কৃত নাটকের সূত্রধারের মতো তাঁরা এই চার বছরে শুধু ভারতবর্ষে বিভিন্ন অংশের প্রাদেশিক নাট্যের নান্দীপাঠই করেন নি, তাঁদের সঙ্গে গভীর সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন পশ্চিম বাঙলার থিয়েটারকে। আজ তাই সমস্ত কলকাতার থিয়েটার-প্রেমীর কাছে নান্দীকার-নাট্যমেলা একটি বার্ষিক উৎসব, যার জন্য সারা বছর ধরে চলতে থাকে উন্মুখ প্রতীক্ষা। প্রতীক্ষাশেষে সমস্তাদীর্ণ, শতধা-বিভক্ত বাঙলা নাট্যজগৎ অন্তত কয়েক দিনের জন্য জীবন্ত, প্রাণবন্ত নাট্য ও নাটকের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ; অস্তিত্বের জটিল সংকটের মধ্যেও খুঁজে পায় আশার চর।

প্রস্তাবনা

৩রা ডিসেম্বর সন্ধ্যায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নান্দীকার প্রতিবারের মতো এবারও সংবর্ধনা জানালেন ভারতীয় থিয়েটারের পুরোধাদের—পশ্চিম বাঙলার কুমার রায়, কেরালার কে. এম. পানিক্কর, দিল্লির রাজিন্দর নাথ এবং কর্ণাটকের গিরিশ কারনাড। প্রত্যেককে দশ হাজার এক টাকার সম্মানমূল্য দেওয়া হল, এই কথা ঘোষণা করে নান্দীকারের কর্ণধার শ্রীকুত্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত জানালেন যে, দশ হাজার টাকার জাতীয় পুরস্কারের আর্থিক মূল্য বৃদ্ধির আশায় ওই এক টাকার ইঙ্গিত ; সংগীত নাটক আকাদেমীর পরিচালক হিসেবে শ্রীগিরিশ কারনাড এ কথা মনে রাখার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই সন্ধ্যার সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক উক্তিটি করলেন তিনি। জানালেন, এই নাট্যমেলায় এসে যথার্থ ভারতীয় থিয়েটারের একটি স্পষ্ট অবয়ব মূর্ত হয়ে উঠছে তাঁর চোখে।

১. প্রতিবেশী প্রযোজনা

এবার নাট্যমেলায় ভারতবর্ষের কয়েকটি রাজ্য এবং প্রতিবেশী দুটি দেশ তাঁদের প্রযোজনা নিয়ে এসেছিলেন কলকাতায়। নাট্যমেলার সূচনা এবং শেষ হল এই দুটি বিদেশী প্রযোজনা নিয়ে। প্রথম দিন, ৩রা ডিসেম্বর সকাল আর সন্ধ্যায় দুটি দল, "নাগরিক" এবং "থিয়েটার (ঢাকা)" যৌথভাবে পরিবেশন করলেন শেকসপীয়রের "ম্যাকবেথ" নাটকের বাঙলা অনুবাদ। কবি শামসুল হকের কলমে শেকসপীয়রের কাব্যনাটকের মৌল সত্তার তেমন কোনো হানি ঘটে নি, যদিও দু-একটি জায়গায় অতি-আনুগত্য সংলাপকে করেছে আড়ষ্ট। দৃষ্টান্ত হিসেবে দু-একটি পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে যেখানে ম্যাকবেথ গেছেন ডানকানকে হত্যা করতে, সেখানে উৎকণ্ঠিতা ম্যাকবেথ-পত্নী মূল নাটকে বলেন···the attempt and not the deed, / confounds us। এর অনুবাদ হিসেবে 'করা নয়, করার চেষ্টাই তবে ডোবালো'—সংলাপের স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য কেড়ে নেয়।

তেমনি তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে রাজা ম্যাকবেথ নিজের রাজকীয় অস্তিত্ব বিষয়ে মূলে যে মন্তব্য করেন, To be thus is nothing ; / But to be safely thus, তার আক্ষরিক বাঙলা অনুবাদ 'এটা হওয়া কিছু নয়, এটা হয়ে থাকাটাই কিছু' অভিনেতাকে বিব্রত এবং দর্শককে পীড়িত করে। অন্যদিকে Come sealing night / scarf up the tender eye of pitiful day (দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য)-র অনুবাদ হিসেবে 'এসো রাত, যে তুমি সেলাই করে দাও, চোখের পল্লব' শেকসপীয়রের কাব্যকে ছুঁতে পারে না। অথবা 'তোমার অভাব তার / স্বাস্থ্য যাতে আছে সমস্ত কিছুর-ঘুম', You lack the season of all natures, sleep" (তৃতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য)-এর বাঙলা সংস্করণ যথার্থতায় পৌঁছতে পারে না। পঞ্চম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্যের বিখ্যাত Tomorrow and tomorrow and tomorrow সংলাপের অনুবাদ 'দিন পরে দিন পরে দিন' ও মূলের কাব্যকে ধারণ করতে অক্ষম। একইভাবে চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে পলাতক রস মাতৃভূমি সম্বন্ধে বলে, 'It cannot be called our mother, but our grave' ; তার বঙ্গানুবাদ 'স্কটল্যাণ্ড দেশ নয় আর, কবর শুধু' মাতৃভূমি ও কবরের পরস্পর-বিরোধী দ্যোতনা এনে দিতে অসফল। পোর্টারের অংশটি অনুবাদে যথেষ্ট পদ্যগন্ধী হয়ে ওঠে নি, অন্যদিকে ডাকিনীদের মন্ত্রে "গতর"-এর মতো কথ্য শব্দের পাশে "মণ্ডুক" শব্দটি অত্যন্ত বেমানান লেগেছে। অথচ দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে ডানকান বিষয়ে শ্রীমতী ম্যাকবেথের মন্তব্য 'যদি তার ঘুমন্ত মুখ না দেখাতো আমার পিতার মতন', মূলের Had he not resembled / My father as he slept, অথবা ওই একই দৃশ্যে ম্যাকবেথ যখন তাঁর রক্তাক্ত হাতের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'বরুণের সাতটি সাগর পারবে কি এই রঙ ধুয়ে দিতে' তখন তা মূল Will all great Neptune's ocean wash this blood / clean from my hand ?-এর কাব্যিক ব্যঞ্জনা বহনে সক্ষম। প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে ডাকিনীদের Fair is foul, foul is fair-এর সুন্দর অনুবাদ 'শুভ অশুভ, অশুভ শুভ'। চতুর্থ অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে স্ত্রী-পুত্রহীন ম্যাকডাফকে ম্যালকম যখন বলে, 'শোকের পাথরে তবে তরবারি শানিত করুন' তখন তা শ্রোতা-দর্শকের কাছে মূল Be this the whetstone of your sword-এর স্বাদ এনে দিতে সার্থক হয়। তাই সামগ্রিক বিচারে "ম্যাকবেথ"-এর মতো সূক্ষ্মব্যঞ্জনাময় নাটকের কাব্যানুবাদ হিসেবে শামসুল হকের অনুবাদটি কোনোমতেই অবহেলার যোগ্য নয়।

কিন্তু এই কাব্যানুবাদই অভিনয়ের দুর্বলতায় শুনিয়েছে কৃত্রিম, প্রাণহীন। দুর্লভ কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ সময়েই অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এত বেশি সচেতন ছিলেন যে তাঁদের কাব্যনির্ভর সংলাপের ছন্দ বজায় রাখার প্রাণপণ চেষ্টায় নাট্য হয়েছে অন্তর্হিত। কুশীলবদের প্রায় প্রত্যেকেই শব্দ সম্বন্ধে একেবারে অন্যমনস্ক। কোন্ শব্দের কতটা গুরুত্ব হওয়া উচিত, কোন্ শব্দে তৈরি হতে পারে কী ছবি—এ বিষয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ অসচেতন। কোনো রকমে সংলাপ উদ্গার করে দিতে পারলেই যেন তাঁদের কর্তব্য শেষ। ম্যাকবেথের ভূমিকায় আলি যাকের এই প্রযোজনার দুর্বলতম অভিনেতা। ম্যাকবেথকে তিনি পুরোপুরি খলচরিত্রে রূপান্তরিত করতে সার্থক হয়েছেন। শেকসপীয়রের চরিত্রের যে ট্র্যাজিক দ্বন্দ্ব তা তাঁর রূপায়ণে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। অনভ্যাস বা প্রস্তুতি-হীনতার ফলে তিনি এবং অন্য কয়েকজন অভিনেতা বারবার সংলাপ বলতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছেন। লেডি ম্যাকবেথ হিসেবে ফেরদৌসী মজুমদার ঘুমের মধ্যে হাঁটার দৃশ্যে খানিকটা সফল হলেও অন্যত্র একেবারেই ব্যর্থ। ভালো লাগল ম্যাকডাফের ভূমিকায় তারিক আনাম খানকে। কিন্তু তাঁর আর ম্যাকবেথের তরবারি-যুদ্ধের অংশটি অত্যন্ত দুর্বল, প্রায় পাড়ার ক্লাবের প্রযোজনার মানের। চিকিৎসকের ছোট্ট ভূমিকায় রামেন্দু মজুমদার পরিমিত অভিনয়ে সার্থক। সংলাপ নিয়ে তাঁকে অতটা বিব্রত মনে হল না। প্রথমা ডাকিনী হিসেবে সারা জাকের বেশ অভিনয় করেছেন। ডানকান এবং ব্যাঙ্কোর ভূমিকায় যথাক্রমে আবুল হায়াত ও আতাউর রহমান ব্যক্তিত্ববর্জিত, দর্শকের মনে ছাপ ফেলতে অসমর্থ। বাচিক অভিনয় বা অভিব্যক্তিতে অক্ষম হলেও নির্দেশকের গুণেই সম্ভবত অভিনেতাদের চলাফেরা ও অন্যান্য আঙ্গিকাভিনয় উচ্চমানের।

পরিচালক ক্রিস্টোফার স্যাণ্ডফোর্ডের নির্দেশনায় তেমন কোনো অভিনবত্ব বা মৌলিক চিন্তা না থাকলেও, প্রযোজনাটি সুপরিকল্পনার চিহ্ন বহন করে। মঞ্চসজ্জা স্বল্প অথচ ব্যঞ্জনাময়। শূন্য মঞ্চের বহিঃপরিধি ঘিরে সাতটি উঁচু

ফ্ল্যাট কিছুটা অন্তর ওপর দিকে হেলিয়ে বসানো, মাঝের ফাঁকা জায়গাগুলো কালো পরদায় ঢাকা—এই অঞ্চলগুলি কুশীলবরা প্রবেশ আর প্রস্থানের জন্য ব্যবহার করছিলেন। মঞ্চের একেবারে পেছনে, মাঝখানে, পরদা সরিয়ে একটি প্রবেশদ্বার তৈরি করা হয়েছিল যেটা দিয়ে সাধারণত রাজা এবং তাঁর অনুচরেরা প্রবেশ করছিলেন। এ ছাড়া অন্য যা কিছু রঙ্গবস্তু সবই অভিনেতারা দৃশ্যের ফাঁকে-ফাঁকে হাতে করে বয়ে আনছিলেন—ডাকিনীর জাদুকড়া, ম্যাকডাফের শিশুসন্তানের দোলনা বা বসার আসন। আলোর ব্যবস্থাও কৌশলে করা হয়েছিল। মঞ্চের একেবারে পেছনে মাঝের প্রবেশদ্বারের ওপর দুটি আলো বসানো হয়েছিল, এ ছাড়া মঞ্চের সামনে কিছু আলোর উৎস ও প্রেক্ষাগৃহের কয়েকটি আলো ব্যবহার করে চমৎকার আলো-আঁধারির সৃষ্টি নাটকটির রহস্যময় অন্ধকারের আবহকে মূর্ত করে তুলতে সার্থক হয়েছিল। ডাকিনীর দৃশ্যগুলিতে গন্ধকের ধোঁয়া, ডাকিনীদের কালো পোশাক আর চকখড়ির মত সাদা মুখ অমঙ্গলের উপস্থিতি তীব্রতর করে তুলেছিল। ডাকিনীদের সঙ্গে ম্যাকবেথের দ্বিতীয় সাক্ষাতের সময় যে আত্মারা আবির্ভূত হয় ডাকিনীদের আহ্বানে, তাদের রূপায়িত করতে মুখোশের ব্যবহার প্রশংসনীয়। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সাজপোশাকে বিদেশী ধরন এক্ষেত্রে অনিবার্য—ব্যাঙ্কোর প্রেত ও ডাকিনীদের পোশাকে কিছুটা অভিনবত্ব ছিল। স্বল্প আয়োজনে রাজকীয় পরিবেশ সৃষ্টি নির্দেশকের পারদর্শিতার স্বাক্ষরবহ। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রয়োজনটির কম্পোজিশন আর ব্লকিং। মঞ্চের বিভিন্ন স্থানে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ছক মতো সাজিয়েছেন পরিচালক। সাজানো এই ছকে নাটকীয় প্রয়োজন এবং নান্দনিক সচেতনতা—দু-ই বিবৃত। সঙ্গীতের ব্যবহার পরিমিত কিন্তু বিশেষভাবে উল্লেখ্য নয়। পরিশেষে প্রযোজনা-পরিকল্পনা বিষয়ে কয়েকটি অভিযোগ—ব্যাঙ্কোর প্রেতকে ওইভাবে সরাসরি মঞ্চে আনার প্রয়োজন ছিল কি ? দৃশ্যটির কেন্দ্রে ম্যাকবেথের অন্তরের যে অপরাধবোধ, যার প্রতিফলন ব্যাঙ্কোর অশরীরী আত্মা, তাকে কি কল্পনার স্পর্শে আরও সার্থকভাবে উপস্থাপিত করতে পারতেন না নির্দেশক ? এই প্রসঙ্গে উৎপল দত্তের "ম্যাকবেথ" প্রযোজনার এই দৃশ্যটি স্মর্তব্য। ডোনালবেনের চরিত্রাভিনেতার রাজার প্রহরী হিসেবে ফিরে আসা বড়ো চোখে লেগেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিপ্রেক্ষিতে শেকসপীয়রের এই ট্র্যাজেডি বিশেষ অর্থবহ ও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারত, কিন্তু বিদেশী পরিচালক বা বাংলাদেশী অভিনেতারা প্রযোজনায় সেরকম কোনো ব্যঞ্জনা আনার প্রয়াস করেন নি।

জাতীয় নাট্যমেলার শেষ রজনীতে (১০ই ডিসেমবর) অভিনীত হল নেপালের "স্টুডিও সেভন"-এর প্রযোজনা, ব্রেশটের "থ্রী পেনি অপেরা"। জার্মান নাটকটির ইংরেজি অনুবাদের ভিত্তিতে এই মঞ্চায়ন। দলটির মুখপাত্র বা স্মারকপত্রে কিংবা নান্দীকারের নাট্যমেলার স্মরণিকায় কোথাও উল্লেখ নেই ইংরেজি অনুবাদটি কার। শুনেও ঠিক বোঝা গেল না। অনুবাদের আলোচনায় না গিয়ে তাই সরাসরি প্রযোজনার প্রসঙ্গে চলে আসা যাক। পশ্চিম বাঙলায় ব্রেশ্‌ট প্রযোজনার একটা লম্বা ইতিহাস আছে, বিদেশী নাট্যকারদের মধ্যে ব্রেশ্‌টই এই বাঙলায় সবচেয়ে বিতর্কিত। তার ওপর নান্দীকার একদিন এই "থ্রী পেনি অপেরা"-র রূপান্তর "তিন পয়সার পালা" মঞ্চস্থ করে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। সব মিলিয়ে যাকে বলে ত্র্যহস্পর্শযোগ। ত্র্যহস্পর্শ ঘটেছে "স্টুডিও সেভন"-এর প্রয়াসেও। জার্মান পরিচালিকা ফরাসি, ব্রিটিশ, আমেরিকান, নেপালি ও ভারতীয় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে মঞ্চস্থ করলেন জার্মান নাটকের ইংরেজি অনুবাদ। আর এইসব ত্র্যহস্পর্শের যোগসাজসে ব্রেশ্‌টের 'এপিক থিয়েটার' হয়ে দাঁড়িয়েছে নাচে-গানে-আড়ম্বরে চোখ-ধাঁধানো ব্রডওয়ের তৃতীয় শ্রেণীর অনুকরণ। প্রস্তাবনা অংশটি, স্বীকার করতে হবে, সুকল্পিত। নিঃশব্দে পরদা সরে যায়, সমস্ত স্টেজ জুড়ে মঞ্চ-সজ্জার ফাঁকে-ফাঁকে দাঁড়িয়ে থাকে ম্যানেকুইনের মতো অভিনেতা-অভিনেত্রীরা—নানা ভঙ্গিতে, একপাশে স্টেজের ওপরের অংশ থেকে ঝুলন্ত কাপড়ের পুতুলটির অস্তিত্বে মঞ্চের জীবন্ত মানুষদেরও পুতুল বলে মনে হয়। স্টেজের বাঁদিকে সামনের অংশে সিনথেসাইজার ও বাস গিটারে বেজে ওঠে দ্রুত লয়ের সুর, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা নড়েচড়ে ওঠেন, তারপর নাচের ভঙ্গিতে একে-একে বিদায় নিতেই মঞ্চের অন্যান্য আলো নিভে, জ্বলে ওঠে বাজনদারদের মাথার ওপরে একটি আলো। সেই আলোতে যে আধো-অন্ধকার সৃষ্টি হয় তাতে দেহ্‌সের

বিভিন্ন অংশের পুনর্বিন্যাসে সৃষ্টি হয় মি. পিচামের বাড়ি তথা অফিসঘরের দৃশ্য। প্রতিবার সেট্স্ বদলের সময়েই হালকা সঙ্গীত বাজতে থাকে। স্লটেড অ্যাঙ্গেল নির্মিত মঞ্চসজ্জার একটা বড়ো সুবিধে স্বল্প অদলবদলেই তা বিভিন্ন আকার নেয়। একই ফ্রেম ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ভিন্ন তলের ইঙ্গিত সৃষ্টি করা যায়। তৈরি হয় খাবার টেবিল, শোবার খাট কি বা জেলের সেল। কিন্তু সমস্ত সুবিধে আর অভিনবত্ব সত্ত্বেও এ প্রযোজনায় বড়ো বেশি সময় লাগে সেট্স্ বদলে—আকাদেমীর ছোটো মঞ্চ দেখায় আকীর্ণ। মঞ্চের তিনদিকে ওপর থেকে ঝোলানো ধূসর পট, পেছনেরটিতে লনডনের 'সোহো' অঞ্চলের ঘিনজি বাড়ি-ঘরদোর—আকাশে একটি গোল উজ্জ্বল চাঁদ। সমস্ত মঞ্চসজ্জার মধ্যে এই পশ্চাৎপটটিই সবচেয়ে ব্যঞ্জনাময় অথচ একমাত্র দৃশ্যের মাঝখানে ছাড়া অন্য কোথাও এই দৃশ্যপটটির যথাযথ ব্যবহার করা হয় না। মঞ্চ থেকে বাইরে যাতায়াতের পথ হিশেবে ব্যবহৃত হয় দুটি পটের মাঝখানের অংশ ও পশ্চাৎপটের মাঝের একটি ফাঁকা জায়গা। বাজনদারদের ওপর আলোটি ছাড়া প্রেক্ষাগৃহের আলোর উৎসগুলি ব্যবহৃত হয়; তাছাড়া মঞ্চের সামনে কয়েকটি ফুটলাইটও কাজে লাগানো হয়। এছাড়া প্রসেনিয়াম ফ্রেমের ওপর ও নীচের অংশ জুড়ে আছে সারিবদ্ধ রঙিন আলোকমালা—গানের অংশগুলিতে যেগুলি একসঙ্গে জ্বলে ওঠে। এই প্রযোজনার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পোশাক-আশাক চটকদার আর দামি। পারিসীয় মারি কী গার (.) পোশাক-পরিকল্পনায় য়ুরোপীয় পরিধানের ছাঁদ স্পষ্ট। নেপালি পোশাকের ধরন এখানে বিশেষ কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। ব্রেশ্‌টের মূল নাটকের প্রায় সবকটি গানই প্রযোজনায় বর্তমান। মূল নাটকের তেমন কোনো সম্পাদনাও করা হয় নি প্রযোজনাটিতে। সঙ্গীতের ব্যবহার বহুল, ব্রেশ্‌ট্-সহকারী কুর্ট ভাইলের সাংগীতিক স্বরলিপি অনুসারী। কিন্তু গায়ক-গায়িকারা অনেক সময়েই বেসুরো। এই সুরহীনতা কি ব্রেশ্‌টের বিখ্যাত "অ্যালিয়েনেশন এফেক্‌ট"-এর প্রয়োগ? গানের অংশগুলিতে নীল-লাল সবুজ বালব জ্বলে ওঠা আর সাদা সাহেবি পোশাক পরা সূত্রধারের প্রতিটি দৃশ্যের সূচনায় ঘটনার সারাংশ (মূলে যা দৃশ্যের শীর্ষনাম) প্রদান তো অন্তত ব্রেশ্‌টের থিয়েটারের প্রতি আনুগত্যের বিরল নিদর্শন বলেই মনে হল। তাছাড়া ম্যাক্‌হিথের ভূমিকায় পরিচালিকার অভিনয় এবং অন্যত্র নারী-চরিত্র অভিনেতাদের দিয়ে ও পুরুষের ভূমিকা অভিনেত্রীদের দিয়ে করানো হয়তো এই বিযুক্তিকরণের আরেক উপায়। বেশ্যালয়ের দৃশ্যটিতে অভিনেতাদের প্রকৃত অর্থে নারী সাজাতে গিয়ে নির্দেশিকা রুচিহীনতার পরিচয় দেখিয়েছেন। যদি অসংপৃক্তিই কাম্য, তাহলে শুধুমাত্র নারীর পোশাক বা মুখের প্রসাধনই কি যথেষ্ট হত না? একই অভিনেতা-অভিনেত্রীর বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয়—সংখ্যাল্পতার কারণে না বিযুক্তিকরণের, বোঝা গেল না। ইন্‌সপেকটর স্মিথ, কনস্টেবল, বিবাহ অনুষ্ঠানে পাদ্রীসাহেব—চরিত্রগুলিকে দিয়ে অযথা ভাঁড়ামো করানো হয়েছে। বিবাহদৃশ্যে খাবার টেবিলে দুবারের ট্রাউট মাছ বা লবস্টার আর কাগজের লেটুস পাতা চিবানো দৃষ্টিকটু।

সমস্ত নাটকে একমাত্র ভালো অভিনয়ের পরিচয় রেখেছেন সাবিনে লেহ্‌ম্যান। পিচাম খারাপ নন, কিন্তু শ্রীমতী পিচাম, টাইগার ব্রাউন, লুসি বা জেনির ভূমিকাভিনেতা ও অভিনেত্রীরা অত্যন্ত নিম্নমানের অভিনয় করেছেন। এর মধ্যে শেষোক্ত চরিত্রাভিনেত্রী আকাদেমীর মতো ছোটো প্রেক্ষাগৃহেও দর্শকের শ্রবণাতীত হয়ে থাকেন। পলি পিচাম চরিত্রে জার্মান অভিনেত্রী লুডমিলা হুঙ্গার হবার মন্দের ভালো। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অক্ষমতায় ব্রেশ্‌টের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ কোথাও-কোথাও পর্যবসিত স্থূল হাস্যরসে। প্রযোজনাটি একটিমাত্র জায়গায় ব্রেশ্‌টের সমালোচনার গভীরতাকে ছুঁতে পারে—ফাঁসিকাঠে যাবার আগে ম্যাক্‌হিথ তার শেষ ভাষণে যেখানে বড়ো অপরাধী আর ছোটো অপরাধীদের সম্বন্ধে মন্তব্য করে। তারপরেই সেই বহুখ্যাত সমাপ্তি—পিচাম এগিয়ে এসে সরাসরি দর্শককে উদ্দেশ্য করে ভিন্নতর এক সমাপনের নির্দেশ দেয়—আসে ঘোড়ায় চড়া রাজপ্রতিনিধি—মুক্তি হয় ম্যাক্‌হিথের। এখানে বিযুক্তিকরণের সার্থকতায় পরিচালিকার বিশেষ ভূমিকা নেই, নাট্যকার নিজেই সমাপ্তিটিকে তাঁর উদ্দেশ্যের ও বক্তব্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে দিয়েছেন।

জাতীয় নাট্যমেলায় জাতীয় সংহতির যে একটা অনুচ্চারিত অথচ স্পষ্ট নির্দেশ থাকে তা "স্টুডিও সেভন"-এর আগমনে একদিক থেকে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বিস্তৃত, কারণ এই দলটির সংগঠনে আর সদস্য-নির্বাচনে

আন্তর্জাতিকতার প্রতিফলন দেখা গেল। দুঃখ শুধু এই যে, কুড়ি বছরের আন্তর্জাতিক থিয়েটারের অভিজ্ঞতা নিয়েও নির্দেশিকা সাবিনে লেহ্‌ম্যান প্রযোজনাটিকে "আন্তর্জাতিক" মানের করে তুলতে পারলেন না!

২. লোকনাট্যের তিন ধরন

নান্দীকার জাতীয় নাট্যমেলার বৈচিত্র্যের ব্যাপ্তি স্বতঃপ্রমাণিত উদ্যোক্তাদের প্রযোজনা নির্বাচনে। "ম্যাকবেথ" বা "থ্রী পেনি অপেরা"-র মতো "বিদেশ"-গন্ধী, নাগরিক, আড়ম্বরপূর্ণ প্রযোজনার পাশাপাশি তাঁরা উপস্থিত করেছেন একেবারে দেশজ নিরাভরণ দুই নাট্যআঙ্গিক—মধ্যপ্রদেশের "পাণ্ডবানি" এবং মহারাষ্ট্রের "গোন্দড়" লোকনাট্য। এই দুই প্রযোজনাকে পরিপূর্ণ নাট্য হয়তো বলা যাবে না, কিন্তু নাট্যের শৈশবাবস্থা বিধৃত এই পরিবেশনা দুটিতে। সব নাট্যপ্রেমী আর নাট্যোৎসাহীর কাছে নিঃসন্দেহে এ এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা—শহুরে প্রসেনিয়ামে নাট্যের আঁতুড়ঘর গড়ে তোলা। কোনো-কোনো নাট্যতত্ত্ববিদ বলেছেন মহাকাব্যের কথনের মধ্যে থেকেই জন্ম নিয়েছিল আদিনাট্য। "পাণ্ডবানি" আর "গোন্দড়ে"র সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী পরিবেশনা দেখতে দেখতে অনেক নাট্যদর্শকই নিশ্চয় এ তত্ত্বের সমর্থন খুঁজে পেয়েছিলেন। ৬ই ডিসেমবর সন্ধ্যায় ছত্তিশগড়ের সুদূর গনেয়ারি গ্রামের শ্রীমতী তিজন বাঈ উপস্থিত করলেন পাণ্ডবানি আঙ্গিকে "কর্ণার্জুনসংবাদ"। তিজনবাঈ এখন একজন স্বনামধন্যা শিল্পী, কলকাতার কিছু বিদগ্ধ দর্শক ইতিপূর্বে তাঁকে আরও দুবার এ শহরে ঘনিষ্ঠ সভায় পেয়েছেন। তবু আবারও তিনি কলকাতার দর্শকের মনোহরণ করলেন।

একেবারে শূন্য মঞ্চের মাঝখানে সাদা-চাদর-ঢাকা একটি ছোটো চবুতরা, তার ওপর বসেছেন বাজিয়ে আর সঙ্গতকারীরা। বাজনার মধ্যে প্রধান হারমোনিয়াম, ঢোলক, তবলা আর বানজো। এছাড়া প্রধান দোহারের হাতে ছিল ট্যাম্বোরিন-জাতীয় একটি বাদ্যযন্ত্র। এই চবুতরার সামনের জায়গাটুকুতে ঘুরে-ঘুরে নেচে-নেচে তিজনবাঈ উপস্থাপিত করলেন তাঁর শিল্পকলা। মনে হচ্ছিল যেন ওই কয়েক স্কোয়ার ফুট জায়গা নয়, সমস্ত মঞ্চ অধিকার করে রেখেছেন তিনি। দৃপ্ত পদক্ষেপ, তেজোদীপ্ত কণ্ঠ, উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বে তিনি দর্শকের চেতনাকে ভরিয়ে তুলেছিলেন। আশ্চর্য হলাম তাঁর কণ্ঠের ব্যবহার আর মুখের অভিব্যক্তিতে। অত্যন্ত চড়া পরদা থেকে অতি সহজে খাদে নেমে আসে গলা, অনুরণিত স্বরে তিনি বিশেষ-বিশেষ নাটকীয় জায়গায় গায়ে-কাঁটা-দেওয়া মুহূর্ত সৃষ্টি করেন। চোখ কখনো আয়ত, কখনো করুণ, কখনো ধারালো, কখনো বা অর্ধনিমীলিত। সেই সঙ্গে আছে ভুরু আর ঠোঁটের ব্যবহার। নাটকীয় বিরামের (pause) এমন চমৎকার প্রয়োগ খুব কম দেখা যায়। গানের গলাটিও সুরেলা, যদিও সেই সন্ধ্যায় মাঝে-মাঝে দোহারের অতিরিক্ত সাহায্য নিতে হচ্ছিল তাঁকে। একই সঙ্গে কর্ণ, অর্জুন, ভীম থেকে শুরু করে কুন্তী, দ্রৌপদী চরিত্রের রূপায়ণ করছিলেন তিনি। বীরের দার্ঢ্য আর নারীর লালিত্য স্বচ্ছন্দে প্রকাশিত তাঁর শরীরে। বাঁ হাতের লাল তম্বুরাটিকে ব্যবহার করছিলেন অদ্ভুত সাবলীলতায়—কখনো তা গাণ্ডীব, কখনো দরজা, কখনো ভীমের গদা, কখনো বজ্র বা ধনুকের ছিলা, কখনো রথের রশি অথবা বীরের শরীরের অংশ। অন্য হাতের সরু ধাতব তারটি শুধু তম্বুরাবাদনে নয়, অভিনয়েও ব্যবহৃত হচ্ছিল। কাহিনীকথনের মাঝে-মাঝে দোহারের কণ্ঠের "আইচ্ছা" ও "হৌ" ধ্বনি পরিবেশনায় বিশেষ মাত্রা যোজনা করছিল। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার, দোহারের গলাটি তীক্ষ্ণ আর চাঁছাছোলা। তার ধুয়ার সাহায্যে উপস্থাপনা আরও প্রাণময় হয়ে উঠছিল। অন্যদিকে, হারমোনিয়ামের সুদক্ষ ব্যবহার বর্ণনার নাটকীয়তাকে করে তুলছিল কখনো ঘন, কখনো তীব্র।

পরিবেশনার কয়েকটি অংশ উল্লেখযোগ্য। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রাক্‌কালে কৃষ্ণের পরামর্শে কুন্তী আর ছদ্মবেশী ইন্দ্র যখন একে-একে কর্ণের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে গেলেন পরশুরামের পাঁচ বাণ আর জন্মসূত্রে পাওয়া কবচকুণ্ডল, তখন সেইসব অসহায় মুহূর্তে "কর্ণদানী" রূপে তিজনবাঈয়ের অভিব্যক্তি অপূর্ব। ব্রাহ্মণের রূপধারী ইন্দ্রের বেগতিক কথকের ব্যঙ্গে হাস্যোদ্রেককারী। এই অংশে প্রেক্ষাগৃহের দর্শকদের সঙ্গে একটু ঠাট্টা করে নিতেও ছাড়লেন না

তিজনবাই—ইন্দ্রের মতো কলিযুগে যে অনেক "মেক-আপ ব্রাহ্মণ" পাওয়া যায় তা জানিয়ে দিয়ে। দ্বিতীয়ার্ধে যুদ্ধের দৃশ্যের রূপায়ণে শ্রীমতী তিজনবাই সিদ্ধহস্ত। 'স-ন-ন-ন' শব্দে বাণ কীভাবে আকাশ অন্ধকার করে তোলে বা 'ঘ-র-র-র' শব্দে রথ কেমন ঘুরে গেল, অথবা গরুড় কীভাবে পাখা বিস্তার করে কর্ণের বাণ নিবারণ করে—এইসব দৃশ্যকে শিল্পী প্রাণময় করে তোলেন কখনো শরীরের ভঙ্গিতে, কখনো দু-হাতের প্রসারণে, কখনো কথায়, কখনো গানে। বর্ণনা যখন চরম উত্তেজনার মুহূর্তে পৌঁছয় কিংবা গভীর আবেগবহ হয়ে ওঠে, তখন তিনি সহজেই চলে আসেন কথা থেকে গানে। ভীমের দুঃশাসনবধ আর দ্রৌপদীর রক্তস্নানের অংশটি দর্শকের চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলে কুরুক্ষেত্র-জীবনের ঘটনাবলীকে। দুঃশাসনকে ভূপাতিত করে ভীম যখন তাঁর হস্ত উৎপাটিত করলেন তখন কেমন ঝলকে-ঝলকে তাঁর শরীর থেকে রক্তের ফোয়ারা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে তা শিল্পীর হাতের মুদ্রায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মৃতদেহের স্তূপের মধ্যে দিয়ে পথ করে নিয়ে দ্রৌপদী কীভাবে সেখানে পৌঁছান তা তিজনবাই-য়ের দৃষ্টি, অভিব্যক্তি আর পদক্ষেপের যুগপৎ ব্যবহারে পরিদৃশ্যমান হয়ে ওঠে। কর্ণ যখন ভুবাসার নীল বাণ নিক্ষেপ করলেন অর্জুনের দিকে তখন কৃষ্ণ কেমনভাবে ঘোড়াদের হাঁটু ভেঙে বসিয়ে, রথের মাথা নীচু করে তা ব্যর্থ করলেন, তা তিজনবাই-য়ের অভিনয়ে সুস্পষ্ট, জীবন্ত।

কাহিনীকথনে কর্ণের প্রতি একটি প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি আছে আর অর্জনের প্রতি আছে এক চাপা অবজ্ঞা। কর্ণের প্রকৃত প্রতিপক্ষ অর্জুন নন, শ্রীকৃষ্ণ। তাই তাঁরই কৌশলে মৃত্যুমুখে পতিত কর্ণকে তিনি আশীর্বাদ করেন। লক্ষ করার বিষয়, লোকনাট্যের শিল্পী কেমন করে মূল মহাকাব্যের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন তাঁদের নিজেদের ঐতিহ্যবাহী কাহিনী-অংশ, মৌখিক সাহিত্যের গবেষকদের পক্ষে যা অনুসন্ধানের বিষয় হতে পারে। অর্জনের রথকে দুই পাদ পশ্চাদপসারণ করাতে বাধ্য করার মধ্যে কর্ণের বীরত্বের যা ব্যাখ্যান, তা লোকশিল্পীর নিজস্ব। তেমনি মৌলিক মুমূর্ষু কর্ণের কাছে কৃষ্ণের তাঁর দন্তপাটি প্রার্থনা বা কর্ণের শেষ ইচ্ছা কুমারী ভূমিতে চিতারোহণ এবং কৃষ্ণের নিজের হাতের তালুতে চিতা সাজানোর প্রতিজ্ঞা। কৃষ্ণের স্তবে শেষ হয় পাণ্ডবানির পরিবেশন।

নান্দীকারের দ্বিতীয় জাতীয় নাট্যমেলায় মধ্যপ্রদেশের আরেক পাণ্ডবানি শিল্পী পুনারাম নিশাদ এসেছিলেন তাঁর পরিবেশনা নিয়ে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি "পাণ্ডবানি" নামটি এই লোকনাট্য আঙ্গিকের বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করে—পাণ্ডবের কাহিনী তথা পাণ্ডবানি। পুনারামের পরিবেশনা ছিল বসে, কখনো বা হাঁটুর ওপর উঁচু হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে—তাঁর পরিবেশনায় একই জাতীয় আকর্ষণ ছিল। দুঃখের বিষয়, সেবার কলকাতার দর্শক ওই শিল্পীর যথার্থ কদর করতে পারেন নি। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন—নাট্যমেলায় এজাতীয় প্রদর্শন কেন। আজ অন্তত পাণ্ডবানির প্রতি তাঁদের মনোভাব বদলেছে, অন্তত তিজনবাই-য়ের প্রযোজনায় তাঁরা যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছেন। অথচ ৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায়, মহারাষ্ট্রের পরবনী জেলার একশ এক বছর বয়স্ক শিল্পীর কলাপ্রদর্শনে তাঁদের অসহিষ্ণু ও অশোভন ব্যবহার কলকাতার লজ্জা হয়ে উঠেছিল। প্রশ্ন জাগে, পাঁচটি নাট্যমেলার পরেও কি কলকাতার দর্শকের মন ভিন্ন প্রাদেশিক প্রতিভাকে গ্রহণে অপারগ? শতোর্ধ্ব শিল্পীর প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধাও তো তাঁরা দেখতে পারতেন প্রেক্ষাগৃহে থেকে উঠে না গিয়ে, প্রদর্শন চলার সময় গুঞ্জন বন্ধ করে। প্রসঙ্গত নান্দীকার গোষ্ঠী বিচক্ষণতার পরিচয় রেখেছেন এই দুটি পরিবেশনার আয়োজনে, প্রেক্ষাগৃহের আলো জ্বালিয়ে রেখে। এজাতীয় প্রযোজনায় দর্শকের সহভাগ অত্যন্ত প্রয়োজন, যতটা দর্শকের পক্ষে, ততটা শিল্পীর পক্ষেও বটে।

পাণ্ডবানি যেমন শুধুমাত্র মহাভারতের কাহিনীর পুনঃকথন, তেমনি গোন্দড় পুরাণনির্ভর আখ্যানের বিবরণ। রাজারাম ভণ্ড তাঁর সঙ্গীসাথীদের নিয়ে দুটি আলাদা কাহিনী বর্ণনা করলেন—"রাধাবিলাস" ও "জম্বুরা উপাখ্যান"। এক্ষেত্রেও মঞ্চ নিরাবরণ, শুধু মঞ্চের ডানদিকে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে অদ্ভুত এক ত্রিকোণাকৃতি চার-দিক-খোলা মণ্ডপ, তার মধ্যে সন্তবত অশ্বাদেবীর ঘট ও ছবি। একপাশে প্যাকাটিতে এক বিচিত্র মশাল জ্বলছে। নান্দীকারের পক্ষ থেকে শ্রীমতী স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত পূজার ঘট থেকে সিঁদুরের টীকা শিল্পীদের সবার কপালে পরিয়ে দিলে অনুষ্ঠান শুরু হল। মঞ্চে রাজারাম ভণ্ড ছাড়া ছিলেন আরও পাঁচজন। একজনের ভূমিকা শুধু মণ্ডপটির সামনে বসে থাকা। বাকি চারজন (এখানে বলে রাখা দরকার শিল্পীরা সবাই রাজারামের পরিবারভুক্ত

—কেউ ছেলে, কেউ ভাইপো, কেউ নাতি) সবাই প্রযোজনাটিতে যোগদান করলেন নেচে, গেয়ে, বাজিয়ে। রাজারাম ছাড়া অন্যদের সকলের হাতে ছিল কোনো না-কোনো বাদ্যযন্ত্র—খঞ্জনী, বাদকের গলায় ঝোলানো ঢাকজাতীয় যন্ত্র, দোতারা আর ট্যাম্বোরিন।

শুরুতেই গণপতিবন্দনা ও সম্প্রদায়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অশ্বার স্তুতি। তারপর মূল কথন। "রাধাবিলাস"-এর কথাবস্তু অভিনব। যশোদার কোলে এসেছেন শ্রীকৃষ্ণ; যশোদা শিশু কৃষ্ণকে একা নিজের করে রাখতে চান, কিন্তু শ্রীরাধিকা খবর পেয়ে এলেন কৃষ্ণকে দেখতে—তাঁকে কোলে করে অনুনয়-বিনয় করতে লাগলেন তাড়াতাড়ি বড়ো হয়ে ওঠার জন্য যাতে তিনি কৃষ্ণের সঙ্গে প্রেমলীলায় মাততে পারেন। শেষ পর্যন্ত রাধা মন্দিরে গিয়ে ফুল এবং যথাযথ উপচার দিয়ে পূজা করলে শিশু কৃষ্ণ যুবকরূপ ধারণ করলেন। শ্রীরাধিকা আর কৃষ্ণের মিলন হল।

ঘুঙুর পায়ে, মাথায় বিরাট সাদা পাগড়ি চাপিয়ে, ধুতির ওপর ছোটো-ছোটো-কুঁচি-দেওয়া বিশাল ঘেরের আলখাল্লা পরে সঙ্গীতের সঙ্গে নেচেগেয়ে রাজারাম উপস্থাপনা করলেন এই কাহিনী। কোমরের চাদর মাথায় দিয়ে তিনি কখনো হলেন যশোদা, কখনো শ্রীরাধা। শ্রীরাধা সেজে আলখাল্লার একদিক উঠিয়ে, চাদরের আঁচলে জড়িয়ে আদল দিলেন শিশু কৃষ্ণের। তারপর তাকে কোলে নিয়ে দুলিয়ে-দুলিয়ে কত আদর, কত কথা আর গান। তিজনবাই সেজেছিলেন মহাভারতের বীর, তেজোদীপ্ত পুরুষ। একশ এক বছরের রাজারাম সাজলেন লাস্যময়ী তরুণী। জোড়া-ঢাক-বাদক বয়সে তরুণ, গলাটি পরিষ্কার, কথন এবং গায়নে রাজারামকে সাহায্য করছিলেন তিনি। অভিনয়ের প্রেক্ষাপটে তাঁর হাতের জোড়া-ঢাকটি তিজনবাই-য়ের সঙ্গী হারমোনিয়ামের মতোই নাটকীয় মুহূর্তগুলিকে জীবন্ত করে তুলছিল। চাপান-উতোরে রাধাকৃষ্ণের কথোপকথন চলছিল রাজারাম আর এই প্রধান দোহারের মধ্যে। তিজনবাইয়ের মতো এক্ষেত্রে শুধু ধুয়া ধরা নয়, সংলাপ বিনিময় সাথীদের সঙ্গে। অর্থাৎ এই কথকতা নাট্যের আরও এক ধাপ নিকট। গানের চমৎকার ছোটো-ছোটো কাজে নাচছিলেন রাজারাম—কখনো ঘুরতে-ঘুরতে ঘাগরার মতো আলখাল্লা চারপাশে ছড়িয়ে বসছিলেন মঞ্চের ওপর।

দ্বিতীয়ার্ধের "জম্বুরা উপাখ্যান" মহাভারতের চরিত্রদের কেন্দ্র করে রচিত। শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন হস্তিনাপুরে, পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীসহ বনে বেড়াতে গিয়ে ক্ষুধার্ত হয়ে ফল খেতে চাইলেন। ভীম পেড়ে আনলেন একটি জম্বুরা ফল। কিন্তু ফলটি দেখে শ্রীকৃষ্ণের (দ্রৌপদীর) মনে হল ফলটি আবার তার বৃন্তে ফিরে যেতে চাইছে। কৃষ্ণ জানালেন, পঞ্চপাণ্ডব এবং দ্রৌপদীর ভক্তি আর ইচ্ছাশক্তির জোরে তা সম্ভব। কিন্তু পাণ্ডবভ্রাতাদের কারও ইচ্ছাতেই ফল মাটি থেকে এক সঙ্গা হাতের বেশি উঠল না। অবশেষে দ্রৌপদীর ভক্তির জোরে তা প্রায় বৃন্তের কাছাকাছি গিয়ে থেমে রইল। দ্রৌপদী তখন কৃষ্ণের কাছে স্বীকার করলেন—পঞ্চস্বামী বর্তমানে ক্ষণেকের জন্য কর্ণকে ভালো লেগে যাবার পাপেই এই ব্যর্থতা। দ্রৌপদীর অপরাধস্বীকারে সঙ্গে-সঙ্গে ফল গিয়ে বৃন্তে জোড়া লাগল, কিন্তু উলটো হয়ে—সেই থেকে জম্বুরা ফল বৃন্ত থেকে উলটো হয়ে ঝোলে। এই উপাখ্যান দ্বারা প্রমাণ হল দ্রৌপদীই শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ ভক্ত। অশ্ববন্দনা দিয়ে সমাপ্ত হল রাজারাম ভণ্ডয়ের পুরাণকথন।

এই অর্ধে কাঁধের রঙিন চাদরটি কোমরে ঘাগরার মতো বাঁধলেন রাজারাম, তার ওপর বাঁধলেন আর-একটি চাদর। দর্শক-শ্রোতাদের সুবিধের জন্য আর মারাঠি উপভাষায় নয়, যথাসম্ভব হিন্দিতে কথনের চেষ্টা করছিলেন রাজারাম আর তাঁর সঙ্গীরা। কিন্তু তাদের পরিবেশনার স্বাভাবিক স্বতস্ফূর্ততার কিঞ্চিৎ হানি ঘটছিল। তিজনবাই আর রাজারাম নাট্যশিল্পী হিসেবে এইজন্য আরও শ্রদ্ধেয় যে তাঁরা কখনোই দর্শকের আনন্দোপলব্ধির কথা ভুলে যান না। যাবতবনাই চেষ্টা করে দর্শক-শ্রোতাকে মাতিয়ে রাখেন—কারণ সেখানেই তাঁদের শিল্পের সার্থকতা। পরিশেষে একটি মন্তব্য না করে পারছি না। বাঙলা থিয়েটারের শিল্পীরা এই প্রযোজনা থেকে শিখে নিতে পারেন সমবেত অভিনয় কাকে বলে; প্রদর্শনের একটি বিশেষ মুহূর্তে রাজারাম যখন হঠাৎ কাশির দমকে অক্ষম, তখন তাঁর পেছন থেকে এগিয়ে এসে সঙ্গী বাজনদার নেচে-গেয়ে আসর মাত করলেন, অন্যদিকে প্রধান দোহার করে চললেন বর্ণন। সম্প্রদায়ের যৌথ নাট্য বোধহয় একেই বলে।

৯ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কলকাতার নাট্যপ্রেমীদের প্রিয় নাট্যপ্রযোজক হাবিব তনবির ও তাঁর ছত্তিশগড়ি

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সংগঠন "নয়া থিয়েটার" অভিনয় করলেন লোককথাভিত্তিক "সোনে সাগর চন্দাইনি"। এ নাটকের বিষয়বস্তু সম্ভবত ছত্তিশগড়ি লোককথা থেকে আহৃত। হিন্দি রোমানটিক কাব্যধারার "লোর-চন্দ্রানী" পাঁচালিকাব্যের ছায়া আছে এর ঘটনাবলীতে। কাহিনীর মূলসূত্র লোককথার চির-পরিচিত বিষয়—যোগ্য পুরুষের নারীধন এবং গাভীধন প্রাপ্তি। লোককথায় মূল নায়কচরিত্রের যে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তা উপস্থিত এই কাহিনীটিতেও। হাবিব তনবিরের সাম্প্রতিক অন্যান্য প্রযোজনার মতো এই প্রযোজনাটিও ছত্তিশগড়ি লোকনাট্যনির্ভর—নাচে, গানে, বাজনায় ভরা।

মঞ্চের বাঁদিকে একেবারে সামনে একটা শতরনজির ওপর বসেন বাজনদারেরা—প্রধান বাদ্যযন্ত্র হারমোনিয়াম, ঢোলক, তবলা আর খঞ্জনী। বাজনদারদের মধ্যে কয়েকজন গানের কোরাসে গলা মেলান, আবার কখনো উঠে গিয়ে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন। অভিনয় শুরু হয় শিবের স্তব এবং গণপতিবন্দনা দিয়ে। তারপর প্রবেশ করে চন্দাইনি কাহিনীর কথক। বাজনার তালে-তালে গুরুগম্ভীর ভাবে নেচে-গেয়ে তিনি কাহিনীর প্রথমার্ধের সারাংশ পরিবেশন করেন। সমস্ত নাটকে এই তাঁর একমাত্র ভূমিকা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে তিনি আবার তাঁর আসর-জমানো নাচ-গান নিয়ে ফিরে আসেন ভনিতাটুকু উপস্থিত করতে। নাট্যাংশের বিবরণে এই 'চন্দাইনি-নর্তক'কে সাহায্য করতে আছেন দুজন সূত্রধার, যাঁরা নাটকে বারবার ফিরে আসেন—কখনো গল্পের সূত্রটুকু দর্শককে ধরিয়ে দিতে, কখনো বিশেষ কোনো চরিত্রে অভিনয় করতে। নাটকের শুরুতেই কাহিনীর আরম্ভ বর্ণনা করে তাঁরা ঠোকা লাঠি নিয়ে দুই প্রধান চরিত্র কাঠাইত ও কুভিয়া সেজে অভিনয় করতে শুরু করেন। এ ছাড়া, নাটকের অন্যান্য অংশে তাঁদের পাওয়া যায়—কখনো লাঠিয়াল রূপে, কখনো গৌণ চরিত্রে বা বিবাহের শোভাযাত্রায়। কাহিনীকথনে 'চন্দাইনি-নর্তক' ও সূত্রধার দুজনকে সাহায্য করেন নারী-পুরুষে মেলানো একটি ছোটো দল। এঁরা মূলত গানেই কাহিনী-অংশ বর্ণনা করেন। এঁদের মধ্যে থেকে অনেকে মাঝে-মাঝেই নাটকের চরিত্র হয়ে অভিনয়ে যোগ দেন। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে, বা বলা ভালো ঘটনা থেকে ঘটনান্তরে, এঁরাই দর্শককে নিয়ে যান তাঁদের গানের মাধ্যমে। নাট্যাভিনয় এবং কাহিনীবর্ণনের এই মিশ্রণটি অত্যন্ত আকর্ষক।

লোকনাট্যের অনাভরণ সারল্যের সঙ্গে এ নাটকের মঞ্চসজ্জা ছিল মানানসই—সামান্য কিন্তু কল্পনাসমৃদ্ধ। কয়েকটি ক্যাদিসের চৌকো ঝাটিয়া আর দু-তিনটি ট্রাঙ্কের অবস্থান অদল-বদল করে নিয়ে মঞ্চকে কখনো বাহির, কখনো অন্দরের রূপ দেওয়া হচ্ছিল। এর সঙ্গে ছিল ছোটখাটো বাজনাময় রঙ্গবস্তু যা সহজেই স্থানের একটি বিশিষ্ট রূপ নির্মাণে সাহায্য করছিল। চন্দার ঘরকে লোরিকের দু-ঘরের কুঁড়ের থেকে আলাদা করে চেনা যাচ্ছিল, আবার বাওয়ানের বাড়িও যে সানওয়ারের বাড়ির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তা শুধুমাত্র মঞ্চসজ্জার সামান্য হেরফেরে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। মঞ্চসজ্জার সবচেয়ে কল্পনানির্ভর, বাঞ্জনাময় ও সার্থক ব্যবহার শেষ দৃশ্যে যেখানে মঞ্চের মাঝামাঝি একদিকে দুটি ঝাটিয়া ও আরেকদিকে কিছু তফাতে আরেকটি রেখে নদীর পাড় তৈরি হল। দর্শক সহজেই মেনে নিলেন মাঝের অংশটি নদী। পুরো আলোতে নাটকের চরিত্ররাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রধান সূত্রধার দুজন, মঞ্চসজ্জার পরিবর্তন করছিলেন। সমস্ত নাটকটি উজ্জ্বল আলোতেই অভিনয় হয়েছে, কয়েকটি নাটকীয় মুহূর্ত আর রাত্রির দৃশ্য ছাড়া আলোর তেমন কোনো কারুকাজ ছিল না। পোশাকে ছত্তিশগড়ি মানুষের দৈনন্দিন পরিধানের ছাপ। সমবেত নাচগানের সময় অভিনেতাদের পোশাকের রঙে সারা মঞ্চ আলোকিত হয়ে উঠছিল। নাচে এবং গানে হাবিবের অন্যান্য প্রযোজনার মতোই, ছত্তিশগড়ি লোকনৃত্য আর লোকগীতের প্রভাব। এর মধ্যে এমন একটা প্রাণ আছে যা সহজেই দর্শকের চোখ আর মন দুইই ভরিয়ে তোলে, যদিও ক্ষণিকের জন্য। "চরণদাস চোর"-এর মতো এ নাটকে নাচের আধিক্য ছিল না কিন্তু বিবাহের শোভাযাত্রায় দৃষ্টি-নন্দন আয়োজন ছিল, ছিল লাঠিখেলা। এই খেলায় ছত্তিশগড়ি চৈতরাম যতটা পারদর্শী শহুরে দীপক তেওয়ারি ততটা নন। সেটা বেশ চোখে লেগেছে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে লাঠিখেলায় কি আদৌ প্রয়োজন ছিল? এই প্রসঙ্গে বলা যায়, হাবিব তনবিরের কয়েকটি প্রযোজনা দেখে অনেক সময়ে মনে হয়েছে দর্শকের মনোরঞ্জনের দিকে তাঁর যতটা মনোযোগ, নাট্যবিষয়ের গভীরতার প্রতি তত নয়। এ নাটকে অবশ্য দু-এক জায়গায় ঘুষের

আদানপ্রদান, রাজারাজড়াদের অসততা বা সাধারণ মানুষের সারল্য বিষয়ে তির্যক মন্তব্য করার চেষ্টা রয়েছে, কিন্তু "চরণদাস চোর"-এ লোকনাট্যের সারল্য ও প্রাণবন্ত আঙ্গিকের সঙ্গে আধুনিক সমাজসমালোচনার যে মণিকাঞ্চনযোগ ঘটেছিল তা "সোনে সাগর"-এ অনুপস্থিত। এই প্রযোজনায় অভিনবত্বের অভাব নেই, শিঙ লাগিয়ে চাদর ঢেকে মানুষের মহিষ সাজা, পুরুষদের নারীচরিত্রে অভিনয়, ছোট ছেলেকে সোনালি চাদর দিয়ে মুড়ে হাতের ওপর উলটো করে ধরে সদ্যোজাত বাছুর সাজানো, মঞ্চের ওপরই জামাকাপড় বদলে নিয়ে একটি চরিত্র থেকে অভিনেতার অন্য চরিত্রে পদার্পণ, মঞ্চের মাঝে গাছের গুঁড়ির কাটা অংশের ওপর দাঁড়িয়ে গাছে চড়ার বাজনা উঁচু কাঠের ব্লকে উঠে পাঁচিল টপকানো, বাওয়ানের উড়ন্ত বাণের গতি বোঝাতে জনৈক অভিনেতার বাণ হাতে করে ছুটে যাওয়া—কলকাতার দর্শকের নাগরিক-মন-মাতানো একমঞ্চ আরো কত উপাদান। কিন্তু অভিনয়শেষে এই প্রযোজনা আমাদের উপলব্ধিকে সমৃদ্ধ করে কি? প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরোতে না বেরোতে চটকদার লোক-নাট্যের নতুনত্ব ফিকে হয়ে আসে না কি? ভিজনবাই বা রাজারাম ভউ সম্বন্ধে এ প্রশ্ন ওঠে না, কারণ তাঁরা লোকশিল্পী। কিন্তু যখন হাবিব তনবিরের মতো একজন আধুনিক নাট্যপ্রযোজক, যিনি সমকালীন জীবনের জটিলতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন, লোকনাট্যের মাধ্যম ব্যবহার করেন তখন তাঁর কাছ থেকে আমরা আর-একটু বেশি কিছু নিশ্চয়ই আশা করতে পারি।

লোককথা-নির্ভর লোকনাট্যের সরলতায় অভিনয়ের বিশেষ সুযোগ থাকে না, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আগেও যেমন এবারও তেমনি 'নয়া থিয়েটার'-এর শিল্পীদের অভিনয়ে মুগ্ধ হলাম। সবচেয়ে ঘেটা বড়ো কথা, মঞ্চকে মনে হয় এঁদের ঘর-বাড়ি। এতটুকু আড়ষ্টতা নেই এঁদের বলনে-চলনে, অভিব্যক্তিতে। স্বভাব অভিনেতার জাত এঁরা। এ প্রযোজনায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বাওয়ানের ভূমিকায় গোবিন্দরাম, চন্দার ভূমিকায় পুনম, বুড়ি বোধরাইনের ভূমিকায় চরণদাস চোরের প্রথম ভূমিকাভিনেতা আনেশ, একাধারে মউহার রাজার পরিচারক, বাধিয়া আর মন্দাইনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ ভুলুয়ার অভিনয়। অল্প আয়াসে এঁরা লোকনাট্যের চরিত্রগুলিকে করে তুলেছেন জীবন্ত। প্রযোজনার দু-একটি অংশে অভিনেতারা দর্শককে সরাসরি উদ্দেশ্য করে কথা বলে তাঁদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সৃষ্টি করেন। এইভাবে যোগাযোগসৃষ্টি অবশ্য ভারতীয় লোকনাট্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই ধরনের লোকনাট্যে শহুরে থিয়েটারের মানুষদের মনকে যেটা সবচেয়ে বেশি টানে তা এর আঙ্গিকের তারল্য ও সহজতা। চন্দা ও লোরিক যখন গ্রাম ছেড়ে পালায় তাদের দীর্ঘ যাত্রাপথ শুধুমাত্র কয়েকবার মঞ্চকে এধার থেকে ওধার অতিক্রম করার মধ্যে দিয়েই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কল্পনাশক্তির চরম ব্যবহার দেখা যায় দৃশ্য থেকে দৃশ্যে—কাপড়-ঘেরা-কাঠের ফ্রেমকে পালকি হিসেবে উপস্থাপনার মধ্যে, গতিময় বাণকে ছুটন্ত মানুষের বয়ে নিয়ে যাওয়ায় কিংবা কোনো-কোনো অংশে বাস্তব উপকরণ বাতীত আঙ্গিকাভিনয়ে। লোকনাট্যের এই সজীবতাই "সোনে সাগর চন্দাইনি"-র মতো প্রযোজনার কাছ থেকে কলকাতার নাট্যোৎসাহী ও নাট্যকর্মীদের পরম প্রাপ্তি।

[শেষাংশ পরের সংখ্যায়

স্মরণে

রবীন সুর : পরিব্রাজকের প্রস্থান

কামাল হোসেন

খুব কাছের আর চেনা কোনো মানুষ হঠাৎ চলে গেলে শূন্যতাটুকু অনুভব করতেই অনেকখানি সময় চলে যায়। তখন শুধু পিছু ফিরে তাকানো। টুকরো-টুকরো স্মৃতি এবং অনিবার্য বেদনাবোধে আচ্ছন্ন থাকা ছাড়া আর কীইবা করা যায়।

রবীন সুর মারা গেলেন। ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৮৮। রাত ১টায়। এমন কিছু বয়স হয় নি। ৫৩ বছর। সুন্দর স্বাস্থ্য ছিল। খুব একটা অসুখবিসুখে ভুগতেন না। মাঝরাত্তিরে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক। কিছুই করার ছিল না। নিজের বহু-ব্যবহৃত শয্যাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

তিনি ছিলেন এই সময়ের বাঙলা ভাষার একজন উল্লেখ-যোগ্য কবি। বেশি চিৎকার-চ্যাচামেচি বা উৎকট আত্ম-প্রচার করতে তাঁকে কেউ কখনো দেখে নি। বরং তাঁর নিজস্ব স্বভাবের শান্ত, বিনম্র ব্যক্তিত্বটুকু খুব সহজেই আকর্ষণ করত চারপাশের মানুষকে।

নিজের কবিতার ওপর ছিল অপার মমতা। সব কবিরই থাকে। কিন্তু আর-সকলের সঙ্গে রবীনের বড়ো পার্থক্য—আজকের এই মিডিয়া-নির্ভর সাহিত্যসাধনার রঙ্গমঞ্চে তাঁর নিজের সৃষ্টির ওপর ছিল অগাধ বিশ্বাস আর আস্থা। এটুকু আত্মমর্যাদা নিয়েই নিজস্ব কবিকৃতির একটি নির্দিষ্ট স্থান নির্মাণ করতে পেরেছিলেন তিনি।

মৃত্যুর পর এত কাছাকাছি সময়ে তাঁর কবিতার মূল্যায়ন নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। মহাকালের নির্মম কষ্টিপাথরে নির্বাচিত হওয়ার জন্য দরকার হয় কিছুটা সময়ের দূরত্ব। সাহিত্যের ভালো-মন্দ বিচারের প্রক্রিয়া বড়ো জটিল আর দুর্জ্ঞেয়।

তবু খুব সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরিসরে বলা যায়, পৃথিবীর অনেক ঋতুর জল-বায়ু, রৌদ্র-ছায়া অতিক্রম করে একটি স্বনির্মিত পথ ধরে তিনি হেঁটে আসছিলেন। স্মারকস্তম্ভে কোনো অমর অক্ষর লেখা হল কিনা, সেদিকে তাকানোর মতো অবকাশ কখনো পান নি। জানতে ইচ্ছে করে, অনন্তের সঞ্জীবনী সুধাভাণ্ডের সন্ধান কি তিনি পেয়েছিলেন? সব প্রশ্নের উত্তর হয়তো এখুনি পাওয়া যাবে না। তবে একথা ঠিক, একজন সত্যিকারের সৃষ্টিশীল প্রতিভাবান মানুষের মতো তাঁর অন্তরে ছিল এক অপরিসীম তৃষ্ণা এবং অন্বেষণ। কোথাও তিনি পৌঁছতে চেয়েছিলেন। হয়তো প্রকৃতির কাছে। হয়তো মানুষের কাছে। কিংবা কোনো নৈরাশ্যের নির্বাণী প্রভাবে একমাত্র কবিতার মধ্যেই পেতে চেয়েছিলেন গন্তব্যের অভীষ্ট উত্তরাধিকার। ছন্দ এবং চিত্রকল্পের স্বকীয় প্রয়োগে তিনি ছিলেন সমসাময়িক কবিদের থেকে একেবারে ভিন্ন চরিত্রের।

প্রায় বছর কুড়ি ধরে তাঁর কবিজীবনে প্রকাশিত হয়েছে বারোটি কাব্যগ্রন্থ। উল্লেখযোগ্য বইগুলির নাম : অন্তর্গত নদী, আনুষঙ্গিক আর্তনাদ, রাবণের সিঁড়ি, ল্যানটেনা ক্যামেরা, তেজস্ক্রিয় ঘেরাটোপ, শীতবসন্তের কবিতা, পুনর্জন্ম চাই, গোধূলি বারান্দার কুশীলব, মুদ্রিত পাণ্ডুলিপি, পরিব্রাজকের ভিক্ষা। বেনেজামিন মোলয়েজকে নিয়ে একটি কবিতাসংকলনের সম্পাদনা করেছেন। সামনের বইমেলায় দুটি কাব্যগ্রন্থ বেরোবার কথা আছে।

চতুরঙ্গের সঙ্গে রবীন সুরের সম্পর্ক ছিল খুব নিবিড়। মাঝে-মাঝে চলে আসতেন। খোলা গলায় অদ্ভুত সারল্য-মাখা কথাবার্তা আমাদের মুগ্ধ করত।

ভাটপাড়ায় থাকতেন। পোস্ট অফিসে চাকরি করতেন। পারিবারিক জীবনে রেখে গেলেন স্ত্রী আর একমাত্র পুত্রকে।

তরুণ কবিদের সঙ্গে ছিল অভিন্নহৃদয়ে সম্পর্ক। লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনের লড়াকু সৈনিকদের একই যুদ্ধের সহযোদ্ধা ভাবতে ভালোবাসতেন। কবিতার আসরে তাঁকে পাওয়া ছিল এক চমৎকার অভিজ্ঞতা। কফি হাউসের জমাটি আড্ডায় রবীন সুরকে অনেকের মনে থাকবে।

এই মুহূর্তে রবীনের একটি কবিতার কয়েকটি লাইন বিশেষভাবে মনে পড়ছে :

জীবন জানে কতটা মৃত কতটা আছি বেঁচে
বাঁচাটা আজ বন্ধনার কুটিল নাগপাশে :
ফেনা উঠছে ক্লান্ত মুখে শিরদাঁড়াটা বাঁকা,
তাও নিভলো দমকা হাওয়ার সমূহ সর্বনাশে!
(জীবনের মুখ থেকে মৃত্যুসংবাদ)

KESHARI STEELS

(Mini Steel Plant & Steel Rolling Mills)

(A Unit of The Reliance Jute & Industries Ltd.)

Regd. Office : 9, BRABOURNE ROAD, CALCUTTA-700 001

Quality you can trust

TOR-40 & TOR-50

Manufacturers of

Torsteel Round Bars and Quality Steel Billets of Carbon & Alloy Steels

PLANT :
Industrial Area No. 1,
Agra-Bombay Road.
Dewas-455 001 (M.P.)
Tel. : 2160, 2213, 2835
Telex : 0732-220 KSRI IN
Gram : KESRISTEEL

BRANCH OFFICE :
Famous Cine Building,
20, Dr. E. Moses Road,
Mahalaxmi,
Bombay-400 011
Tel. : 4937908
4922710 (4 Lines)
Telex : 011-76259 CINE IN

SALES OFFICE :
(1) 64, Loharmandi,
Indore-452 001 (M.P.)
Gram : KESRISTEEL
Tel. : 60414, 62839
Telex : 0735-354 RELY IN

(2) B-4, Shiv Marg,
Bani Park,
Jaipur.

AGENTS :
Hindustan Dealers Ltd.,
Stringer Street,
Madras-600 018
and
Kempegowda Road,
Bangalore-560 009